শ্রীঅরবিন্দ

জীবন ও যোগ

(পরিবর্দ্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ)

প্রমোদকুমার সেন

প্রাপ্তিস্থান :
শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির
১৫ কলেজ স্কয়ার, কলিকাতা—১২

প্রথম সংস্করণ—আশ্বিন, ১৩৪৬
দ্বিতীয় সংস্করণ—পৌষ, ১৩৫৯

প্রকাশক : শ্রীতারাপদ পাত্র, কালচার পাবলিশার্স ৬৩, কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২ ; মুদ্রাকর : শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম প্রেস, পণ্ডিচেরী।

306/50/1500

সূচীপত্র

বিষয় পৃষ্ঠা

প্রকাশকের নিবেদন

"শ্রীঅরবিন্দ—জীবন ও যোগ"-এর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল। নানা কারণে বর্ত্তমান-সংস্করণ-প্রকাশে অপ্রত্যাশিত বিলম্ব ঘটিয়াছে, এজন্য আমরা বিশেষ দুঃখিত। আরও দুঃখের কারণ এই যে, দ্বিতীয় সংস্করণের মুদ্রণ-কার্য্য আরম্ভ হইবার পূর্ব্বেই—গত এপ্রিল মাসে—শ্রদ্ধেয় গ্রন্থকার অপরিণত বয়সে ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন! তিনি জীবিত থাকিলে হয়তো প্রুফ-সংশোধন-কালে কিছু পরিমার্জ্জন করিতেন। তাহা আর সম্ভবপর হইল না!

গ্রন্থকার দ্বিতীয় সংস্করণের বহু স্থানে পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন করিয়াছেন; এ সম্বন্ধে তিনি "দ্বিতীয় সংস্করণ—লেখকের বিবৃতি"-তে সম্যকরূপে আলোচনাও করিয়াছেন। এই পুস্তকের পাণ্ডুলিপি প্রেসে থাকিবার সময়ে শ্রীঅরবিন্দের তিরোধান ঘটে। সে সম্বন্ধে গ্রন্থকারের বক্তব্য পরিশিষ্টে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

গ্রন্থ-প্রকাশে এই বিলম্বের জন্য আমরা পাঠকসাধারণ ও গ্রন্থকারের পরলোকগত আত্মার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি।

ডিসেম্বর
১৯৫২

বিনীত
প্রকাশক

দ্বিতীয় সংস্করণ—লেখকের বিবৃতি

ঠিক ১০ বৎসর পরে "জীবন ও যোগে"র দ্বিতীয় সংস্করণ বাহির হইতেছে। প্রথম সংস্করণ কিছুকাল আগেই শেষ হইয়াছিল ; দ্বিতীয় সংস্করণ ইহার পূর্ব্বেই বাহির হওয়া উচিত ছিল ; হয় নাই লেখকের ত্রুটিতে। তবে একটা কথা যে, শ্রীঅরবিন্দ সম্বন্ধে কিছু লিখিতে হইলে আন্তর প্রেরণার প্রয়োজন। প্রথম সংস্করণের সময়ে তাহা অনুভব করিয়াছিলাম ; এবারও করিলাম।

প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয় দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রারম্ভে ; পুস্তক মুদ্রিত হইবার সময়ে যুদ্ধ আরম্ভ হয়। এই দশ বৎসরের মধ্যে জগতের কি বিরাট পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে ! যে তিন শক্তি মানবজাতির ভাগ্যাকাশে ধূমকেতুর মত উদিত হইয়াছিল, তাহারা চূর্ণ হইয়াছে ; কিন্তু জগতে সুরু হইয়াছে ব্যাপকতর বিক্ষোভ। ইহার পরিণাম অনিশ্চিত—মানবজাতির ভাগ্য অনিশ্চিত।

এই দশ বৎসরের মধ্যে শ্রীঅরবিন্দের প্রতি কত লোক আকৃষ্ট হইয়াছে। তাঁহার যশঃ-সৌরভ জগতের বিভিন্ন দেশে ছড়াইয়া পড়িতেছে। তাঁহার শিষ্যবৃন্দ সহজ, সাবলীল, সংস্কারমুক্ত দিব্য-জীবন পথে চলিয়াছেন। আশ্রমে আজ তপস্যার গুরু গম্ভীরতা নাই ; আশ্রম আজ বিরাট কর্ম্মক্ষেত্র ; কর্ম্ম সত্যই যোগে পরিণত হইয়াছে। শুধু কর্ম্ম কেন, শরীর-চর্চা, খেলাধূলা সমস্তই এক্ষণে শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমে

যোগশক্তিতে বিধৃত। মানুষের বৃত্তিগুলি রূপান্তর লাভ করিতেছে—অহং-এ বিধৃত না হইয়া অখণ্ড-চেতনার লীলাভূমি হইয়াছে। ভারতের সনাতন যোগের এ এক অপূর্ব্ব বিকাশ!

শ্রীঅরবিন্দ স্বয়ং জগতের ও ভারতের ব্যাপারে কয়েকবার মৌন ভঙ্গ করিয়া ভারতবাসীকে আশ্চর্য্য করিয়াছেন। প্রথম হইতেছে মহাযুদ্ধে মিত্রপক্ষকে সমর্থন; দ্বিতীয়—ক্রিপ্‌স্ মিশনের সময়ে ইংরাজের সহিত আপোষের প্রেরণা; তৃতীয়—ভারতের স্বাধীনতা লাভে আনন্দ প্রকাশ এবং দেশবাসীকে গুরু দায়িত্ব সম্বন্ধে উপদেশ। দেশবাসী যে সহজভাবে ও সোৎসাহে শ্রীঅরবিন্দের বাণীগুলি গ্রহণ করিয়াছিল তাহা নহে; কেহ কেহ এ সম্বন্ধে বাদবিতণ্ডায় বিভ্রান্ত হইয়াছিল, কেহ কেহ উপেক্ষা করিয়াছিল। কিন্তু ইহার ফল ভাল হয় নাই; সমগ্র ভারতকে ইহার জন্য দারুণ দুর্ভোগ পোহাইতে হইয়াছে এবং এখনও পোহাইতে হইতেছে। শ্রীঅরবিন্দের দৃষ্টি অভ্রান্ত, তাঁহার ইচ্ছাশক্তি অনিবার্য্য, কাজেই তিনি যে পক্ষ গ্রহণ করিয়াছেন তাহা (যেন অলৌকিক ভাবে) জয়যুক্ত হইয়াছে। তিনি ভারতের সহিত একাত্ম, সুতরাং ভারতের মঙ্গল ও শ্রীবৃদ্ধির জন্য দেশবাসী যদি অতি সহজভাবে, তাঁহার প্রতি প্রেম ও শ্রদ্ধাবশে তাঁহাকে আশ্রয় করিত, তাহা হইলে আমরা অনেক দৈবদুর্ব্বিপাক ও জাগতিক বিক্ষোভ হইতে রক্ষা পাইতাম। আমাদের ভাগ্যে তাহা নাই। কিন্তু তাঁহার ইচ্ছা যে, 'ভারত ধর্ম্মে মহান্, কর্ম্মে মহান্' হইবে তাহা কখনই ব্যর্থ হইবে না। তাই তাঁহার মত একান্ত নিরাসক্ত যোগী ভারতের স্বাধীনতায় জন-সুলভ আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন। এ আনন্দ ভারত-আত্মার আনন্দ—আত্মার স্বপ্রতিষ্ঠা ও মুক্তির আনন্দ।

যোগ-রহস্য ছাড়াও, উপরোক্ত ঘটনাবলীতে শ্রীঅরবিন্দের যে রাজনৈতিক দূরদর্শিতা প্রকট হইয়াছে (যেমন মহাভারতে আমরা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দূরদর্শিতার পরিচয় পাই) যদি দেশবাসী তাহাও উপলব্ধি করিত, তাহা হইলে শ্রীঅরবিন্দের মত অনুসরণ করিয়া আমরা রাজনীতি-ক্ষেত্রেও

লাভবান হইতাম। শ্রীঅরবিন্দের রাজনৈতিক ও সমাজনৈতিক লেখাগুলি পড়িয়া প্রতীতি জন্মে যে, তিনি জগতের শ্রেষ্ঠ রাজনীতিক। কিন্তু রাজনীতিকে তিনি শুধু রাজনীতির চোখে দেখেন না, তাঁহার চরম লক্ষ্য মানবের পরা মুক্তি ও পরম মঙ্গল, তাঁহার দৃষ্টি দেশ, কাল ও পাত্রের উর্দ্ধে, তাই তিনি স্বয়ং নেতৃত্ব গ্রহণ করেন না। কিন্তু হয়ত জগতের ইতিহাসে এমন এক পর্ব্ব আসিবে, যখন তিনি রাজনীতিক ক্ষেত্রেও স্বয়ং নেতৃত্ব গ্রহণ করিবেন মানবজাতির পুরোভাগে দাঁড়াইবেন ; অথবা গণদেবতা তাঁহাকে আহ্বান করিবেন।

একথাগুলি বলার উদ্দেশ্য এই যে, শ্রীঅরবিন্দ শুধু যোগী নহেন, তিনি এক বিরাট যুগপ্রবর্ত্তক। তিনি বলেন এই নবযুগ হইবে দিব্য-মানবের যুগ। শ্রীঅরবিন্দ রাজনীতি-ক্ষেত্র ত্যাগ করিয়া আসিলে দেশ-বাসী অনেকেই ক্ষুণ্ণ হন, অনেকে তাঁহাকে ফিরাইয়া লইতে চাহেন—অনেকে এখনও ফিরাইয়া লইতে চাহেন (গত বৎসর বাংলায় সহীদ-দের এক সম্মেলন তাঁহাকে নেতৃত্ব লইতে আবাহন করিয়াছিল)। অপরপক্ষে অনেকে মহাতৃপ্তি লাভ করিয়াছিলেন যে, শ্রীঅরবিন্দের ন্যায় এক অসামান্য পুরুষ ভারতের সনাতন যোগ-পন্থা গ্রহণ করি-য়াছেন। এখনও ভারতে যোগের প্রতি শ্রদ্ধা অপরিসীম। শ্রীঅরবিন্দ অসামান্য যোগী সন্দেহ নাই, কিন্তু তাঁহার যোগের উদ্দেশ্য শুধু আত্ম-মুক্তি নহে—মূল উদ্দেশ্য হইতেছে ভূলোক ও দ্যুলোকের ভেদা-ভেদ দূর করা (শুধু সমন্বয়সাধন নহে) ; সুতরাং মানুষের জীবনে এক বিরাট বিপ্লব ঘটান। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন লইয়া তিনি যে বিপ্লব সুরু করিয়াছিলেন, জগতে নবযুগ প্রতিষ্ঠিত হইয়া হয়ত তাহা সারা হইবে। এ বিপ্লব শুধু বহির্বিপ্লব নহে (যদিও সংগ্রামরূপী বহির্বিপ্লব আবার অনিবার্য্য হইতে পারে) আসলে ইহা অন্তর্বিপ্লব। বিপ্ল-বের অর্থ হইতেছে পুরাতন সংস্কারের বিসর্জন-ক্ষণে আমূল আলোড়ন ; সুতরাং অন্তর্বিপ্লবের ফল হইতেছে মানুষী সংস্কার ও বৃত্তিগুলির আমূল রূপান্তর সাধন করা। এই রূপান্তরের গতিতেই আজ মানুষের মধ্যে

এত বিক্ষোভ দেখা যাইতেছে—মানুষের মন যেন কোন আদর্শেই নিশ্চিততা পাইতেছে না ; অপরপক্ষে নীচ বৃত্তিগুলি মাতামাতি করিয়া ব্যষ্টি ও সমষ্টির মধ্যে ঘোর বিশৃঙ্খলা আনয়ন করিতেছে। এই অনা-সৃষ্টির জন্য শুধু মানুষ দায়ী নহে—ইহা গূঢ়ভাবে নিম্ন-প্রকৃতির ঊর্ধ্ব-প্রকৃতির অভিযান ব্যাহত করিবার চেষ্টা। নিম্ন-প্রকৃতি ত সহজে আধিপত্য ছাড়িতে চাহে না, এইজন্যই প্রাচীনকাল হইতে রিপুগুলির সহিত নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম চলিয়াছে।

প্রকৃতির এই বিক্ষোভের অবশ্যম্ভাবিতা উপলব্ধি করিয়াই, শ্রীঅরবিন্দ এই দারুণ যুগ-বিপ্লবের আলোড়নে অচঞ্চল। তিনি জাগতিক সংঘাতের ঊর্দ্ধে অবস্থিত, কিন্তু নির্ব্বিকার নহেন। তিনি ঊর্দ্ধ প্রকৃতির, দিব্য প্রকৃতির, ভাগবতীশক্তির তন্ত্রধারক ; মানবজাতির প্রতিনিধিরূপে তিনি তাঁহাকেই আবাহন করিতেছেন। ভাগবতী শক্তির বিজয় অনিবার্য্য, তাই তিনি চরম বিজয়ের ক্ষণের অপেক্ষায় রহিয়াছেন। এই বিজয় লাভের জন্য যে সংগ্রাম তাহাও তাঁহার পরা-যোগের ক্রিয়া। মানুষীভাবেও তাই তিনি ভক্ত ও প্রিয়জনকে আশ্বাস দেন যে, আঁধার যতই ঘনীভূত হউক না কেন, ইহার অবসানে আবির্ভাব হইবে পরাজ্যোতির।

গত দশ বৎসরের মধ্যে শ্রীঅরবিন্দের এই মহান্ ব্রত জনগোষ্ঠী উত্তরোত্তর উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইতেছে। বলা বাহুল্য শ্রীঅরবিন্দ সম্বন্ধে লেখকের দৃষ্টিভঙ্গি গভীরতর হইয়াছে। তাঁহার পূর্ব্ব জীবনী সম্বন্ধেও কিছু নূতন তথ্য পাওয়া গিয়াছে। এই কারণেই দ্বিতীয় সংস্করণের প্রথম দিকের অনেকগুলি অধ্যায় নূতন করিয়া লেখা হইয়াছে। সূচনা হইতে ষষ্ঠ অধ্যায় নব লিখিত ; সপ্তম ও অষ্টম অধ্যায় আংশিক-ভাবে পরিবর্ত্তিত ; দশম এবং একাদশ অধ্যায় সংশোধিত ; দ্বাদশ অধ্যায় নবলিখিত—ইহাতে শ্রীঅরবিন্দের রাজনীতি-ক্ষেত্রে অবদান সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা হইয়াছে ; ত্রয়োদশ অধ্যায় সামান্য পরি-বর্ত্তিত ; চতুর্দ্দশ হইতে একবিংশ অধ্যায় একরূপ অপরিবর্ত্তিত, কারণ

ইহাতে আলোচনা আছে ভাগবত-এষণা, যোগ-দর্শন এবং যোগের ভিত্তির ; শেষ দ্বাবিংশ অধ্যায় নব লিখিত। প্রথম সংস্করণের শেষ অধ্যায়ের নাম ছিল 'দিব্য-মানব জাতির সম্ভাবনা'। উহা লেখা হইয়াছিল ১৯৩৯এর এপ্রিল মাসে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ সুরু হইবার প্রাক্কালে। তখনকার জগতের অবস্থা লইয়া ইহাতে ভবিষৎ সম্বন্ধে কিছু গবেষণা ছিল। দশ বৎসরে জাগতিক অবস্থার যে পরিবর্ত্তন হইয়াছে, সেই দৃষ্টিভঙ্গিতে এই সংস্করণের শেষ অধ্যায়ে মানবজাতির ভাবী পরিণতি সম্বন্ধে এবং মানুষের রূপান্তরে শ্রীঅরবিন্দের সাধনার মহান্ লক্ষ্য ভিত্তি করিয়া লেখক তাঁহার প্রত্যয় ব্যক্ত করিয়াছেন।

প্রথম সংস্করণ বাঙ্গলা-জানা জনসাধারণের মধ্যে খুব সমাদরে গৃহীত হইয়াছিল এবং বহু বিখ্যাত সমালোচকের প্রশংসা পাইয়াছিল। ইহাতে লেখক অত্যন্ত প্রীতি লাভ করিয়াছিলেন সন্দেহ নাই—তাঁহার হৃদয় লোকপ্রেমের সংস্পর্শে অতীব পুলকিত হইয়াছিল। কিন্তু লেখক আরও গভীর পরিতৃপ্তি পাইয়াছিলেন এই জন্য যে, যাঁহার প্রতি গভীর শ্রদ্ধাবশে পুস্তকখানি লিখিয়াছিলেন, তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা ও ভক্তিবশে জনসাধারণ পুস্তকখানি সাদরে বরণ করিয়াছিল।

সমালোচকদের মধ্যে এক পরম পণ্ডিত, সুবিখ্যাত ব্যক্তি লেখককে পুস্তক সম্বন্ধে একটি ব্যক্তিগত পত্র লিখিয়াছিলেন। তাহাতে তিনি পুস্তকখানির সৌষ্টবের প্রশংসা করিয়াছিলেন ; কিন্তু তাঁহার একটু অনুযোগ ছিল উহা এত উচ্ছ্বাসময় কেন। অপর একজন পরম বিজ্ঞ সমালোচক, অপরপক্ষে, লেখকের গভীর শ্রদ্ধার কথা সপ্রশংসভাবে উল্লেখ করিয়াছিলেন। লেখক আজীবন সাংবাদিক এবং বহুলাংশে ঘটনা-বাদী, অর্থাৎ ঘটনার বিশ্লেষণ ও সমালোচনা করা তাঁহার কাজ। তবু এরূপ এক মহান্ ব্যক্তি সম্বন্ধে লিখিতে তিনি উচ্ছ্বাসে আপ্লুত না হইয়া পারেন নাই। লেখক এইটুকু বলিতে দুঃসাহসী যে, নগাধিরাজ হিমালয়ের সৌন্দর্য্য দেখিয়া বা মহাসমুদ্রের গাম্ভীর্য্য দেখিয়া বা ভারত-মাতার সুষমা অনুভব করিয়া বহু ভারতী যে উচ্ছ্বাস অনুভব করিয়াছেন,

তিনি শ্রীঅরবিন্দের ব্যক্তিত্ব অনুভব করিয়া সেইরূপ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠেন। সুতরাং ইহা স্বাভাবিক : তাঁহার বিষয় লিখিতে হইলে সেই উচ্ছ্বাস লেখায় ফুটিয়া উঠিবে। শত শত ভারতী*, ভারতী কেন বিদেশীও শ্রীঅরবিন্দের লেখা পড়িলে বা তাঁহার ধ্যান করিলে অনুরূপ উচ্ছ্বাস অনুভব করেন। কেহ ব্যক্ত করেন, কেহ তাহা অন্তরের গুহ্যতম সম্পদ করিয়া রাখেন। লেখক তাঁহাদের মধ্যে অতি-সামান্য এক ব্যক্তি মাত্র।

এই দশ বৎসরের মধ্যে শ্রীঅরবিন্দ সম্বন্ধে বিভিন্ন ভাষায় বহু লেখা বাহির হইয়াছে। লেখক তাহা পাঠে বহুল পরিমাণে প্রভাবান্বিত হইয়াছেন সন্দেহ নাই। বর্ত্তমান সংস্করণ প্রণয়নে তিনি শ্রীঅরবিন্দের জীবনী সম্বন্ধে আশ্রম হইতে নব-প্রকাশিত ইংরাজী পুস্তিকা এবং ডাঃ শ্রীনিবাস আয়াঙ্গারের ইংরাজীতে লেখা বিখ্যাত শ্রীঅরবিন্দ জীবনী হইতে কয়েকটি তথ্য-বিষয়ে সাহায্য পাইয়াছেন।

লেখকের আশা যে তাঁহার দেশবাসী যে-সমাদরে প্রথম সংস্করণ গ্রহণ করিয়াছিলেন, বর্ত্তমান সংস্করণের প্রতি অনুরূপ প্রীতি অনুভব করিবেন।

এলাহাবাদ, ১লা আগষ্ট, ১৯৪৯ **প্রমোদকুমার সেন**

---

* অমরকোষে ভারতের অধিবাসীদিগকে ভারতী বলা হইয়াছে।

প্রথম সংস্করণের বিবৃতির চুম্বক

লেখক এই পুস্তক রচনার কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন নিছক আন্তর প্রেরণায়। শ্রীঅরবিন্দের ন্যায় বিরাট পুরুষের জীবনী লেখা সহজ নয় এবং তাঁহার অন্তরজীবনের কথা একমাত্র তিনিই বলিতে পারেন। সুতরাং লেখক কার্য্য শেষে নিজের সাহসিকতায় নিজেই আশ্চর্য্য হইয়াছিলেন। পুস্তকের উপাদান পূর্ব্ববর্ত্তী কয়েকটি পুস্তক হইতে সংগৃহীত, এবং যোগাংশের ভিত্তি শ্রীঅরবিন্দের পুস্তকগুলি।

লেখক বাল্যেই শ্রীঅরবিন্দ সম্বন্ধে মনে ছাপ পান, কারণ তাঁহার পিতা শ্রীযোগেন্দ্রনাথ সেন, স্বদেশী আন্দোলনের সময়ে যশোহরে রাজনৈতিক কাজ করিতেন এবং ঐ আন্দোলনে সৃষ্ট কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের সহিত যুক্ত ছিলেন। তিনি রাজনীতি বিষয়ে শ্রীঅরবিন্দের আদর্শ অনুসরণ করিতেন, সোজা কথায় জাতীয় দলভুক্ত ছিলেন; শ্রীঅরবিন্দ-সম্পাদিত 'বন্দেমাতরম', 'কর্ম্মযোগিন' ও 'ধর্ম্মের' গ্রাহক এবং নিয়মিত পাঠক ছিলেন। লেখকের মনে পড়ে বাল্যে ঐ কাগজগুলি দেখিতেন এবং তাঁহার অস্পষ্ট ধারণা হইত উহাতে কত বড় বড় কথা লেখা থাকে। লেখকের পিতা জাতীয় দলের সম্মেলনে এবং সভাসমিতিতে যোগদান করিতেন, এবং হুগলীতে প্রাদেশিক সম্মেলনের অধিবেশনে শ্রীঅরবিন্দের ব্যক্তিত্বের প্রভাব বিশেষভাবে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। উত্তরকালে লেখক শ্রীঅরবিন্দ সম্বন্ধে নানা কথা

ও কাহিনী নানা জনের কাছে আগ্রহের সঙ্গে শুনিতেন, কিন্তু বুঝিতেন না তিনি রাজনীতি ছাড়িয়া গেলেন কেন। লেখক পাঠ্য জীবনে দু এক সংখ্যা "আর্য্য" দেখিয়াছিলেন, কিন্তু উহার বিষয়বস্তু দুরূহ ও লেখা শক্ত বলিয়া মনে হইত বলিয়া কোন দিন মন দিয়া পড়েন নাই। উত্তরকালে এই "আর্যের" লেখা বিশেষত দিব্য-জীবন (The Life Divine) অমৃততুল্য মনে হইত এবং ঐ লেখা পড়িয়া তাঁহার ধারণা হয় যোগী শ্রীঅরবিন্দ মানুষের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কি এক মহান আদর্শ অনুসরণ করিতেছেন। শ্রীযুক্ত অনিলবরণ রায় ও দিলীপ কুমার রায় স্ব স্ব ক্ষেত্র ত্যাগ করিয়া শ্রীঅরবিন্দের আশ্রয় গ্রহণ করেন, এ কারণে লেখকের শ্রীঅরবিন্দের যোগ সম্বন্ধে পূর্বেও কিছু ঔৎসুক্য জন্মিয়াছিল। এই উপলব্ধি ও উপলব্ধিজাত শ্রদ্ধার পরিণতি হইতেছে তাঁহার পুণ্যজীবনী লেখার প্রেরণা। (প্রথম সংস্করণের ভূমিকা লেখা হয় বাংলা ১৩৪৬ সালে আশ্বিনমাসে, কলিকাতায়)।

সূচনা—ইঙ্গিত

১৯৪৭ খৃষ্টাব্দের ১৫ই আগষ্ট ভারতের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় দিন। ঐ দিনে আমাদের মাতৃভূমি বহু শতাব্দীর পরাধীনতার পর স্বাধীনতা লাভ করে। কি বিপুল উচ্ছ্বাসের সহিত ১৪ই আগষ্ট মধ্যরাত্রিতে গণপরিষদে 'বন্দেমাতরম'' মন্ত্রধ্বনির মধ্যে আমাদের জাতির পূর্ণ স্বাধীনতা ঘোষিত হয়। কত যুগের কত ঋষি কবির স্বপ্ন মূর্ত্ত রূপ ধারণ করে, কত সহস্র সহস্র দেশভক্তের জীবনাহুতি সার্থকতা লাভ করে, কত লক্ষ লক্ষ নরনারীর দেশমাতার চরণতলে আত্মোৎসর্গ পূর্ণসিদ্ধিতে সমৃদ্ধ হইয়া উঠে!

এই শুভদিনে শ্রীঅরবিন্দের সাধনপীঠ পণ্ডিচারী আশ্রমেও এই পূণ্য উৎসব হয়। যাঁহারা সেই উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন তাঁহারা ধন্য। স্বাধীন ভারতীয় রাষ্ট্রের ভগবান বুদ্ধের ধর্ম্মচক্র সমন্বিত পতাকা ভারতের সর্ব্বত্র উত্তোলিত হয়। শ্রীঅরবিন্দের বাসগৃহের উপর শ্রীমা স্বয়ং উত্তোলিত করেন পরমাত্মার বিজয় নিকেতন। ভারতের অস্তিত্ব ত ধর্ম্মের উপরেই প্রতিষ্ঠিত, কিন্তু মানুষী ধর্ম্মে স্থিতি ভারতের একমাত্র লক্ষ্য নয়; ভাগবত-প্রতিষ্ঠাই ভারতের চরম আদর্শ। অতীত-কালে ভারত জগতে জ্ঞান ধর্ম্ম বিতরণ করিয়াছে, অধ্যাত্ম কি তাহা বুঝা-ইয়াছে। কিন্তু অতীতের পুনরাবর্ত্তনেই ভারতের সার্থকতা নয়: নব ভারতের হৃদয় এক নব প্রেরণায় ভরপুর—ভারতকে ভাগবত বিগ্রহে পরিণত হইতে হইবে; ভারতভূমি হইবে ভাগবত সিদ্ধির ক্ষেত্র;

ভারতের ঋদ্ধি হইবে ভগবানের ঐশ্বর্য্য-বিকাশ। শ্রীমা যে স্বর্ণ-পদ্ম-দল-লাঞ্ছিত নীল পতাকা স্বাধীনতা দিবসে শ্রীঅরবিন্দের পুণ্য জন্মদিবসে যোগেশ্বরের নিবাসে উত্তোলিত করেন তাহার গূঢ় ইঙ্গিতই এই। আর শ্রীমা হইতেছেন ভারতমাতার মানুষী বিগ্রহ!

১৫ই আগষ্টের অপূর্ব্ব সার্থকতা এই যে, ভারতের পুণ্য স্বাধীনতার দিনেই ৭৫ বৎসর পূর্ব্বে শ্রীঅরবিন্দ জন্মগ্রহণ করেন। এই যোগাযোগ বাস্তবিক বিস্ময়কর এবং ইহাতে শ্রীঅরবিন্দ স্বয়ং আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন। এ আনন্দের কারণ এই যে, ভগবান ভারত-আত্মার আহ্বানে সাড়া দিয়াছেন। ভগবানের আশীর্ব্বাদে ভারত নবজীবন লাভ করিল, এই নবজীবনের প্রগতি অধ্যাত্মের দিকে, এর সাফল্য ভারতী-জীবনে অধ্যাত্মের পূর্ণ বিকাশ—এক কথায় শ্রীঅরবিন্দ যাহা বলিয়াছেন ভারতীর দেবজন্মের সূচনায়। আজ এই পরিণতি অসম্ভব বলিয়া মনে হইতে পারে, কিন্তু স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রারম্ভে কবি যেমন গাহিয়াছিলেন—

"এ নহে কাহিনী, এ নহে স্বপন,
আসিবে সে দিন আসিবে।"

—তেমনি বিশ্বাসী জনমাত্রেই অন্তরে এই পরম সত্যের ইঙ্গিত পান।

এই দৃষ্টিভঙ্গীতে যদি আমরা ভারতের স্বাধীনতা দিবসের সহিত শ্রীঅরবিন্দের পুণ্যজন্মদিনের যোগাযোগ উপলব্ধি করি, তাহা হইলেই ইহার গূঢ় রহস্য বুঝিতে পারিব। আর এটা ত' সুবিদিত যে শ্রীঅরবিন্দের সমগ্র জীবন মাতৃভূমির স্বাধীনতাযজ্ঞে বিগত শতাব্দীর শেষভাগেই উৎসর্গিত হইয়াছিল। সাধারণ দৃষ্টিতে মনে হয় তাঁহার লৌকিক-জীবন ও যোগ-জীবনের মধ্যে একটা ছেদ আছে, কিন্তু গভীরভাবে তাঁহার জীবনী আলোচনা করিলেই দেখা যায় ইহা ঠিক নয়: তাঁহার সমগ্র জীবনই যোগ—এবং সে যোগের লক্ষ্য হইতেছে মাতৃভূমির সমৃদ্ধি। আর এ সমৃদ্ধির ভিত্তি হইতেছে পরম সত্যের প্রতিষ্ঠায়।

শ্রীঅরবিন্দের জীবনের এই পরম রহস্য ঋষি-কবি রবীন্দ্রনাথের ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে লেখা সেই অপূর্ব্ব অরবিন্দ-প্রশস্তি কবিতায় ব্যক্ত হইয়াছিল :

"—সেই বিধাতার
শ্রেষ্ঠ দান আপনার পূর্ণ অধিকার—
চেয়েছো দেশের হ'য়ে অকুণ্ঠ আশায়,
সত্যের গৌরব-দৃপ্ত প্রদীপ্ত ভাষায়
অখণ্ড বিশ্বাসে।"

পূর্ব্ব জীবনে যদি শ্রীঅরবিন্দ দেশের মানুষী-অধিকার লাভের জন্য সংগ্রাম করিয়া থাকেন, উত্তর জীবনে তাঁহার সাধনার লক্ষ্য হইয়াছে ভারতীর জন্য, সমগ্র মানব-জাতির জন্য ভাগবত অধিকার লাভ। সুতরাং বলা যায় শ্রীঅরবিন্দ-জীবন ভারত-জীবন—যে-কথাও কবি তাঁহার অমর কবিতায় ইঙ্গিত করিয়াছিলেন :

"হেরিয়া তোমার মূর্ত্তি, কর্ণে মোর বাজে
আত্মার বন্ধনহীন আনন্দের গান,
মহাতীর্থযাত্রীর সঙ্গীত, চিরপ্রাণ
আশার উল্লাস, গম্ভীর নির্ভয় বাণী
উদার মৃত্যুর। ভারতের বীণাপাণি,
হে কবি, তোমার মুখে রাখি' দৃষ্টি তাঁর
তারে তারে দিয়াছেন বিপুল ঝঙ্কার—"

শ্রীঅরবিন্দের জীবনের এই পরম সত্য ঋষি-কবি রবীন্দ্রনাথের ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে লেখা সেই অপূর্ব অরবিন্দ-প্রশস্তি কবিতায় ব্যক্ত হইয়াছিল :

"—সেই বিধাতার
শ্রেষ্ঠ দান আপনার পূর্ণ অধিকার—
চেয়েছ দেশের হয়ে অকুণ্ঠ আশায়,
সত্যের গৌরবদৃপ্ত প্রদীপ্ত ভাষায়
অখণ্ড বিশ্বাসে।"

পূর্ব জীবনে যদি শ্রীঅরবিন্দ দেশের রাষ্ট্রী-অধিকার লাভের জন্য সংগ্রাম করিয়া থাকেন, উত্তর জীবনে তাঁহার সাধনার লক্ষ্য হইয়াছে [illegible] জন্য, সমগ্র মানব-জাতির জন্য ভাগবত অধিকার লাভ। তাই তো বলা যায় শ্রীঅরবিন্দ-জীবন ভাগবত-জীবন—সে-কথাও কবি তাঁহার অমর কবিতায় ইঙ্গিত করিয়াছিলেন :

"হেরিয়া তোমার মূর্তি, কর্ণে মোর বাজে
আত্মার বন্ধনহীন আনন্দের গান,
মহাতীর্থযাত্রীর সঙ্গীত, চিরপ্রাণ
আশার উল্লাস, গম্ভীর নির্ভয় বাণী
উদার মৃত্যুর। ভারতের বীণাপাণি,
হে কবি, তোমার মুখে রাখি' দৃষ্টি তাঁর
তারে তারে দিয়াছেন বিপুল ঝঙ্কার—"

Photo: Henri Cartier Bresson

শ্রীঅরবিন্দ

শ্রীঅরবিন্দ

জীবন ও যোগ
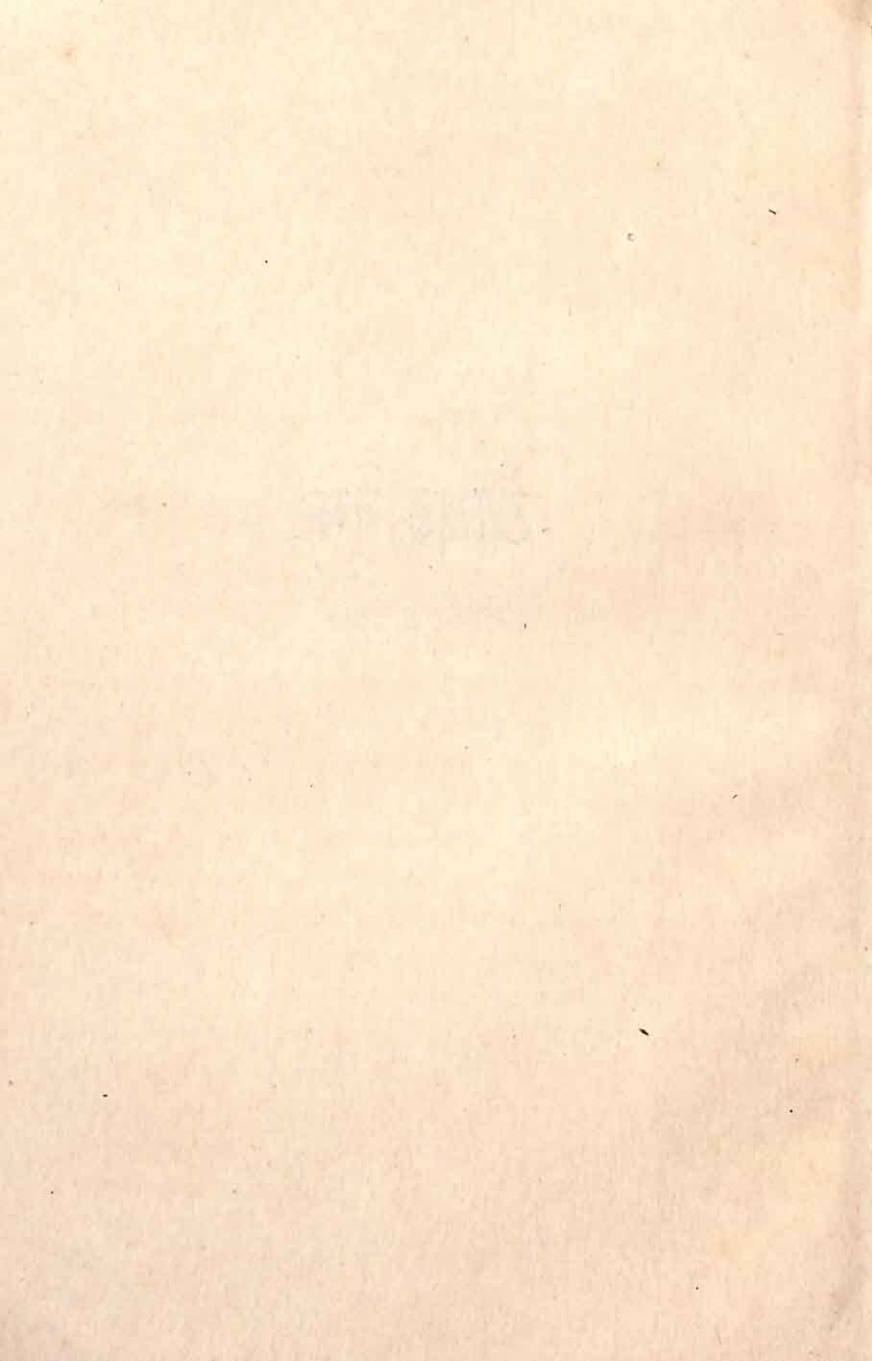
প্রথম অধ্যায়

আবির্ভাব

১৮৭২ খৃষ্টাব্দের ১৫ই আগষ্ট উষাকালে শ্রীঅরবিন্দ কলিকাতা নগরীতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি তাঁহার মাতা-পিতার তৃতীয় সন্তান। তাঁহার পিতার নাম ডাঃ কৃষ্ণধন ঘোষ—মাতা স্বর্ণলতা। পিতা ছিলেন খ্যাতিমান পুরুষ ; মাতা ছিলেন পরম পণ্ডিত, সুপ্রসিদ্ধ দেশপ্রেমিক, পুরুষরত্ন ঋষি রাজনারায়ণ বসুর সুন্দরী গুণান্বিতা কন্যা।

ডাঃ কৃষ্ণধন ছিলেন একান্ত কুসংস্কার-বিরোধী, তাই তিনি সমাজ-শাসন উপেক্ষা করিয়া ব্রাহ্মসমাজভুক্ত ঋষি রাজনারায়ণের কন্যাকে বিবাহ করেন, এবং সমুদ্রযাত্রা-নিষেধ-বিধি উপেক্ষা করিয়া বিলাতে ডাক্তারী পড়িতে যান। কৃষ্ণধন ছিলেন কলিকাতার নিকটবর্ত্তী সুপ্রসিদ্ধ কোন্নগর গ্রামের ঘোষ বংশের বংশধর। বাংলার সংস্কৃতির ইতিহাসে হুগলী জেলার স্থান কি তাহা বাঙ্গালী মাত্রেই জানেন। কত মহাপুরুষ, সাধক, পণ্ডিত, সাহিত্যিক ও সমাজ-সংস্কারকের আবির্ভাবই না এই ক্ষুদ্র জেলায় হইয়াছে। গঙ্গার পশ্চিম কূলস্থিত কোন্নগর গ্রামও বহুকাল শান্তির নীড় ছিল এবং কয়েকজন লোকপ্রসিদ্ধ ব্যক্তির স্মৃতি এই গ্রাম এখনও ধারণ করে।

ডাঃ কৃষ্ণধন কিন্তু ভাগ্যচক্রের বশে কোন্নগরের মায়া কাটান। বিলাত হইতে প্রত্যাগমনের পর কোন্নগরের হিন্দুসমাজ তাঁহাকে পুরাতন নিয়মানুযায়ী প্রায়শ্চিত্ত করিবার বিধান দেন। অতি প্রগতি-শীল কৃষ্ণধন সে প্রস্তাব উপেক্ষা করিয়া চলিয়া যান। পরবর্ত্তী কালে শ্রীঅরবিন্দ বিশেষ বিশেষ সভার অধিবেশন কালে দুইবার কোন্নগরে পদার্পণ করিয়াছিলেন। তাঁহার উত্তরপাড়া-বক্তৃতাবলী উত্তরপাড়াকে

ইতিহাসপ্রসিদ্ধ করিয়াছে। চুঁচুড়া হুগলী সহর এবং চন্দননগরও শ্রীঅরবিন্দের দর্শন পাইয়াছে। যাহা হউক, ডাঃ কৃষ্ণধন বিলাত হইতে আসার পর কোন্নগরের ভিটামাটি জলের দরে কোন ব্রাহ্মণকে বিক্রয় করিয়া সত্য রক্ষা করেন, যদিও অন্য অনেকে ইহার জন্য বেশী টাকা দিতে চাহিয়াছিল ; কিন্তু সেই ব্রাহ্মণকে পূর্ব্বে কথা দিয়াছিলেন বলিয়া তিনি লাভ ক্ষতির দিকে দৃক্‌পাত মাত্র করেন নাই।

ডাঃ কৃষ্ণধনের যেন দুই প্রকৃতি ছিল। একদিকে তিনি সাহেবিয়ানা ভালবাসিতেন, অপরদিকে তিনি ছিলেন ভারতীয়দের সহিত একাত্ম। এই সাহেবিয়ানা-প্রীতির জন্য তাঁহার তিনটি সন্তানের বালক বয়সেই প্রবাস-জীবন স্বরু হয়। অপরদিকে তাঁহার হৃদয় এমনই স্নেহ করুণায় ভরা ছিল যে, তিনি জনসাধারণের নিকট দরিদ্র-বন্ধু নারায়ণরূপে প্রতীয়-মান হইতেন। তিনি ছিলেন সিভিল সার্জন। তখনকার দিনে সিভিল সার্জনদের পদমর্য্যাদা জেলার উচচপদস্থ রাজকর্ম্মচারীদের সমতুল্য ছিল ; অর্থাৎ কিনা অল্প সংখ্যক সিভিল সার্জনদের সহিত জনসাধারণের সম্বন্ধ ছিল ; এমন কি অধিকাংশ লোক তাঁহাদের কাছে ঘেঁসিতে সাহস করিত না। কিন্তু কৃষ্ণধন ছিলেন অমায়িক দরিদ্র-সেবক। তিনি দরিদ্রদের নিকট হইতে 'ভিজিট' লওয়া দূরের কথা, নিজের পকেট হইতে তাহাদের ঔষধ পথ্যের পর্য্যন্ত টাকা দিতেন। সুতরাং কৃষ্ণধন যখনই কোন সহর হইতে বদ্‌লি হইতেন, সেখানকার লোক বিলাপ করিত যেন এক পরম বন্ধু চলিয়া গেল। রংপুর ও খুলনা এই দুইটি সহরে ডাঃ কৃষ্ণধনের নাম বিশেষ করিয়া এখনও শোনা যায়। এই খুলনা সহরের সহিত শ্রীঅরবিন্দের শৈশবে পরিচয় ঘটে। শ্রীঅরবিন্দের কীর্ত্তি প্রকট হইবার পূর্ব্বেই বাংলার শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত পরিবার মাত্রেই ডাঃ কৃষ্ণধনের ঔদার্য্য ও বদান্যতার কথা জানিত।

আর আত্ম পরিজনের প্রতি কি অপূর্ব্ব স্নেহে ডাঃ কৃষ্ণধনের হৃদয় ভরপূর ছিল! তিন পুত্রকে বিলাতে শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করিবার জন্য কৃষ্ণধন তাঁহার সহধর্ম্মিণী ও সকল পুত্র-কন্যাকে লইয়া লণ্ডনে

যান। সেইখানে নরউড অঞ্চলে অগ্নিযুগের বিপ্লবী নেতা ভারতপ্রসিদ্ধ বারীন্দ্রকুমার জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কৃষ্ণধনের কনিষ্ঠ সন্তান। কিন্তু এর পরেই শ্রীঅরবিন্দের মাতার দুরারোগ্য পীড়ায় পারিবারিক বিপর্যয় ঘটে। স্বর্ণলতা তাঁহার পিতা রাজনারায়ণের তত্ত্বাবধানে দেওঘরে বাস করেন এবং তাঁহাদের চতুর্থ ও পঞ্চম সন্তান, সরোজিনী ও বারীন্দ্রকুমার, কিছুকাল অসুস্থ মাতার নিকট ছিলেন; পরে কৃষ্ণধন তাঁহাদের নিজের নিকট লইয়া আসেন। সুতরাং কৃষ্ণধনই সন্তানদের মাতা-পিতার কাজ করিতেন।

প্রবাসী তিন সন্তান—বিনয়কুমার, মনোমোহন ও অরবিন্দ—মাতা-পিতার সাক্ষাৎ স্নেহের সামান্য আস্বাদ পাইয়াছিলেন। তাঁহারা ভিন্ন আবহাওয়ায় মানুষ হইতেছিলেন—বাল্যে যেটুকু স্নেহযত্ন পাইয়াছিলেন তাহা বিদেশীর নিকট। পিতার হৃদয় আশায় ভরপূর ছিল যে, তিন সন্তান কৃতী হইতেছে; সুতরাং তাহাদের ভরণপোষণের ব্যবস্থা করিয়া তিনি তৃপ্ত ছিলেন এবং যত স্নেহ ঢালিয়া দিতেন শিশুকন্যা সরোজিনী ও শিশুপুত্র বারীন্দ্রের উপর।

সম্প্রতি ডাঃ কৃষ্ণধনের তাঁহার জ্যেষ্ঠ শ্যালক যোগেন্দ্রনাথকে লিখিত একখানি পত্র কলিকাতার এক সাপ্তাহিক পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে।* এই পত্র পড়িয়া আমরা জানিতে পারি প্রবাসী তিন পুত্র সম্বন্ধে ডাঃ কৃষ্ণধনের কি ধারণা ছিল। পত্রখানি খুলনা হইতে ১৮৯০ খৃষ্টাব্দের ২রা ডিসেম্বর তারিখে লেখা। পত্রখানি দীর্ঘ কিন্তু তাহার বিষয়বস্তু অপূর্ব। উহার সামান্য অংশ উদ্ধৃত করা যাক:

"The two maxims I have followed in life, and they have been my ethics and religion, i.e. to improve my species by giving to the world children of a better breed of your own and to

* পত্রখানি সংগ্রহ করিয়াছেন সুপ্রসিদ্ধ সাংবাদিক শ্রীযুক্ত অমল হোম মহাশয় এবং উহা "ওরিয়েণ্ট"-নামক ইংরাজী সচিত্র সাপ্তাহিকে প্রকাশিত হইয়াছিল।

improve the children of those who have not the power of doing it themselves. That is what I call devotion—not attained by empty prayers which means inaction and worship of a god of your own creation. A real God is God's creation, and when I worship that by action I worship Him. It is easy to propound a plausible theory but it is difficult to act in a world where you are hampered by stupid public opinion and stereotyped notions of religion and morality. My life's mission has been to fight against all these stereotyped notions."

উদ্ধৃতাংশের কথায় কথায় বঙ্গানুবাদ না করিয়া একটু গভীরভাবে আলোচনা করিলে ডাঃ কৃষ্ণধনের চরিত্রের বিশেষত্ব প্রকট হইবে এবং আমরা দেখিব যে, যে ভগবৎ-এষণা তাঁহার মধ্যে বীজস্বরূপ নিহিত ছিল তাহা শ্রীঅরবিন্দের সত্তায় যেন মহীরুহে পরিণত হইয়াছে।

ডাঃ কৃষ্ণধনের জীবনের মূল লক্ষ্য ছিল বংশপরম্পরায় মানবজাতির উন্নতি সাধন। শ্রীঅরবিন্দের সাধনার লক্ষ্য মানুষকে উর্দ্ধতর স্তরে উত্তরণ করান। ডাঃ কৃষ্ণধন ব্যক্তিগতভাবে আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন—"the three sons I have produced, I have made giants of them"—অর্থাৎ আমার তিন পুত্রকে আমি লোকোত্তর করিয়াছি। শ্রীঅরবিন্দের বিশ্বাস এবার মানবজাতির দেবজন্ম ঘটিবে।

সুকর্ম্মকে ডাঃ কৃষ্ণধন যথার্থ ভগবৎ ভক্তি বলিয়াছেন। কর্ম্মযোগই শ্রীঅরবিন্দের সাধনায় মুখ্যস্থান অধিকার করিয়াছে। পিতা কৃষ্ণধন সত্যই বলিয়াছেন অধিকাংশ লোক নিজের গড়া ভগবানের লৌকিক প্রার্থনা পূজাদি করিয়া ধন্য মনে করে। তাঁহার আদর্শ

ছিল কর্ম্ম দ্বারা অর্থাৎ বাস্তবে ভগবৎ আরাধনা করা। পুত্র অরবিন্দও লৌকিক ধর্ম্মে তৃপ্ত না হইয়া সমগ্র জীবনকে ভাগবত সাধনায় সমর্পণ করিয়াছেন ; এবং পিতা কৃষ্ণধন যেমন বলিয়াছেন সত্য-ভগবান ভগবানেরই সৃষ্টি, তেমনি পুত্র অরবিন্দ চাহিয়াছেন ভগবৎ সামীপ্য, সাযুজ্য, সালোক্য—ব্রহ্মৈব কেবলম্। শুধু তাই নয় শ্রীঅরবিন্দ দেখাইয়াছেন যে কর্ম্ম বা বহিরঙ্গ দ্বারাই ভগবৎ উপাসনার পূর্ণতা ঘটে।

আবার পিতা কৃষ্ণধনের জীবন-ব্রত ছিল নীতি ধর্ম্ম প্রভৃতি সম্বন্ধে গতানুগতিকতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা ; পুত্র অরবিন্দের লক্ষ্য হইয়াছে সনাতন অনন্ত ব্রহ্ম-সত্তা উপলব্ধি করা যাহা চরম ধর্ম্ম, চরম নীতির উর্দ্ধে —যে ধর্ম্মলাভ করিতে হইলে সর্ব্ব ধর্ম্ম (লৌকিক ধর্ম্ম) পরিত্যাগ করিতে হয়।

ছাপার হরফে বাহির হইবার পূর্ব্বে শ্রীঅরবিন্দ এই অপূর্ব্ব পত্রখানি দেখিয়াছিলেন কিনা সন্দেহ,কিন্তু আমরা পিতা-পুত্রের এই অপূর্ব্ব আত্মিক যোগ দেখিয়া আপ্লুত হই। কি আশাই ছিল পিতার পুত্রদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে! ঐ পত্রে তিনি শ্যালককে লিখিতেছেন : "আমি হয়ত দেখিব না, কিন্তু তুমি দেখিবে এবং দেখিয়া গর্ব্ব অনুভব করিবে যে, তোমার তিন ভাগিনেয় দেশের শোভা হইবে এবং তোমার নামও উজ্জ্বল করিবে।"

ইহার পরে পিতার অপূর্ব্ব ভবিষ্যৎ-বাণী : "কে জানে পরবর্ত্তী বংশধরগণ কি কীর্ত্তি স্থাপন করিবে, আর আমার তিনটি সন্তানকে যদি ঐ কীর্ত্তি লাভে অগ্রণী করিতে পারি, আমি এক জীবনের কাজে ইহা অপেক্ষা আর বেশী কি আশা করিতে পারি?" তিন পুত্রের সম্বন্ধে আলাদা আলাদা মন্তব্য : "বেনো (বিনয়কুমার) কাজকর্ম্মে তাহার পিতৃতুল্য হইবে। সে আত্মত্যাগী বটে, কিন্তু তাহার কর্ম্মের গণ্ডী হইবে স্বল্প-পরিসর। মনো (মনোমোহন) তাহার পিতার আবেগ অনুভূতি পাইবে, আর পাইবে বিশ্বব্যাপী আত্মার মহান্ অভীপ্সা, যা ঘৃণা করে সকল সংকীর্ণ ভাবকে। আর তাহার মধ্যে বর্ত্তাইবে তাহার বিখ্যাত মাতামহ রাজনারায়ণ বসুর কাব্য-প্রতিভা।"

এই মহৎ সম্ভাবনার আভাস অন্তরে অনুভব করিয়া শ্রীঅরবিন্দ শান্ত হৃদয়ে কারাকক্ষে প্রবেশ করিয়াছিলেন। এ সম্বন্ধে তিনি "কারা-কাহিনী"তে লিখিয়াছেন, "বলিয়াছি এক বৎসর কারাবাস, বলা উচিত ছিল এক বৎসর বনবাস, এক বৎসর আশ্রমবাস। অনেকদিন হৃদয়স্থ নারায়ণের সাক্ষাৎ দর্শনের জন্য প্রবল চেষ্টা করিয়াছিলাম; উৎকট আশা পোষণ করিয়াছিলাম জগদ্ধাতা পুরুষোত্তমকে বন্ধুভাবে, প্রভুভাবে লাভ করি। কিন্তু সহস্র সাংসারিক বাসনার টান, নানা কর্ম্মে আসক্তি, অজ্ঞানের প্রগাঢ় অন্ধকারে তাহা পারি নাই। শেষে পরম দয়ালু সর্ব্বমঙ্গলময় শ্রীহরি সেই সকল শত্রুকে এক কোপে নিহত করিয়া তাহার সুবিধা করিলেন, যোগাশ্রম দেখাইলেন, স্বয়ং গুরুরূপে, সখারূপে সেই ক্ষুদ্র সাধন-কুটিরে অবস্থান করিলেন। সেই আশ্রম ইংরাজের কারাগার। আমার জীবনে এই আশ্চর্য্য বৈপরীত্য বরাবর দেখিয়া আসিতেছি যে, আমার হিতৈষী বন্ধুগণ আমার যতই না উপকার করুন, অনিষ্টকারীগণ—শত্রু কাহাকে বলিব, শত্রু আমার আর নাই—শত্রুই অধিক উপকার করিয়াছেন। তাঁহারা অনিষ্ট করিতে গেলেন, ইষ্টই হইল। বৃটিশ গবর্ণমেন্টের কোপদৃষ্টির একমাত্র ফল, আমি ভগবানকে পাইলাম।"

ভগবদ্দর্শনের প্রেরণা বহু পূর্ব্বেই তাঁহার হৃদয়ে জাগ্রত হইয়াছিল। বরোদায় থাকিতে তাঁহাকে আমরা জ্ঞান-তপস্বীরূপে দেখিয়াছি, কিন্তু তখনই তিনি প্রচ্ছন্নভাবে যোগপথ অবলম্বন করিয়াছিলেন। বারীন্দ্র-কুমারের লেখায় আমরা জানিতে পারি যে, একদা তিনি নর্ম্মদাতীরে ব্রহ্মানন্দ নামে মহাযোগীকে দর্শন করিতে গিয়াছিলেন। এই যোগী নাকি কখনও কাহারও দিকে দৃষ্টিপাত করিতেন না, কিন্তু শ্রীঅরবিন্দের প্রতি তিনি পূর্ণভাবে দৃষ্টিপাত করিয়াছিলেন।

ঐ প্রসঙ্গে শ্রীঅরবিন্দ উল্লেখ করেন, 'বক্সার জেলে বিপিনচন্দ্রের এবং নির্ব্বাসনে কৃষ্ণকুমার মিত্রের ভগবৎ-উপলব্ধি হইয়াছিল বলিয়া তাঁহারা প্রকাশ করেন। ইহা কি তাঁহাদের উভয়েরই মানসিক ভ্রম?' বিপিনচন্দ্র, শ্রীঅরবিন্দ কারাগারে যাইবার পূর্ব্বেই, কারাবাস ভোগ করিয়াছিলেন।

বরোদায় লেলে নামক এক মহারাষ্ট্রীয় যোগী শ্রীঅরবিন্দের যোগপথে প্রথম সহায়ক ছিলেন বলিয়া জানা যায়। সুরাট কংগ্রেস হইতে ফিরিবার সময়ে লেলের সহিত তাঁহার সংযোগ ঘটে। এই সময়েই শ্রীঅরবিন্দের যোগাবস্থার আভাস পাওয়া যায়। বোম্বাইতে তিনি যে বক্তৃতা করেন তাহার উৎস ছিল এক ঊর্দ্ধ স্তরে। শিকাগো ধর্ম্ম সম্মেলনে বক্তৃতা করিবার সময়ে স্বামী বিবেকানন্দের ঐরূপ অবস্থা হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের "নির্ব্বাসিতের আত্মকথা" পুস্তকে লেলের কথা আছে। লেলে কলিকাতায় আসিয়াছিলেন এবং বারীন্দ্রকুমার তাঁহাকে মাণিকতলার বোমার কারখানা দেখাইয়াছিলেন। লেলে বারীন্দ্রকুমার ও তাঁহার সঙ্গীদিগকে সশস্ত্র বিপ্লবের প্রচেষ্টায় বিরত হইতে বলিয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন ইহাতে তাঁহাদের দুর্ভোগ হইবে। কিন্তু বারীন্দ্রকুমার বীরত্বভরে ঐ সাবধান-বাণী উপেক্ষা করিয়াছিলেন। লেলে কলিকাতা ত্যাগ করিবার কিছুকাল পরেই পুলিশ বোমার কারখানায় হানা দেয়। ইহার পর লেলের সহিত শ্রীঅরবিন্দের আর সাক্ষাৎ হয় নাই। কয়েক বৎসর হইল লেলে মহারাজ দেহরক্ষা করিয়াছেন।

কলিকাতায় আসিয়া রাজনীতিক কর্ম্মের আবর্ত্তের মধ্যেও শ্রীঅরবিন্দ সাধনায় মগ্ন ছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণকে তিনি জাতীয় জাগরণের উৎস বলিয়া মনে করিতেন। সুরাট হইতে ফিরিবার পথে বোম্বাইয়ে উল্লিখিত বক্তৃতায় তিনি বলেন যে, যে-সময়ে উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব্ব, পশ্চিম হইতে দলে দলে উচ্চশিক্ষিত লোক আসিয়া ঐ নিরক্ষর সন্ন্যাসীর পদতলে লুণ্ঠিত হইল, সেই সময়েই ভারতের মুক্তির কার্য্য সুরু হইল। শুধু জাতীয় প্রগতি নহে, অধ্যাত্ম বিষয়ের আলোচনা প্রসঙ্গে শ্রীঅরবিন্দ শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের সাধনার কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার সহধর্ম্মিণী মৃণালিনী দক্ষিণেশ্বরের মৃত্তিকা বাটিতে রাখিয়াছিলেন। খানাতল্লাসীর সময় ইহা লইয়া যে মজার ব্যাপার হইয়াছিল "কারাকাহিনী"তে শ্রীঅরবিন্দ তাহার নিম্নলিখিত বিবরণ দিয়াছেন :—

অতঃপর শ্রীঅরবিন্দ সম্বন্ধেঃ "অরো, আমি আশা করি, তাহার স্বদেশকে মহিমামণ্ডিত করিবে চমৎকার পরিচালনা ও ব্যবস্থা দ্বারা; আমি ইহা দেখার জন্য বাঁচিয়া থাকিব না; তুমি যদি বাঁচিয়া থাক এই চিঠির কথা মনে করিও।"

ইহার পরে পিতা পুত্র অরবিন্দের কৃতিত্ব ও পাণ্ডিত্যে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করিয়াছেন, আর লিখিয়াছেন সুবিখ্যাত ইংরাজ কবি রবার্ট ব্রাউনিংএর সুযোগ্য পুত্র অস্কার ব্রাউনিং কিভাবে অধ্যাপকদের এক চায়ের মজলিসে প্রকাশ্যভাবে শ্রীঅরবিন্দের পাণ্ডিত্যের (তখন শ্রীঅরবিন্দ কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র) ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন।

পিতা দুর্ভাগ্যক্রমে কৃতী পুত্রত্রয়কে দেখিয়া যাইতে পারিলেন না। তাঁহার নিকট ভুল খবর আসিয়াছিল যে, শ্রীঅরবিন্দ যে জাহাজে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছিলেন, তাহা সমুদ্রে ডুবিয়া গিয়াছে। এই দারুণ আঘাতে তিনি শয্যাশায়ী হন এবং অকালে দেহরক্ষা করেন। শ্রীঅরবিন্দ পরের জাহাজে ভারতে ফিরেন।

পুত্রত্রয় সম্বন্ধে পিতার ভবিষ্যদ্বাণী কালক্রমে সফল হইল। জ্যেষ্ঠ বিনয়কুমার কুচবিহার রাজদরবারে কার্য্য লইলেন। তাঁহার কর্ম্মক্ষেত্র হইল স্বল্প-পরিসর। মধ্যম মনোমোহন কলিকাতার প্রেসিডেন্সী কলেজে ইংরাজীর অধ্যাপক হইলেন এবং তাঁহার কাব্য-সুষমায় শুধু ভারতীয়রা নহে ইংরাজ বিদ্বন্মণ্ডলী পর্য্যন্ত মুগ্ধ হইল। সকল ভ্রাতাই একান্ত শান্ত-প্রকৃতি, নির্ব্বিবাদী এবং মধুর স্বভাব বিশিষ্ট। কবি মনোমোহনের কথা তাঁহার পরিচিত যাঁহারা এখনও জীবিত আছেন আবেগের সঙ্গে বলেন। তাঁহার পাণ্ডিত্যের আলোকে কত ছাত্রেরই বুদ্ধি প্রদীপ্ত হইয়াছে।

আর 'অরো'—শ্রীঅরবিন্দের প্রতিভা পর্ব্বতকন্দরে জাত নির্ঝরিণীর মত প্রথমে স্বল্প-পরিসর কিন্তু দুর্জয় ধারায় প্রবাহিত হইয়া কালক্রমে বিশাল স্রোতস্বিনীতে পরিণত হইল। সেই স্রোতস্বিনী আজ মহা-সাগরের সহিত যুক্ত। বিলাত হইতে ফিরিবার এক বছর পরেই

শ্রীঅরবিন্দের যশঃ-প্রতিভা মধ্যাহ্ন-ভাস্করের মত ভারতের ভাগ্যাকাশে প্রদীপ্ত হইল।

একটা কথা। পিতা কৃষ্ণধন আশা করিয়াছিলেন যে, তাঁহার তৃতীয় পুত্র কর্ম্মনিপুণতায় খ্যাতিলাভ করিবেন—" by a brilliant administration"। পিতা হয়ত মনে করিয়াছিলেন যে, শ্রীঅরবিন্দ সিভিল সার্ভিসে প্রবেশ করিয়া কালক্রমে উচ্চ রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া দেশের শাসনে সুব্যবস্থা করিবেন। পিতার এ আশা সফল হয় নাই সত্য, কিন্তু তাঁহার ইঙ্গিত এক অভিনব-ভাবে সফল হইয়াছে। শ্রীঅরবিন্দ জাতীয় আন্দোলনের মোড় ঘুরাইতে যে কৃতিত্ব দেখাইয়াছিলেন তাহা পরে এক অধ্যায়ে আলোচনা করা হইবে। উত্তর জীবনে তাঁহার লক্ষ্য হইয়াছে মানব-প্রকৃতিকে এক নব চেতনায় সংস্থাপন। পূর্ণযোগের আলোচনার সময়ে আমরা দেখিব যে, আমাদের প্রকৃতিকে রূপান্তরিত করিতে হইলে কিরূপে ধাপে ধাপে উঠিতে হয়, খুঁটিনাটি কিছুই এড়াইয়া যাওয়া চলেনা। এই প্রতি ধাপ সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দ কি অপূর্ব্ব ব্যবস্থাই না দিয়াছেন! ইহা একাধারে যোগকৌশল এবং কর্ম্মনিপুণতা। পিতা কৃষ্ণধন কি ইহারই ইঙ্গিত করিয়াছিলেন?

এইবার শ্রীঅরবিন্দের ভারত-প্রসিদ্ধ মাতামহ ঋষি রাজনারায়ণের কথা। বঙ্গদেশে তখন যে সকল দিক্‌পালের আবির্ভাব হইয়াছিল তাঁহাদের মধ্যে ঋষি রাজনারায়ণ অন্যতম। তাঁহার চরিত্রের মাধুর্য্যের স্মৃতি আজও বাঙ্গালী জাতির বক্ষে রহিয়াছে; কিন্তু তাহার চেয়েও বড় কথা এই যে, রাজনারায়ণ স্বদেশী আন্দোলনের পিতামহ, জাতীয় মহাসভা কংগ্রেসের ভগীরথ। তিনি আমাদের জাতিকে আবার আত্মস্থ করেন, নব-কৃষ্টির মন্ত্র দেন। রাজনারায়ণ সম্বন্ধে কবি রবীন্দ্রনাথ যে আলেখ্য রাখিয়া গিয়াছেন তাহাতে তাঁহার চরিত্রের বিশেষত্ব সম্যক পরিস্ফুট হইয়াছে। তাহা হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করা হইল:

"ছেলেবেলায় রাজনারায়ণ বাবুর সঙ্গে যখন আমাদের পরিচয় ছিল তখন সকল দিক হইতে তাঁহাকে বুঝিবার শক্তি আমাদের ছিল না। তাঁহার মধ্যে নানা বৈপরীত্যের সমাবেশ ঘটিয়াছিল। তখনই তাঁহার চুলদাড়ি প্রায় সম্পূর্ণ পাকিয়াছে, কিন্তু আমাদের দলের মধ্যে বয়সে সকলের চেয়ে যে ব্যক্তি ছোট তাহার সঙ্গেও তাঁহার বয়সের কোন অনৈক্য ছিল না। তাঁহার বাহিরের প্রবীণতা শুভ্র মোড়কটির মত হইয়া তাঁহার অন্তরের নবীনতাকে চিরদিন তাজা করিয়া রাখিয়াছিল। এমন কি, প্রচুর পাণ্ডিত্যেও তাঁহার কোন ক্ষতি করিতে পারে নাই, তিনি একেবারেই সহজ মানুষটির মতই ছিলেন। জীবনের শেষ পর্য্যন্ত অজস্র হাস্যোচ্ছ্বাস কোন বাধাই মানিল না—না বয়সের গাম্ভীর্য্য না অস্বাস্থ্য, না সংসারের দুঃখ কষ্ট, ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন, কিছুতেই তাঁহার হাসির বেগকে ঠেকাইয়া রাখিতে পারে নাই।

"এক দিকে তিনি আপনার জীবন এবং সংসারটিকে ঈশ্বরের কাছে সম্পূর্ণ নিবেদন করিয়াছিলেন, আর এক দিকে দেশের উন্নতি-সাধন করিবার জন্য তিনি সর্ব্বদাই কত রকম সাধ্য ও অসাধ্য প্ল্যান করিতেন তাহার অন্ত নাই। রিচার্ডসনের তিনি প্রিয় ছাত্র, ইংরাজী বিদ্যাতেই বাল্যকাল হইতে তিনি মানুষ, কিন্তু তবু অনভ্যাসের সমস্ত বাধা ঠেলিয়া বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের মধ্যে পূর্ণ উৎসাহ ও শ্রদ্ধার বেগে তিনি প্রবেশ করিয়াছিলেন। এদিকে তিনি মাটির মানুষ কিন্তু তেজে একেবারে পরিপূর্ণ ছিলেন। দেশের প্রতি তাঁহার যে প্রবল অনুরাগ, সে তাঁহার সেই তেজের জিনিষ। দেশের সমস্ত খর্ব্বতা দীনতা অপমানকে তিনি দগ্ধ করিয়া ফেলিতে চাহিতেন। তাঁহার দুই চক্ষু জ্বলিতে থাকিত, তাঁহার হৃদয় দীপ্ত হইয়া উঠিত, উৎসাহের সঙ্গে হাত নাড়িয়া আমাদের সঙ্গে মিলিয়া তিনি ধরিতেন—গলায় সুর লাগুক আর না লাগুক সে তিনি খেয়ালই করিতেন না—

'একসূত্রে বাঁধিয়াছি সহস্রটি মন,
এক কার্য্যে সঁপিয়াছি সহস্র জীবন।'

"এই ভগবদ্‌ভক্ত চিরবালকটির তেজঃ-প্রদীপ্ত হাস্যমুখর জীবন, রোগে শোকে অপরিম্লান তাঁহার পবিত্র নবীনতা আমাদের দেশের স্মৃতি-ভাণ্ডারে সমাদরে রক্ষা করিবার সামগ্রী তাহাতে সন্দেহ নাই।"*

ঋষি রাজনারায়ণের ভগবদ্‌ভক্তি, ব্রহ্মজ্ঞান, পাণ্ডিত্য, স্বদেশপ্রেম, স্বাদেশিকতা প্রভৃতি গুণরাজি শ্রীঅরবিন্দের সত্তায় প্রকট হইয়া বৃহত্তর সার্থকতা লাভ করিয়াছে। জীবিত কালে রাজনারায়ণ শ্রীঅরবিন্দকে বেশী কাছে পান নাই, কিন্তু দৌহিত্রের দেবচরিত্র ও পাণ্ডিত্য তাঁহার হৃদয়কে পূর্ণ করিয়াছিল। শ্রীঅরবিন্দ মাতামহকে ভালবাসিতেন ও শ্রদ্ধা করিতেন। আত্মীয়স্বজনের সহিত শ্রীঅরবিন্দের কোন কালেই বিশেষ সম্বন্ধ নাই এবং কাহারও সম্বন্ধে তিনি কখনই কিছু লিখেন নাই। কিন্তু ঋষি রাজনারায়ণের মৃত্যুতে তিনি ব্যথিত হইয়া একটি ইংরাজী কবিতায় শ্রদ্ধাঞ্জলি দিয়াছিলেন।† তাহার তাৎপর্য্য এই :

"তোমার ত শেষ হয়নি ; তুমি ত আমাদের থেকে, আলো
থেকে অন্ধকারে চলে যাও নি। ও দুর্বার দীপ্ত আত্মা!
তুমি ত যাওনি সেই স্বর্গে যেখানে আছে সেই পুরাণো
আনন্দ আর সন্ন্যাসের স্তব্ধতা। সেই সর্ব্বব্যাপ্ত ধী, যার
তুমি ছিলে অংশ ও পার্থিব বিকাশ, তিনিই তাঁর দান
ফিরিয়ে নিয়েছেন। কিন্তু সেই অখণ্ড জ্যোতির মধ্যে গিয়েও
তুমি তোমার বিশিষ্ট জ্যোতি হারাও নি। শক্তি রয়েছে তোমার
সাথে এবং সেই পরিচিত সস্মিত দ্যোতনা, যা হয়েছে অদৃশ্য
চোখ ধাঁধান (অপার্থিব) আলোর জন্যে ; সে ত আঁধারে
দিশেহারা নয়!"

* এতদিন পরে বাংলাদেশ ঋষি রাজনারায়ণের পবিত্র স্মৃতি তাঁহার পিতৃভূমি কলিকাতার নিকটবর্ত্তী বোড়াল গ্রামে রক্ষা করিবার ব্যবস্থা করিতেছে। স্মৃতি-তহবিলে আমাদের গবর্ণর-জেনারেল চক্রবর্ত্তী রাজাগোপালাচারীও চাঁদা দিয়াছেন।

† "Transit, ron Perrit (1899).

দ্বিতীয় অধ্যায়

বাল্যে প্রবাসে বিদ্যার্জ্জন

শ্রীঅরবিন্দের সাত বৎসর বয়সে, ইংরাজী ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে ডাঃ কৃষ্ণধন তিন পুত্রের বিদ্যাশিক্ষার ব্যবস্থা করিবার জন্য সপরিবারে বিলাতে যান। কৃষ্ণধনের অত্যধিক সাহেবিয়ানার দিকে ঝোঁক থাকায়, বিদ্যাশিক্ষা ব্যাপারেও পুত্রদের ভারতীয় সংস্কৃতির সামান্যমাত্র পরিচয় পাইবার সুযোগ দেন নাই। শৈশবেই (শ্রীঅরবিন্দের বয়স তখন পাঁচ বৎসর মাত্র) তিনি তিন পুত্রকে দার্জিলিঙএর লোরেটো কনভেন্ট স্কুলে পাঠাইয়া দেন। কাজেই ভ্রাতাদ্বয়ের সহিত শ্রীঅরবিন্দ 'নিজবাস-ভূমে পরবাসী' হইলেন। তাঁহাদের পড়াশুনা, খেলাধূলা বিজাতীয়দের সহিত চলিতে লাগিল।

বিলাতে গিয়া কৃষ্ণধন তিনপুত্রকে ম্যাঞ্চেষ্টার সহরে ড্রুয়েট পরিবারে রাখিলেন। বড় দুই ভাই ওখানকার গ্রামার (প্রাথমিক) বিদ্যালয়ে গেলেন, কিন্তু শ্রীঅরবিন্দের শিক্ষার ভার লইলেন ড্রুয়েট দম্পতি। ড্রুয়েটসাহেব লাতিন ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন; কাজেই তাঁহার নিকট শ্রীঅরবিন্দ শৈশবেই লাতিন ভাষা শিখিলেন।

কয়েক বৎসর পরেই ড্রুয়েট দম্পতি অষ্ট্রেলিয়ায় চলিয়া গেলেন। সুতরাং শ্রীঅরবিন্দ লণ্ডনের সুবিখ্যাত সেন্ট পল্‌স স্কুলে প্রেরিত হইলেন (১৮৮৫ খৃষ্টাব্দ)। সেখানকার হেডমাষ্টার মহাশয় ছিলেন গ্রীক ভাষায় সুপণ্ডিত; তিনি শ্রীঅরবিন্দকে উত্তমরূপে গ্রীক ভাষা শিখাইলেন। শ্রীঅরবিন্দ সেন্ট পল্‌স স্কুলে পাঁচ বৎসর ছিলেন; শেষের তিন বৎসরে অল্প সময়ের মধ্যে স্কুলের পড়া শেষ করিয়া তিনি স্ব-শিক্ষায় প্রবৃত্ত হইলেন; অর্থাৎ, তিনি ইংরাজী ও ফরাসী সাহিত্যে

নিমগ্ন হইলেন এবং গভীর অভিনিবেশ সহকারে ইয়ুরোপের ইতিহাস পড়িতে লাগিলেন।

"আর্য্যে" 'মানব-মিলনের আদর্শ' এবং 'সামাজিক বিবর্ত্তনের মনস্তত্ত্ববাদ' নামক যে অপূর্ব্ব প্রবন্ধরাজি প্রকাশিত হইয়াছিল তাহাতে মানব-ইতিহাসের যে গভীর পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাই, কিংবা বিভিন্ন নিবন্ধে শিল্প ও সাহিত্য সম্বন্ধে যে বিচিত্র কল্পজগতের সন্ধান মিলে, তাহা শ্রীঅরবিন্দের এই স্বেচ্ছা-অধ্যয়নের অমৃতময় ফল। এইভাবে ডাঃ কৃষ্ণধনের সাহেবিয়ানা শ্রীঅরবিন্দের জীবনকে পূর্ণতালাভের সুযোগ দিয়াছিল ; কারণ বালক বয়স হইতেই তিনি পাশ্চাত্য সভ্যতার ও সংস্কৃতির নিবিড় পরিচয় পাইয়াছিলেন ; পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের মূল কথা এবং পাশ্চাত্যদর্শন তাঁহার নিকট হস্তামলকবৎ হইয়াছিল। উত্তর-কালে তাঁহার লেখায় মানব-জীবন বা জগৎ-রহস্য সম্বন্ধে আমরা প্রাচ্য-পাশ্চাত্য জ্ঞানের যে আশ্চর্য্য সমন্বয় দেখিতে পাই—নব-বেদ "দিব্য-জীবন" পুস্তকে—তাহা সম্ভব হইয়াছে পাশ্চাত্যের জীবনের সহিত এই নিবিড় সম্বন্ধের ফলে। পাশ্চাত্যের জ্ঞানের গণ্ডী কতদূর, তাহার ব্যর্থতার কারণ কি, কিংবা প্রাচ্যের জ্ঞান-ঐশ্বর্য্য কোথায়, তাহা উপলব্ধি করা বা জগদ্বাসীকে বুঝান শ্রীঅরবিন্দের পক্ষে সম্ভব হইয়াছে এই ব্যাপক ও বহুমুখী শিক্ষার জন্য।

আর একটা জিনিষ লক্ষণীয়, তাহা হইতেছে এই যে, শ্রীঅরবিন্দ অত বিদ্যাবত্তা সত্ত্বেও, আমরা সাধারণ ভাষায় যাহাকে carrier বা জীবন-সাফল্য বলি, তাহার জন্য কোনদিনই উদ্‌গ্রীব হন নাই। তাহার প্রমাণ এই স্বেচ্ছা-অধ্যয়ন, যাহার উদ্দেশ্য ছিল সমস্ত বিষয় তলাইয়া দেখা—পরীক্ষায় সাফল্য নহে। শ্রীঅরবিন্দের সমগ্র জীবন পর্য্যালোচনা করিয়া দেখা যায় যে, কোনদিন ব্যক্তিগত উদ্দেশ্যে তিনি কোন কাজই করেন নাই—সর্ব্বাবস্থায় তাঁহার দৃষ্টি যেন কোন্ সুদূর লক্ষ্যে নিবদ্ধ, যে লক্ষ্যে পৌঁছিলে সকলে 'আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি।'

লাতিন ও গ্রীক ভাষায় পাণ্ডিত্যের জন্য শ্রীঅরবিন্দ ৮০ পাউণ্ডের (প্রায় ১২০০ টাকার) এক বৃত্তি লাভ করিয়া পাঁচ বৎসর পরে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের কিংস কলেজে প্রেরিত হইলেন। সেখানে তাঁহার পরিচয় ঘটিল সুপ্রসিদ্ধ ইংরাজ কবি রবার্ট ব্রাউনিংএর সুযোগ্য পুত্র অস্কার ব্রাউনিংএর সহিত। তিনি শ্রীঅরবিন্দের বুদ্ধিমত্তা ও ধীশক্তির পরিচয় পাইয়া মুগ্ধ হইলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের সকলে তাঁহার প্রতিভা দেখিয়া আশ্চর্য্য হইল, কারণ এক বৎসরের মধ্যে তিনি গ্রীক ও লাতিন ভাষায় কবিতা রচনা করিয়া কিংস কলেজের সকল পুরস্কারগুলিই লাভ করিলেন।

শ্রীঅরবিন্দের ছাত্র-জীবন সম্বন্ধে কে বিশেষ বিবরণ দিবে ? আর তাঁহার নিজের সম্বন্ধে ত তিনি চিরমৌন! পৃথিবীতে আর যা কিছু ঘটুক না কেন এটা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে শ্রীঅরবিন্দ কোনদিন আত্ম-জীবনী লিখিবেন না। তাঁহার লিখিত "ভাগবত জীবন-"ই তাঁহার আত্মজীবনী। সে জীবনীতে ঘটনা মুখ্য নহে, তাহার ছন্দ হইতেছে চেতনার বিকাশ। তবু দু একটি ঘটনা লিপিবদ্ধ হইয়াছে, যাহা তাঁহার সত্তার, তাঁহার কীর্ত্তির উপর কিছু আলোকপাত করে। এইরূপ একটা ঘটনা ডাঃ কৃষ্ণধন তাঁহার জ্যেষ্ঠ শ্যালক যোগেন্দ্রনাথকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন (যাহার কথা পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে) তাহাতে প্রকাশ পাইয়াছে। কিশোর অরবিন্দ পিতাকে আনন্দ দিবার জন্য নিজের কথাই বলিয়া ফেলিয়াছেন!

কৃষ্ণধন অরবিন্দের পত্র হইতে উদ্ধৃত করিয়া যোগেন্দ্রনাথকে লিখিতেছেন :

"আমি তোমাকে লিখ্ছি বিখ্যাত পিতার বিখ্যাত পুত্র অস্কার ব্রাউনিং তাকে (অরবিন্দকে) কি বলেছিলেন, যখন সে (অরবিন্দ) জনৈক অধ্যাপকের সঙ্গে চায়ের আসরে বসেছিল। (সে, অরবিন্দ, এখন নিজের কৃতিত্বে কেম্ব্রিজের কিংস্ কলেজে প্রবেশ করেছে)।

(অস্কার ব্রাউনিংএর উক্তি :) 'আমি তের বছর ধরে পাণ্ডিত্যের পরীক্ষা করছি, তার মধ্যে তোমার উত্তর-পত্রের মত উত্তর-পত্র আমার হাতে আসে নি ; আর তোমার প্রবন্ধটি চমৎকার হয়েছিল।'

কৃষ্ণধন মন্তব্য করছেন : "(অরবিন্দের) উল্লিখিত প্রবন্ধ যেন একটা বেপরোয়া সৃষ্টি—শেক্সপীয়রের সঙ্গে মিলটনের তুলনা। আমি এখানে অরবিন্দের নিজের কথা তুলে দিচ্ছি। তোমার পক্ষে এতটা পড়া ক্লান্তিজনক হতে পারে, কিন্তু এটা তোমার গ্রাম্যজীবনের* একঘেয়েমিও ভাঙ্গতে পারে।"

শ্রীঅরবিন্দের পিতাকে লিখিত পত্রাংশ :

"গত রাত্রে আমি জনৈক অধ্যাপকের ঘরে কফি পান করিবার আমন্ত্রণ পাইয়াছিলাম, সেখানে সুবিখ্যাত ও,বি'র, অর্থাৎ অস্কার ব্রাউনিং-এর সাক্ষাৎ পাইয়াছিলাম। ইনিই কিংস কলেজের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অলঙ্কার। তিনি আমার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হইয়া উঠিয়াছিলেন এবং আমার সঙ্গে নাচের কথা হইতে পাণ্ডিত্যের কথা পর্য্যন্ত আলোচনা করিয়া (অবশেষে) বলিলেন, 'আমি অনুমান করি তুমি জান যে, তুমি অসামান্য এক উঁচু পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছ। আমি তেরটি (এই রকম) পরীক্ষায় উত্তর-পত্র পরীক্ষা করিয়াছি ; কিন্তু তোমার মত চমৎকার উত্তরপত্র আর দেখি নাই (বৃত্তি পরীক্ষায় প্রাচীন সাহিত্যের উত্তরপত্রের কথা তিনি উল্লেখ করিতেছিলেন)। আর তোমার প্রবন্ধ—এটা আশ্চর্য্য!"

প্রবন্ধটির বিষয়বস্তু উল্লেখ করিয়া শ্রীঅরবিন্দ পিতাকে লিখিতেছেন "এই প্রবন্ধে—শেক্সপীয়রের সহিত মিলটনের তুলনায়—আমি প্রাচ্য-রুচির যথাসম্ভব পরিচয় দিয়াছিলাম। ইহাতে ভরপূর ছিল

---

* ঋষি রাজনারায়ণ জীবনের শেষভাগে দেওঘরে থাকিতেন। তাঁহার পরিবারবর্গও প্রায়ই দেওঘরে থাকিতেন। শ্রীঅরবিন্দের মাতাও অসুস্থ অবস্থায় দেওঘরে জীবন কাটাইয়াছেন। বারীন্দ্রকুমারের শিক্ষাদীক্ষার সুরু দেওঘরে। শ্রীঅরবিন্দ বিলাত হইতে ফিরিয়া কয়েকদিন মাতামহদের নিকটে ছিলেন। পরে স্বদেশী আন্দোলনে বাংলায় নেতৃত্ব করিবার সময়ে তিনি কিছুদিন অসুস্থ হইয়া দেওঘরে ছিলেন।

গ্রীষ্মপ্রধান দেশ-সুলভ কল্প-বিলাস; আর ছিল ভাষার অলঙ্কার-বৈচিত্র্য, এবং ইহাতে ব্যক্ত হইয়াছিল নির্ব্বাধভাবে আমার যথার্থ হৃদয়াবেগ। আমার নিজেরই মনে হইয়াছিল যে ইহা আমার লেখার মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ; কিন্তু এ লেখাটা যদি স্কুলে পড়িবার সময়ে লিখিতাম, তাহা হইলে ইহা বাক্যাড়ম্বরদুষ্ট এবং অভিনবভাবে এশিয়ার ভাবব্যঞ্জক বলিয়া নিন্দিত হইত।

"বিখ্যাত ও, বি, পরে আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন আমি কোন ঘরে থাকি এবং আমি সে বিষয়ে বলিলে, তিনি বলিলেন, 'সেই জঘন্য গর্ত্তটা।' তারপর তিনি মাহাফীর (বোধহয় হোষ্টেল-পরিচালক) দিকে ফিরিয়া বলিলেন, 'আমরা আমাদের ছাত্রদের প্রতি কি অভদ্র। আমাদের কাছে আসে মহামনা ব্যক্তিগণ, আর আমরা তাদের রাখি ঐ বাক্সটার মধ্যে। বোধহয় আমরা তাদের গর্ব্ব চেপে রাখার জন্যেই ও রকম করি।"

শ্রীঅরবিন্দ কৈশোরের ঐ পত্রটুকুর মধ্যে আমরা কয়েকটি তথ্য পাইলাম। পিতা পুত্রকে বিলাতে পাঠাইয়াছিলেন পাকা সাহেব হইবার জন্য। কিন্তু ঐ বয়সেই পুত্র প্রাচ্য-ভাবরাজিতে ভরপূর এবং তাহার ঐশ্বর্য্য দেখাইয়া এক মহাপণ্ডিতের অকুণ্ঠ প্রশংসা পাইলেন। অপরদিকে পিতাও আনন্দিত যে তাঁহার পুত্র প্রাচ্যের বৈশিষ্ট্য দেখাইয়াছে।

আমরা আর বুঝিলাম যে, বাল্যকাল হইতে একান্ত বিলাতী শিক্ষায় শিক্ষিত, বিলাতী আবহাওয়ায় মানুষ হইলেও, ষোল-সতের বৎসর বয়সেই তাঁহার মধ্যে ভারতীয় সত্তা জাগ্রত হইয়াছিল এবং স্বেচ্ছা-অধ্যয়ন দ্বারা তিনি লোকচক্ষুর অন্তরালে প্রাচ্যের সংস্কৃতির সহিত পরিচিত হইয়াছিলেন। ইহার পরিণতি আমরা তাঁহার জীবনের দুই-চারি বৎসরের মধ্যে দেখিব।

কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করিয়াই শ্রীঅরবিন্দ সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা দিলেন (১৮৯০) এবং কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হইলেন।

লাটিন ও গ্রীক ভাষার পরীক্ষায় তিনি প্রথম হইলেন, এবং বীচ্‌ক্রফ্‌ট্ নামে এক সাহেব দ্বিতীয় স্থান পাইয়াছিলেন। ভাগ্যচক্রে এই সাহেবের নিকট আলিপুর বোমার মামলায় শ্রীঅরবিন্দের বিচার হইয়াছিল। সিভিল সার্ভিসে শিক্ষানবিশীও শ্রীঅরবিন্দ করিলেন (বোধ হয় পিতাকে আশ্বাস দিবার জন্য) কিন্তু স্বেচ্ছায় ঘোড়াচড়ার পরীক্ষা দিলেন না।

বাহির হইতে দেখিলে মনে হয় শ্রীঅরবিন্দের জীবন অবস্থানুসারে গঠিত হইয়াছে, কিন্তু তাহা যে সত্য নহে তাহার প্রমাণ আই সি এসে চাকুরি গ্রহণ না করা। বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়াও তিনি সারা করিলেন না। তখনই কি তিনি উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে এক মহান্ ব্রতে তাঁহার জীবন নিয়োজিত হইবে? এ বিষয়ে তিনি মৌন। উত্তর জীবনে বার বার তিনি সাংসারিক জীবনের খেই এইভাবে কাটিয়াছেন, তবে কাহাকেও সে সম্বন্ধে একটি কথাও বলেন নাই।

এই সময়ে তিনি পূর্ব্বের ন্যায় বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ-গণ্ডীর বাহিরে স্বেচ্ছাধ্যয়ন করিতে লাগিলেন এবং নিজের চেষ্টায় ইতালীয়, জার্ম্মান ও স্পেনীয় ভাষা শিখিলেন। পূর্ব্বেই ফরাসী ভাষা শিখিয়াছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে তিন বৎসরের স্থলে দুই বৎসরের মধ্যে প্রাচীন ভাষায় 'ট্রাইপোজ' পরীক্ষায় প্রথমাংশে উত্তীর্ণ হইলেন, কিন্তু দ্বিতীয়াংশের পরীক্ষা দিলেন না, এমন কি আবেদন করিলেই ডিগ্রী পাইতেন, তাহাও করিলেন না। আই সি, এসের মত ডিগ্রীও তিনি অবলীলাক্রমে ত্যাগ করিলেন।

শ্রীঅরবিন্দ সিভিল সার্ভিসে চাকুরি না লওয়ায় পিতা কৃষ্ণধন ও আত্মীয়বর্গের আশাভঙ্গ হইয়াছিল নিশ্চয়, আর এই সময়ে পিতার টাকাও ঠিক সময়ে পৌঁছিত না। কাজেই অনেকদিন শ্রীঅরবিন্দকে অর্দ্ধাশনে কাটাইতে হইয়াছে, তবু ক্ষুধার জ্বালা উপেক্ষা করিয়া পাঠভবনে পুস্তকরাজির মধ্যে তিনি আত্মহারা হইতেন। যাহা হউক তাঁহার বৃত্তির সাহায্যে এবং খুব ব্যয়সঙ্কোচ করিয়া তিনি কোন প্রকারে প্রবাসজীবন কাটাইলেন।

জীবিকার ত একটা ব্যবস্থা করিতে হইবে, তাই স্যার হেনরি কটনের (ইনি ইংরাজ হইলেও ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের নেতা ছিলেন এবং পরে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক পরিষদের সভাপতি হন) ভ্রাতা জেমস কটন সাহেবের সহায়তায় বরোদার মহারাজা সয়াজী রাও গায়কোয়াড়ের* সহিত শ্রীঅরবিন্দ পরিচিত হন এবং বরোদা রাজ্যের কাজে নিযুক্ত হন। ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে শ্রীঅরবিন্দ ইংলণ্ড ত্যাগ করিয়া ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

---

* ইনি ১৯৩৯-এর ৬ই ফেব্রুয়ারী তারিখে দেহরক্ষা করেন। বরোদা রাজ্য ১৯৪৯-এর ১লা মে তারিখে ভারতবর্ষ রাষ্ট্রভুক্ত হইয়াছে।

তৃতীয় অধ্যায়

বরোদায় জ্ঞান-তপস্যা

বোম্বাই বন্দরে পদার্পণ করিবার সময়ে শ্রীঅরবিন্দ একটা বিরাট স্তব্ধতা অনুভব করিলেন। বোধহয় মাতৃভূমির বিরাটত্ব তিনি অনুভব করিলেন। আত্মীয়স্বজন তাঁহাকে দেখিয়া আনন্দিত হইলেন, যদিও স্নেহময় পিতা প্রবাসী সন্তানের প্রত্যাবর্ত্তন দেখিতে পাইলেন না। আত্মীয় স্বজন, পরিচিত সকলে বিস্মিত হইয়া দেখিল চৌদ্দ বৎসর বিলাতে থাকিয়া অরবিন্দ সাহেব হইয়া আসেন নাই—কবি সুরেশ চন্দ্রের ভাষায়:

"ভারতীয় নবীন যুবক
চতুর্দ্দশ বর্ষ যাপি' বৃটানিয়া দেশে
ফিরে এলো ভারতের ভারতীর কোলে
যূথিকা মল্লিকা আর শেফালি-সৌরভে
কল্যাণ হাতের দেয়া অঙ্গনের শুভ্র আলিম্পনে
মঙ্গল হাতের জ্বালা ধূপের সুবাসে—
অরবিন্দ তরুণ নবীন—গ্র্যাণ্ডিফ্লোরা রূপে নয়—
ফিরে এলো বঙ্গের সরসী-নীরে প্রস্ফুটিত অরবিন্দ সম
ফিরে এলো মা'র বুকে মায়ের সন্তান—কুমকুমে আনন্দ রচে
প্রাণ-কাড়া সুমধুর সানায়ের ইমন-কল্যাণে।*

রাম যেমন চৌদ্দ বৎসর বনবাসে কাটাইয়া স্বরাজ্যে ফিরিয়া আসেন, তেমনি চৌদ্দ বৎসর প্রবাসে থাকিয়া শ্রীঅরবিন্দ স্বদেশের স্বরাজ্য সাধনে নিমগ্ন হইলেন পশ্চিম ভারতের সুবিখ্যাত বরোদা রাজ্যে। বরোদা

---

* শ্রীঅরবিন্দ—(অরবিন্দ জীবনী গাথা)—শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী (১৩৫১)।

গুজরাতের সংস্কৃতির অন্যতম কেন্দ্র। কর্ম্মবহুল আহমেদাবাদ, এমন কি বোম্বাই সহরের অত নিকটে অবস্থিত হইলেও, বরোদা সহরে এক অপূর্ব্ব শান্তি অনুভব করা যায়। সহরের চারিদিকে প্রান্তর, অদূরে একটি অনুচ্চ একক পাহাড়, সহরের মধ্যে মহারাজের কয়েকটি সুসজ্জিত প্রাসাদ, ছায়াবহুল রাজপথ এক স্বপ্নময় আবেশের সৃষ্টি করে। ষ্টেশনের নিকটেই কলেজ—ঐখানে শ্রীঅরবিন্দ প্রায় বার বৎসর শিক্ষা দান করিয়াছেন। বোধকরি কলেজের নিকটেই কোথাও তাঁহার বাসা ছিল। ঐ অঞ্চলটি বড়ই নির্জন।

বর্ত্তমানে কলেজের নিকটই পরলোকগত সয়াজী রাওয়ের বিরাট স্মৃতি মন্দির স্থাপিত হইয়াছে। উহার চারিদিকে তৃণাচ্ছাদিত ভূমি; সন্ধ্যায় বড়ই মনোরম বোধ হয়। উপযুক্তভাবেই কীর্ত্তিমান নৃপতির কীর্ত্তি স্মরণ করায়। ইনি শ্রীঅরবিন্দকে গভীর শ্রদ্ধা করিতেন ও ভালবাসিতেন। শ্রীঅরবিন্দ যখন বরোদা ছাড়িয়া বাংলার কর্ম্মক্ষেত্রে আসেন, মহারাজার লোক কয়েকদিন কলিকাতায় আসিয়া ধর্না দিয়া বসিয়াছিল শ্রীঅরবিন্দকে ফিরাইয়া লইবার জন্য।

এই মনোরম আবেষ্টনের মধ্যে শ্রীঅরবিন্দের জ্ঞান-তপস্যা, সাহিত্য-সাধনা ও রাজনীতিক পরিকল্পনা চলিতে লাগিল। চৌদ্দ বৎসর বিলাতে থাকিয়া তিনি পাশ্চাত্যের জ্ঞান-সমুদ্রের অমূল্য রত্নরাজি আহরণ করিয়াছিলেন, বরোদায় একযুগ তিনি প্রাচ্যের অনাদি অনন্ত জ্ঞানার্ণবে নিমগ্ন রহিলেন। এই তপস্যায় তিনি ছিলেন একক, আর তাঁর অধ্যয়ন বিলাতে থাকার সময়ের মতই ছিল অতন্দ্র। তাঁর এই জ্ঞান-তপস্যার বিশেষত্ব এবং যুগ-আবেষ্টন সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা যাক।

শ্রীঅরবিন্দ যখন বিলাতে অধ্যয়ন করিতেছিলেন তখন ভিক্টোরীয় যুগের মধ্যভাগ উত্তীর্ণ হইয়াছে। ফরাসী বিপ্লবের চূর্ণ তরঙ্গগুলি ইয়ুরোপের নানা দেশে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। শিল্প-বিপ্লবের ফল ফলিতেছে, বিজ্ঞান জড়বাদের ভিত্তি-আশ্রয়ী হইতেছে, দর্শন নিশ্চিততার

গর্ব্ব-ধর্ম্মী হইতেছে, আর জন-সাধারণ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও গণতন্ত্রের নেশায় মশগুল হইয়া উঠিয়াছে। সাহিত্যে অজানার আকুলতা, নব-সৃষ্টির প্রেরণা উবিয়া যাইতেছে, সাহিত্য স্রষ্টাদের মানব ও বিশ্ব সম্বন্ধে রঙীন নেশা কাটিতেছে। কাজেই এ যুগের ইংরাজ কবি টেনিসন, ব্রাউনিং প্রভৃতি নীতিবাদী। শেলী, কীট্স প্রভৃতি বিখ্যাত কবিদের উপর টান আছে বটে, কিন্তু সাহিত্যে কাব্য অপেক্ষা নভেলের প্রভাব বাড়িতেছে।

এই আবহাওয়ায় চৌদ্দ বৎসর কাটাইয়াও শ্রীঅরবিন্দ এই যুগ-ধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন না। তাঁর তীক্ষ্ণধী এই সকল রাজনীতিক, সামাজিক, নৈতিক এবং সাহিত্যিক গতি-প্রগতি বিশ্লেষণ করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইল, ইহা শ্রেয় নহে, ইহা পূর্ণতার পথ নহে। ইহা পরিবর্ত্তনশীল যুগের একটা রূপ মাত্র।

এই সত্য হৃদয়ঙ্গম করিয়াই শ্রীঅরবিন্দ পাশ্চাত্যের মোহে মুগ্ধ হইলেন না, তিনি শাশ্বত ভারতের দিকে ফিরিলেন—ভারত সংস্কৃতিতে তন্ময় হইলেন, তথ্য ও তত্ত্বানুসন্ধানে। সুতরাং আমাদের ধারণা করাই ভুল যে, তিনি নিছক পাণ্ডিত্য অর্জনের জন্য এত অধ্যয়ন করিতেছিলেন কিংবা রস উপভোগের জন্য সাহিত্যের মধ্যে মগ্ন হইয়াছিলেন।

অবশ্য আমাদের দেশেও পাশ্চাত্যের মোহ ঐ যুগেই কাটিতে আরম্ভ করিয়াছিল। আমাদের দেশের মহামনা ব্যক্তিদের অনেকেই কিয়ৎকাল পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুসরণ অপবর্গ লাভের উপায় মনে করিতেন, কিন্তু তাহার বিরুদ্ধে দাঁড়াইলেন রাজা রামমোহন, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র, ঋষি রাজনারায়ণ এবং সর্ব্বোপরি শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস এবং স্বামী বিবেকানন্দ। সাহিত্যে নবযুগ আনয়ন করিলেন বঙ্কিমচন্দ্র, মাইকেল, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, বিদ্যাসাগর এবং রবীন্দ্রনাথ। মূলকথা এই যুগেই পরবর্ত্তী যুগের সর্ব্বক্ষেত্রে বিপ্লবের সূচনা হইয়াছিল। রাজনীতি-ক্ষেত্রে জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা হইল ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে

এবং সুরেন্দ্রনাথ, দাদাভাই নওরোজি, গোখ্‌লে প্রভৃতি রাজনীতিক ধুরন্ধরগণ জন-উদ্বোধনে প্রবৃত্ত হইলেন।

স্বল্পভাষী, আত্মপ্রচার-বিরোধী শ্রীঅরবিন্দ লোকচক্ষুর অগোচরে বরোদায় বসিয়া এই সকল দেশব্যাপী গতি-প্রগতি একান্ত নিষ্ঠার সহিত পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন এবং শ্রেয়লাভের (ব্যক্তিগত নহে, এমন কি জাতিগত নহে, সমগ্র মানবজাতির জন্য) পথ অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। ইহার কি ফল বার-তের বৎসর পরে ফলিয়াছিল তাহা আমরা ক্রমশঃ দেখিব।

বরোদা রাজ্যে শ্রীঅরবিন্দ প্রথমত কাজ শিখিবার জন্য সেট্‌লমেন্ট বিভাগে নিযুক্ত হইলেন, পরে ষ্ট্যাম্প ও রাজস্ব বিভাগে কিছুদিন কাজ করিলেন, কিছুদিন আবার দপ্তরে রহিলেন। অচিরে মহারাজ বুঝি-লেন যে, শিক্ষাদানই শ্রীঅরবিন্দের পক্ষে উপযুক্ত কাজ, সুতরাং তিনি কলেজে ফরাসী ভাষার শিক্ষক নিযুক্ত হইলেন, পরে ইংরাজীর অধ্যাপক হইলেন এবং অবশেষে দক্ষতার জন্য সহকারী অধ্যক্ষ পদ লাভ করিলেন। অধ্যক্ষ ছিলেন একজন ইংরাজ। সকলেই শ্রীঅরবিন্দকে গভীর শ্রদ্ধা করিত তাঁহার অপূর্ব্ব পাণ্ডিত্য ও দেব-চরিত্রের জন্য। এতদিন পরে প্রকাশ পাইয়াছে ঐ ইংরাজ অধ্যক্ষ শ্রীঅরবিন্দকে কি চোখে দেখিতেন।

গত ১৯৪৯ খৃষ্টাব্দে অন্ধ্রবিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর সি, আর, রেড্ডী মহাশয় বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ হইতে শ্রীঅরবিন্দকে 'স্যর কাট্টামঞ্চী রামালিঙ্গ রেড্ডী জাতীয় পুরস্কার' প্রদান করিবার সময়ে যে অপূর্ব্ব অরবিন্দ-প্রশস্তি করেন, তাহার মধ্যে উল্লেখ করেন উপরোক্ত ইংরাজ অধ্যক্ষ রেড্ডী মহাশয়ের নিকট শ্রীঅরবিন্দ সম্বন্ধে কি বলিয়া-ছিলেন। অধ্যক্ষ এ, বি, ক্লার্ক মহাশয় বলেন : "তাহা হইলে আপনি অরবিন্দ ঘোষকে দেখিয়াছেন। আপনি কি তাঁহার চোখ দুটি লক্ষ্য করিয়াছিলেন ? তাহার মধ্যে যেন এক রহস্যময় বহ্নি (mystic fire) এবং জ্যোতি রহিয়াছে। তাহা যেন ইহজগতের উপরে ঊর্দ্ধ্ব রাজ্য ভেদ করিতেছে।" তিনি আরও বলেন : "জোয়ান

অফ আর্ক যদি দিব্য স্বর শুনিতেন, অরবিন্দ হয়ত দিব্য-দৃষ্টিতে দেখেন (probably sees heavenly visions)।"*

মহারাজাও একান্তভাবে শ্রীঅরবিন্দের গুণগ্রাহী ছিলেন এবং রাজকার্য্য ছাড়া উভয়ের মধ্যে নিবিড় ব্যক্তিগত সম্বন্ধ ছিল। এমন কি মহারাজা একবার শ্রীঅরবিন্দকে ইংরাজী ব্যাকরণের খুঁটিনাটি শিখাইতে বলেন। দীনেন্দ্রকুমার রায় (যিনি শ্রীঅরবিন্দকে বাংলা শিখিবার সহায়তা করিবার জন্য কিছুকাল বরোদায় ছিলেন) "অরবিন্দ প্রসঙ্গ" নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন যে, ইংরাজীতে ভাল করিয়া কিছু লিখিবার দরকার হইলেই মহারাজা শ্রীঅরবিন্দকে ডাকাইতেন। কখন কখন মহারাজা গুরুত্বপূর্ণ কাজের জন্য তাঁহাকে বাহিরেও পাঠাইতেন। এইরূপে শ্রীঅরবিন্দ একবার মাদ্রাজের শৈলাবাস উতকামণ্ডে প্রেরিত হইয়াছিলেন। আর একবার শ্রীঅরবিন্দ মহারাজার সঙ্গে যুক্তপ্রদেশের শৈলাবাস নৈনিতালে ছিলেন। মহারাজার কাশ্মীর ভ্রমণ সময়ে শ্রীঅরবিন্দ তাঁহার প্রাইভেট সেক্রেটারীরূপে সঙ্গী হইয়াছিলেন। স্বাধীনচেতা শ্রীঅরবিন্দের মনোভাব মহারাজা ভালই বুঝিতেন, তাই অবশেষে তাঁহাকে আর রাজদরবারে ডাকিতেন না, শ্রীঅরবিন্দ অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা লইয়াই থাকিতেন।

দীনেন্দ্রকুমার তাঁহার পুস্তকে শ্রীঅরবিন্দের জ্ঞান-তপস্যার একটি মনোরম চিত্র আঁকিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন : "এমন অদ্ভুত পাঠানুরাগ আমি আর দেখি নাই।...অরবিন্দের পুস্তক কদাচিৎ বুকপোষ্টে আসিত ; প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড প্যাকিং-বাক্সে বোঝাই হইয়া রেল-পার্শেলে পুস্তকগুলি আসিত ; এমন পার্শেল মাসে দুইতিন বারও আসিত। অরবিন্দ সেই সকল কেতাব আটদশ দিনের মধ্যে পড়িয়া ফেলিতেন। আবার নূতন নূতন পুস্তকের অর্ডার যাইত।"

* রেড্ডী মহাশয় মন্তব্য করেন : "ক্লার্ক সাহেব ছিলেন একান্ত জড়বাদী। আমি বুঝিতেই পারিনা যে ঐ সংসারবুদ্ধিপরায়ণ অথচ চমৎকার লোকটি কি করিয়া অরবিন্দ সম্বন্ধে সত্যের আভাষ পাইয়াছিলেন, যদিও তখন তাহা ফুটিয়া বাহির হয় নাই।"

অপর একস্থলে দীনেন্দ্রকুমার, শ্রীঅরবিন্দ বরোদার যে একটি বাসায় থাকিতেন তাহার নানা অসুবিধা উল্লেখ করিয়া, লিখিয়াছেন : "এমন কদর্য্য গৃহে বাস করিতে অরবিন্দের বিন্দুমাত্র আপত্তি বা কুণ্ঠা দেখি নাই। তিনি নির্ব্বিকার চিত্তে দীর্ঘকাল সেই জীর্ণ গৃহে বাস করিয়াছিলেন। অরবিন্দ রাত্রি একটা পর্য্যন্ত দুঃসহ মশক-দংশন উপেক্ষা করিয়া, টেবিলের ধারে একখানি চেয়ারে বসিয়া, 'জুয়েল ল্যাম্পের' আলোকে সাহিত্যালোচনা করিতেন। তাঁহাকে পুস্তকের উপর বদ্ধদৃষ্টি অবস্থায় একইভাবে ঘন্টার পর ঘন্টা ধরিয়া সেই স্থানে উপবিষ্ট দেখিতাম--যোগ-নিমগ্ন তপস্বীর ন্যায় বাহ্যজ্ঞানশূন্য। ঘরে আগুন লাগিলেও বোধহয় তাঁহার হুঁস হইত না।"

বরোদায় থাকিতে শ্রীঅরবিন্দ বিশেষ করিয়া ভারতীয় সাহিত্য, শাস্ত্ররাজি, যোগ-দর্শন প্রভৃতি অধ্যয়ন করেন। সংস্কৃত ভাষায় নিজের চেষ্টায় গভীর পাণ্ডিত্য লাভ করেন এবং কয়েকটি ভারতীয় ভাষা—গুজরাতি, মারাঠি এবং বাংলা ভাল করিয়া আয়ত্ত করেন। বাংলা তিনি নিজেই ভাল করিয়া শিখেন, দীনেন্দ্রকুমার কিছু সহায়তা করিতেন; এবং বাংলায় তাঁহাকে কথাবার্ত্তা বলিতে অভ্যস্ত করাইতেন। শ্রীঅরবিন্দ বাংলা ভাষা যে কি সুন্দরভাবে আয়ত্ত করিয়াছিলেন তাহার পরিচয় আমরা "কারাকাহিনী" ও "জগন্নাথের রথ" পুস্তকে এবং "ধর্ম্ম" সাপ্তাহিকের পাতায় পাতায় পাই। উত্তরকালে শ্রীঅরবিন্দ আর বাংলায় বিশেষ কিছু লিখেন নাই, তাহার কারণ তাঁহার বক্তব্য যে জগদ্বাসীকে শুনিতে হইবে। সকল ভাষার মধ্যে এক ইংরাজী ভাষাই জগতের অধিকাংশ লোক বুঝে। বাংলা, গুজরাতি, হিন্দী, মারাঠি, তামিল, তেলেগু প্রভৃতি ভাষায় তাঁহার যোগ-দর্শন ব্যাখ্যা করিতেছেন তাঁহার যোগ্য পণ্ডিত শিষ্যবর্গ।

ভারতীয় ভাষাগুলির প্রতি শ্রীঅরবিন্দের গভীর অনুরাগ তাঁহার নানালেখায় প্রকাশ পাইয়াছে। কবি সুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর একটি লেখায় আমরা জানিতে পারি যে, কলিকাতা ত্যাগ করিয়া পণ্ডিচারী

যাইবার পূর্ব্বে শ্রীঅরবিন্দ তামিল ভাষা শিক্ষা করিতেছিলেন। তামিল সাহিত্যের, সংস্কৃতি ও ধর্ম্মপুস্তকের সহিত তাঁহার পরিচয় আছে* তাহার প্রমাণ আছে 'আর্য্যের' কোন প্রবন্ধে।

বরোদায় এই গভীর জ্ঞান-তপস্যায় শ্রীঅরবিন্দের সত্তায় পূর্ণ জ্ঞান-কুম্ভের উদয় হইল। এই জ্ঞান-সূর্য্যের উষার লালিমায় উদ্ভাসিত হইল স্বদেশীযুগের বাংলা—তাহার ছটা পড়িল সারা ভারতে। আজ এই জ্ঞানসূর্য্য জগতের মধ্যাহ্নাকাশে মধ্যাহ্ন-গায়ত্রীরূপে ভাস্বর। দেশ-বাসী তাঁহার অপূর্ব্ব জ্ঞানের প্রথম পরিচয় পাইল 'বন্দেমাতরম' 'কর্ম্ম-যোগিন' ও 'ধর্ম্ম' পত্রিকায়—উজ্জ্বলতর দীপ্তি প্রকট হইল 'আর্য্যে'।

বরোদা শ্রীঅরবিন্দের পূর্ণতর সাহিত্য-সাধনারও ক্ষেত্র, যে সাধনার সুরু হইয়াছিল তাঁহার জ্ঞানোদয়ের সহিত। তাঁহার সাহিত্য-সুধার কিছু পরিচয় পাওয়া গেল বরোদায়, স্বদেশীযুগের বাংলায়, আর যে সুধা নিরবধি পান করা যায় তাহা মিলিল তাঁহার পণ্ডিচারী-প্রয়াণের পর। প্রথমে কাব্য ও গীতিকাব্য, অবশেষে মহাকাব্য। সূর্য্য সাবিত্রীরূপে প্রতিভাত হইল—শ্রীঅরবিন্দের মহাকাব্য হইল "সাবিত্রী"। কাব্য-সাবিত্রীরও প্রথমোদয় বরোদায়।

---

* শ্রীঅরবিন্দ আবাল্য একদেশদর্শিতার বহু উর্দ্ধে। তিনি যোগ বিষয়েও শুধু ভারতীয় যোগধারাগুলির সহিত পরিচিত নহেন, The Riddle of this World পুস্তকের একস্থানে দেখা যায় যে, তিনি ইসলামিয় যোগ-ধারার সহিতও পরিচিত। খৃষ্টীয় যোগের ত' কথাই নাই।

চতুর্থ অধ্যায়

বরোদা ঃ দেশমাতৃকার বোধন

১৯৪৮ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে পণ্ডিচারী হইতে শ্রীঅরবিন্দ ও তাঁহার আশ্রম সম্বন্ধে একটি সুন্দর পুস্তিকা বাহির হইয়াছে। তাহাতে শ্রীঅরবিন্দের বিলাতে বাল্য-জীবন ও বরোদা-জীবন সম্বন্ধে কয়েকটি মূল্যবান তথ্যের সন্ধান পাই যাহা পূর্ব্বে অজানা ছিল। শ্রীঅরবিন্দ সাত বৎসর বয়সে বিলাতে যান, এগার বছর বয়সের আগেই তিনি উপলব্ধি করেন যে, জগতে অদূর ভবিষ্যতে একটা বিরাট আলোড়ন হইবে এবং অভূতপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন ঘটিবে, যাহাকে বিশ্ব-বিপ্লব বলা যায়, এবং তাহাতে বিশেষভাবে তাঁহাকে অনেক কিছু করিতে হইবে। এই আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়াই তিনি তাঁহার শিক্ষাদীক্ষা নিয়ন্ত্রণ করেন।

১৯১৪ হইতে ১৯২১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত "আর্য্যে" তাঁহার যে লেখাগুলি বাহির হয় তাহার সহিত যাঁহারই কিছুমাত্র পরিচয় আছে, তিনিই উপলব্ধি করিবেন শ্রীঅরবিন্দের দৃষ্টি কি ব্যাপক ও গভীর। এই লেখাগুলির অনেকাংশ পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে, সুতরাং আধুনিক কালের লোকের পক্ষে তাহা সহজপ্রাপ্য হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে শুধু "দিব্য-জীবন" বা নব বেদ পাঠ করিলেই যে অসামান্য দৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়, সে দৃষ্টি শুধু জ্ঞান-দীপ্তি নয়, তাহা সাক্ষাৎ 'পুরুষ-পুরাণমের' দৃষ্টি। বাল্যকাল হইতেই শ্রীঅরবিন্দের এই বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় পাওয়া যায়।

এই দৃষ্টি-ভঙ্গীর জন্যই দেশমাতার স্পর্শ না পাইয়াও এবং দীর্ঘকাল পরবাসী হইয়াও শ্রীঅরবিন্দ বাল্যেই দেশমাতার সেবায় সকলের অজানিতে আত্মোৎসর্গ করেন। তাঁহার পিতার মধ্যে অত সাহেবিয়ানা থাকা

সত্ত্বেও তিনি ভারতে ইংরাজ-রাজের স্তাবক ছিলেন না, তিনি ভারতে ইংরাজ-শাসনের যান্ত্রিকতা ও হৃদয়হীনতার কঠোর সমালোচনা করিয়া মাঝে মাঝে পুত্রকে পত্র দিতেন। তখন ইংরাজ ভারতীয়দের সহিত অত্যন্ত দুর্ব্ব্যবহার করিত, তাহার যেসকল কাহিনী ভারতীয় সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইত পিতা কৃষ্ণধন তাহা কাটিয়া পুত্রের নিকট পাঠাইতেন। কাজেই, আশ্চর্য্য নাই, পুত্র অত অল্প বয়সে দেশভক্ত ও ইংরাজ- রাজের সমালোচক হইয়া উঠিলেন, আর বুঝিলেন যে ইংরাজকে ভারত হইতে হঠাইতে হইলে এক কঠোর ব্রত গ্রহণ করিতে হইবে।

দেশপ্রেমের জন্য শ্রীঅরবিন্দকে পরোক্ষভাবে ইংরাজের রোষের পাত্র হইতে হয় আই, সি, এস-এর ব্যাপার লইয়া। অবশ্য ঘোড়ায় চড়ার শেষ পরীক্ষা শ্রীরঅরবিন্দ ইচ্ছা করিয়াই দেন নাই, আর তিনি ইচ্ছা করিয়াই ঘোড়ায় চড়া শিখেন নাই, কিন্তু শুধু ঘোড়ায় চড়া পরীক্ষা না দিলে যে আই, সি, এস এর চাকুরি পাওয়া যায় না ইহা বোধহয় একমাত্র শ্রীঅরবিন্দের ভাগ্যেই ঘটিয়াছে। কয়েকটি অনুরূপ ক্ষেত্রে আই, সি, এসের শিক্ষানবিশী বিলাতে কোন বিষয়ে কৃতকার্য্য না হইলেও, তাহাকে ভারতে পাঠাইয়া পুনর্ব্বার সুযোগ দেওয়া হইয়াছে। শ্রীঅরবিন্দের ব্যাপারে ঐ সামান্য সুযোগ পাইয়াই যে ইংরাজ-রাজ তাঁহার নাম খারিজ করিয়া স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিলেন তাহার কারণ শ্রীঅরবিন্দের দেশ-হিতৈষণা। অবশ্য শ্রীঅরবিন্দও দেশ-হিতৈষণার জন্য অমন দেবজনবাঞ্ছিত চাকুরি বর্জন করিলেন তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।*

* ১৯২১ খৃষ্টাব্দে সুভাষচন্দ্র বসু আই, সি, এস পরীক্ষায় কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হইয়াও প্রকাশ্যভাবে ঘোষণা করিয়া চাকুরি ত্যাগ করেন। শ্রীঅরবিন্দ ওরূপ প্রকাশ্যভাবে রাজ-চাকুরি বর্জ্জন করেন নাই দুইটি কারণে : প্রথমত, তখনকার দিনে ওরূপ প্রকাশ্যভাবে একক কাহারও দাঁড়ান একান্ত অবিমৃষ্যকারিতা হইত; দ্বিতীয়ত, শ্রীঅরবিন্দ তাঁহার নিজের কোন বিষয় প্রচার করিতে পরাঙ্মুখ। তাহার উপর তিনি গূঢ় কারণ প্রকাশ্যে বিবৃত করিলে আত্মীয়বর্গ তাঁহার উপর একান্ত নারাজ হইতেন।

ঐ সময়ে শ্রীঅরবিন্দ দেশ-হিতৈষণার কিছু প্রকাশ্য পরিচয় বিলাতেই দিতে থাকেন। তিনি কেম্ব্রিজের ভারতীয় মজলিশের অন্যতম সদস্য ছিলেন এবং তাহার সেক্রেটারী হন। তখন তিনি কয়েকটি বিপ্লবাত্মক বক্তৃতা দেন। সেগুলি ইংরাজ কর্ত্তাদের অগোচর ছিল না। পরে শ্রীঅরবিন্দ জানিতে পারেন যে ঐ কারণে একটা সামান্য অছিলা লইয়াই ইংরাজ-রাজ তাঁহাকে আই, সি, এসএর ব্যূহে প্রবেশ না করিতে দিয়া স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে। শুধু বক্তৃতা দেওয়া নয়, শ্রীঅরবিন্দ ঐ সময়ে তাঁহার ভ্রাতাদ্বয়ের সহায়তায় বিলাত-প্রবাসী ভারতীয়দের লইয়া এক ক্ষুদ্র বিপ্লবী সঙ্ঘ গঠন করেন। তখন তাঁহারা প্রবীণ দাদাভাই নওরোজির মধ্যপন্থী নীতির বিরুদ্ধতা করিতে থাকেন। ইংলণ্ডে নওরোজির বেশ প্রতিষ্ঠা ছিল এবং তিনি একবার পার্লামেন্টের সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন, যেমন পরবর্ত্তী যুগে উগ্রপন্থী আর একজন পার্শী, সাপ্রুজি সাকলাতওয়ালা নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। ইংলণ্ড ত্যাগ করিবার কিছুকাল আগে শ্রীঅরবিন্দ ভারতীয়দের এক গুপ্ত সভায় যোগদান করেন, তাহাতে Lotus and Dagger (অরবিন্দ ও কৃপাণ ?) নামে এক গুপ্ত সমিতি গঠন করেন। অবশ্য সমিতির প্রাণের পরিচয় পাওয়া যায় নাই, অর্থাৎ এক বৈঠকের পর আর বৈঠক হয় নাই, কিন্তু প্রতিষ্ঠা-দিবসের উপস্থিত সভ্যবর্গ এই প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করেন যে, প্রত্যেকেই একটা নিরূপিত কাজ করিবেন যাহাতে ভারতে বৈদেশিক শাসনের বিপর্য্যয় ঘটে। কেহ কেহ ব্যক্তিগতভাবে প্রতিজ্ঞা রক্ষা করেন—তাঁহাদের অন্যতম শ্রীঅরবিন্দ। কি করিয়া তিনি সেই প্রতিজ্ঞা রক্ষা করেন তাহা তাঁহার বরোদা-জীবনের শেষভাগে দেখিতে পাইব।

যে কালে শ্রীঅরবিন্দ বিলাতে ছিলেন তাহা ইংরাজ ইতিহাসের একটা বিশেষ রাজনীতিক পর্ব্ব। ঐ কালেই গ্ল্যাডষ্টোন তাঁহার উদার নীতির জন্য জগতের প্রশংসাভাজন হন। শাসনতন্ত্রে জন-কর্ত্তৃত্ব ব্যাপকতা লাভ করে, বহু লোক নির্ব্বাচন-অধিকার লাভ করে।

রাজার কর্ত্তৃত্ব একেবারে হ্রাস পাইয়া পার্লামেন্টেই একদল সর্ব্বে-সর্ব্বা হয়। আইরিশ জাতির স্বাধীনতার সংগ্রাম নূতন রূপ ধারণ করে। পার্নেলের নাম চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে।* গবর্ণমেন্ট জনসাধারণের অধিকার সম্বন্ধে সচেতন হয়। মজুরদিগের অবস্থার উন্নতির প্রচেষ্টা সুরু হয়। শ্রীঅরবিন্দ যখন বিলাতে তখন কার্ল মার্কস পরলোক গমন করেন। মার্কসের প্রচারেরই ফলেই পাশ্চাত্যের সকল দেশেই মজুর-জীবনের পরিবর্ত্তন ঘটিতে আরম্ভ হয়।

অপরপক্ষে ইংরাজ-জাতি অনুভব করে যে যুদ্ধবিগ্রহ নিরর্থক, জাতিদের মধ্যে শান্তি-প্রতিষ্ঠাই শ্রেয়। মানব-মিলন ও বিশ্বশান্তির আদর্শের কিছু পরিচয় রাজকবি আলফ্রেড টেনিসনের কবিতায় পাওয়া যায়। "রণ দামামা যাবে না আর শোনা, রণকেতন হবে উড্ডীন মানব-সংসদে, যা যুক্ত করবে বিশ্বের রাষ্ট্রগুলিকে"—এই ছিল টেনি-সনের স্বপ্ন। কিন্তু রাষ্ট্রীয় ঐক্য বলিতে পাশ্চাত্য বুঝিত কেবল ইয়ুরোপেরই ঐক্য, কারণ আমেরিকা তখন ইয়ুরোপের ব্যাপার লইয়া মাথা ঘামাইত না। আর ইয়ুরোপের মধ্যে সেরা জাতি তখনকার দিনে ছিল ইংরাজ, যাহার সাম্রাজ্যে কখনও সূর্য্যাস্ত হইত না! ইয়ুরোপীয় জাতিদের মূল লক্ষ্য ছিল যে যার গণ্ডীতে সসাগরা ধরণী উপভোগ করা, আর ধারণা ছিল জাতিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ শ্বেতজাতিগুলিই।

ইংলণ্ডের এবং সমগ্র জগতের অবস্থা শ্রীঅরবিন্দ পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পর্য্যালোচনা করিতেন, চিন্তা করিতেন, উপলব্ধি করিতেন আর তাঁহার দৃষ্টি প্রসারিত করিতেন সুদূর ভবিষ্যতে। আর তাঁহার হৃদয়ের কেন্দ্র ছিল স্বদেশ ভারতবর্ষ, তাঁহার ধ্যানজ্ঞান ছিল জগতের পরিপ্রেক্ষায় ভারতের অবস্থা—আর ভাবী ভারতের রূপ। তাঁহার প্রতীতি জন্মিয়া-ছিল ভারতের মুক্তি ব্যতীত তাহার স্বপ্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা নাই, আর ভারতের স্বপ্রতিষ্ঠা হইলেই জগতের একটা বিরাট পরিবর্ত্তন ঘটিবে।

* শ্রীঅরবিন্দের কিশোর কবিতার মধ্যে একটি পার্নেলের প্রশস্তিতে রচিত।

মানব-মিলনের আদর্শের সনাতন ভিত্তির রহস্যের সন্ধান এক ভারতই দিতে পারে। তাহা হইতেছে ভারতের অধ্যাত্মবাদ।

এই কারণেই ভারতে ফিরিয়া শ্রীঅরবিন্দ বরোদার শান্তিময় আবেষ্টনের মধ্যে অধ্যাত্ম-চর্চায় নিমগ্ন হইলেন। কিন্তু ইহার লক্ষ্য ছিল না আত্ম-মুক্তি—উদ্দেশ্য ছিল দেশমাতৃকার বোধন। তখনকার অবস্থায় কি করিয়া তাঁহা সম্ভব হইবে? ইংরাজের পূর্ণ-কবলে তখনকার ভারত, তাহার দর্পে দেশ প্রকম্পিত। বিদেশীকে তাড়াইবার শেষ চেষ্টা হইয়াছে প্রায় ৪০ বৎসর পূর্ব্বে; তাহার পরে দেশ মুহ্যমান। কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, রাজনীতিক জড়তা কিছু পরিমাণে দূর হইয়াছে, কিন্তু দেশের অতি সামান্য অংশের উপর উহার প্রভাব। দেশের প্রাণ ত জাগে নাই; কি করিয়া জাতিকে জাগান যায় ইহাই ছিল মৌন, শান্ত, তপস্বী শ্রীঅরবিন্দের ধ্যান জ্ঞান। প্রথমে তিনি রাজনীতিক কৌশলের সন্ধান করিতে লাগিলেন। তাহার পরে সন্ধান করিলেন যোগ-কৌশলের। এ যোগ তাঁহার আত্মতৃপ্তির জন্য নহে, এ যোগের উদ্দেশ্য ছিল কর্ম্ম-কৌশল আয়ত্ত করা। যোগই যে গূঢ়ভাবে কর্ম্ম-কৌশল!

বরোদায় আসিবার অব্যবহিত পরেই শ্রীঅরবিন্দ "ইন্দু প্রকাশ" নামক বোম্বাইএর এক ইংরাজী সাপ্তাহিকে ধারাবাহিক ভাবে কয়েকটি প্রবন্ধ লিখেন।* ইহাদের মধ্যে কতকগুলি ছিল রাজনৈতিক নিবন্ধ, অপর কতকগুলি সমালোচনামূলক। লেখাগুলি ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দের ৭ই আগষ্টের সংখ্যা হইতে সুরু হয় এবং পর বৎসর ৬ই মার্চের সংখ্যা পর্য্যন্ত চলে। সাপ্তাহিকখানির সম্পাদক ছিলেন শ্রীঅরবিন্দের কেম্ব্রিজের বন্ধু কে, জি, দেশপাণ্ডে।

রাজনৈতিক প্রবন্ধগুলি শ্রীঅরবিন্দের অপূর্ব্ব দেশপ্রেম এবং তরুণ-হৃদয়-নিহিত অন্তরাগ্নির পরিচায়ক, যে অগ্নি কয়েক বৎসর পরেই

* এই লেখাগুলি অনেকদিন সাধারণের অজানা ছিল। "জীবন ও যোগের" প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হইবার পরেই (১৯৩৯) এ গুলির পুনরুদ্ধার হয়; সুতরাং প্রথম সংস্করণে ইহার উল্লেখ নাই।

"বন্দেমাতরমের" উদ্দীপক লেখায় পরিস্ফুট হয়। তখনই তিনি কংগ্রেসী নীতির তীব্র সমালোচনা করিতে আরম্ভ করেন, কারণ কংগ্রেস তখন ছিল মুষ্টিমেয় লোকের প্রতিষ্ঠান, জাতীয় প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয় নাই, জাতিকে জাগাইতে পারে নাই, সুতরাং জাতির হৃদয়ে স্থান পায় নাই। আশ্চর্য্য যে সদ্য বিলাত-প্রত্যাগত শ্রীঅরবিন্দ কংগ্রেসের ইংরাজীপনা সহ্য করিতে পারিলেন না, তিনি ইহাকে পূরাপূরি স্বদেশী-ভাবাপন্ন করিতে চাহিলেন। স্মরণ রাখিতে হইবে এটা ছিল ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দ, ইহার ১২ বৎসর অর্থাৎ ঠিক এক যুগ পরে বঙ্গভঙ্গ উপলক্ষে জাতীয় জাগরণ ঘটে। সুদূর অতীতে ২১ বৎসরের যুবক কি লেখাই লিখিতেছেন! লিখিতেছেন :

"আমাদের যথার্থ শত্রু আমাদের বাহিরের কোন শক্তি নয়, আমাদের শত্রু হইতেছে আমাদের সুব্যক্ত দুর্ব্বলতা, আমাদের কাপুরুষতা, আমাদের অর্দ্ধানন্দ ভাবালুতা।...(সুতরাং) আমাদের আবেদন, যাহা হইতেছে যে কোন উচচাত্মাবিশিষ্ট, আত্মসম্মানজ্ঞানপরায়ণ জাতির আবেদন, অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানের মতামতের নিকট নহে, ইংরাজের ন্যায়বুদ্ধির নিকটও নহে—আমাদের আবেদন হইতেছে আমাদের নিজের পুনর্জাগ্রত পুরুষত্বের নিকট, আমাদের নিজেদের ঐকান্তিক পারস্পরিক সহানুভূতির নিকট—আর এ সহানুভূতি মৌন দুঃখভোগী ভারতের জনসাধারণের জন্য।"

কয়েক বৎসর পরেই শ্রীঅরবিন্দ তাঁর সহধর্ম্মিণী মৃণালিনী দেবীকে লিখিত এক পত্রে এই ভাব চমৎকার বাংলায় ব্যক্ত করিয়াছেন : "আমি জানি এই পতিত জাতিকে উদ্ধার করিবার বল আমার গায়ে আছে ; শারীরিক বল নয়—তরবারি বা বন্দুক নিয়া আমি যুদ্ধ করিতে যাইতেছি না—জ্ঞানের বল। ক্ষত্রতেজ একমাত্র তেজ নহে, ব্রহ্মতেজও আছে, সেই তেজ জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত। এই ভাব নূতন নহে, আজকাল-কার নহে ; এই ভাব নিয়া আমি জন্মিয়াছিলাম, এই ভাব আমার মজ্জাগত, ভগবান এই মহাব্রত সাধন করিতে আমাকে পৃথিবীতে

পাঠাইয়াছিলেন। চৌদ্দ বৎসর বয়সে বীজটা অঙ্কুরিত হইতে লাগিল, আঠার বৎসর বয়সে প্রতিষ্ঠা দৃঢ় ও অচল হইয়াছিল।"

বার বৎসর পরে জাতি যখন জাগিল তখন এই আত্মপ্রতিষ্ঠার আদর্শ লইয়াই জাগিল। আজও স্বাধীন ভারতে কি আমরা পুরুষত্বের প্রয়োজন অনভব করিতেছি না? আর একটা প্রবন্ধে শ্রীঅরবিন্দ কংগ্রেসী নীতির সমালোচনা করিয়া বলিলেন যে, কংগ্রেস এখনও জন-প্রতিষ্ঠান হয় নাই, কংগ্রেসী নেতারা অসত্য রাজনৈতিক দেবতাদের (বিশেষ করিয়া ইংরাজ-সৃষ্ট) ভজনা করিতেছেন; আর ভারতের দেশপ্রেমিকদের ইংরাজ অপেক্ষা ফরাসীদের নিকট জাতি-সংগঠনের কৌশল অনেক কিছু শিখিবার আছে। অর্থাৎ, শ্রীঅরবিন্দ ইঙ্গিত করিতেছেন যে, আমাদের জাতীয় প্রচেষ্টা জন-জাগরণে নিয়োজিত হইলেই আমরা আত্মপ্রতিষ্ঠ হইতে পারিব এবং তাহাতে আমাদের জাতীয় সিদ্ধি সম্ভব হইবে। বলা বাহুল্য, আমাদের জীবনেই দেখিলাম যে, এই কৌশলেই স্বাধীনতা লাভ হইল।

শ্রীঅরবিন্দের এই রাজনৈতিক প্রবন্ধগুলির নাম ছিল 'পুরাণো-দীপের পরিবর্তে নূতন দীপাবলী' (New Lamps for Old)। তদানীন্তন কংগ্রেসী নীতির আলোচনা ছাড়া শ্রীঅরবিন্দ জাতীয় চরিত্রের দুর্ব্বলতা, জাতির পঙ্গুতার কারণ সম্বন্ধে আলোচনা করেন। তাঁহার তরুণ বয়সে ঐ অপূর্ব্ব বিশ্লেষণী শক্তি দেখিয়া আশ্চর্য্য লাগে। তিনি শিক্ষিত বাঙ্গালী যুবকের চরিত্রের অপূর্ণতা আলোচনা করিয়া শিক্ষা-প্রণালীর সমালোচনা করেন। অপরপক্ষে তিনি সিভিল সার্ভিস-ভুক্ত শাসকসম্প্রদায়ের চরিত্রের ও শিক্ষার অপূর্ণতা সম্বন্ধেও তীব্র মন্তব্য প্রকাশ করেন।

তাঁহার সমালোচনামূলক প্রবন্ধের মধ্যে বঙ্কিম-প্রতিভার আলোচনা বিশেষত্বপূর্ণ। বাংলা সাহিত্যের মধ্যে প্রবেশ করিয়া শ্রীঅরবিন্দ বঙ্কিমের ব্যক্তিত্বের প্রতি বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট হন। উত্তরকালে বঙ্কিমকে তিনি ঋষি আখ্যা দেন; বঙ্কিম সম্বন্ধে তাঁহার সুবিদিত ইংরাজী

প্রবন্ধ বঙ্কিমকে যথার্থ অমর করিয়াছে। শ্রীঅরবিন্দ কি তখন বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে বঙ্কিমের 'বন্দেমারতম' মন্ত্র কয়েক বৎসরের মধ্যে জাতিকে জাগাইবে—কোন এক শুভ মুহূর্ত্তে, বিশেষ কাহারও নির্দ্দেশ বিনা জাতি এই প্রাণপ্রদ মন্ত্র গ্রহণ করিবে? বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দ-মঠকে' শ্রীঅরবিন্দ ও তাঁহার অনুচরবর্গই বাস্তব রূপ দিবার চেষ্টা করেন। এককালে 'আনন্দমঠের' অনুরূপ 'ভবানী মঠ' গঠনেরও প্রচেষ্টা হইয়াছিল।

শ্রীঅরবিন্দের রাজনৈতিক লেখাগুলিতে তখনকার মধ্যপন্থী কংগ্রেসী নেতারা সন্ত্রস্ত হইয়া পড়েন (সত্য সমালোচনা কয়জন সহ্য করিতে পারেন্ ?) এবং জনৈক নেতা "ইন্দু প্রকাশ" সম্পাদক দেশপাণ্ডে মহাশয়কে সাবধান করেন যে, এরূপ লেখা ছাপাইলে তিনি বিপন্ন হইবেন। সুতরাং শ্রীঅরবিন্দ লেখা বন্ধ করিলেন; তাঁহার বক্তব্য প্রকাশ করিবার সুযোগ মিলিল না। শ্রীঅরবিন্দের "কারাকাহিনীর" একস্থানে উল্লেখ আছে যে, বিখ্যাত কংগ্রেসী নেতা এবং সমাজ-সংস্কারক মহামতি রাণাড়ে একবার শ্রীঅরবিন্দের সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং তাঁহাকে রাজনীতি চর্চা হইতে বিরত থাকিতে উপদেশ দেন এবং তাঁহাকে কারা-সংস্কার প্রভৃতি গঠনমূলক প্রবন্ধ লিখিতে বলেন।

এইরূপে শ্রীঅরবিন্দ প্রকাশ্য লেখাগুলি বন্ধ করিয়া দেন। বোধ-হয় তিনি অনুভব করেন যে, উপযুক্ত ক্ষণ তখনও উপস্থিত হয় নাই। তাই তিনি একদিকে ভারতীয় সাহিত্য, দর্শন প্রভৃতি অধ্যয়নে নিমগ্ন হন, অন্য দিকে গুপ্ত-সমিতি স্থাপনদ্বারা বিপ্লবের প্রারম্ভিক কাজ সুরু করেন। অবশ্য এই কাজ সুরু হয় তাঁহার বরোদা-জীবনের শেষ-ভাগে। তিনি সংস্কৃত স্বচেষ্টায় শিক্ষা করিয়া বেদ, উপনিষদগুলি এবং অন্যান্য দর্শনগ্রন্থ পড়িয়া ফেলেন; কালিদাস প্রভৃতি প্রাচীন কবিদের কাব্য-প্রতিভা উপলব্ধি করেন এবং নিজেও কাব্য-সৃষ্টিতে ব্রতী হন।

অপরদিকে তিনি ধীরে ধীরে যোগপথেও আকৃষ্ট হন। বরোদা প্রবাসকালের প্রারম্ভে তাঁহার বন্ধু দেশপাণ্ডে মহাশয় যোগফলের কথা

বলেন, কিন্তু শ্রীঅরবিন্দ তাহাতে বিশেষ অনুরাগ দেখান নাই। কয়েক বৎসরের মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণ এবং স্বামী বিবেকানন্দের পুস্তকাবলী এবং উপনিষদাবলী ও ভারতীয় সংস্কৃতির নানাবিধ পুস্তক পড়িয়া তিনি আধ্যাত্মিক সাধনের প্রেরণা অনুভব করেন। অবশ্য ইংলণ্ডে থাকিতেই তাঁহার আন্তর অভিজ্ঞতা হইত এবং ভারতে আসিয়া তাহা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে লাগিল। এই প্রেরণা অনুভব করিবার পর তিনি কিছুকাল উপযুক্ত গুরুর সন্ধান করিয়াছিলেন, কিন্তু সত্য কথা বলিতে, তাঁহার গুরু-গ্রহণ হয় নাই। তিনি নর্ম্মদাতীরে রঙ্গনাথ নামক স্থানে স্বামী ব্রহ্মানন্দের সাক্ষাৎ পাইয়াছিলেন (ইনি দেওঘরের স্বামী বালানন্দের গুরু) এবং পরে লেলে মহারাজ নামক জনৈক মহারাষ্ট্রীয়ের নিকট কিছু সাধন কৌশল শিখিয়াছিলেন। কিন্তু এ সবই ছিল উপলক্ষ মাত্র, যোগপথে তিনি হৃদয়স্থিত ব্রহ্ম-বর্ত্তিকায় অগ্রসর হইলেন নানা বিপর্য্যয়ের মধ্য দিয়া।

বরোদায় থাকিতেই শ্রীঅরবিন্দ ভূপালচন্দ্র বসু মহাশয়ের কন্যা মৃণালিনীদেবীকে* বিবাহ করেন। তিনি ছিলেন শ্রীঅরবিন্দের যোগ্য সহধর্ম্মিণী—তাঁহাকে শ্রীঅরবিন্দ জীবন-ব্রতে আবাহন করিয়াছিলেন এই অপূর্ব্ব ভাবে :...."তুমি কি পাগলের উপযুক্ত পাগ্‌লী হইবার চেষ্টা করিবে, যেমন অন্ধরাজার মহিষী চক্ষুদ্বয়ে বস্ত্র বাঁধিয়া নিজেই অন্ধ সাজিলেন ?" আর সহধর্ম্মিণীকে দেশ-মাতৃকার এই অপূর্ব্ব অভিজ্ঞান দিয়াছিলেন : "অন্য লোকে স্বদেশকে একটা জড় পদার্থ, কতকগুলা মাঠ, ক্ষেত্র, বন, পর্ব্বত, নদী বলিয়া জানে ; আমি স্বদেশকে মা বলিয়া জানি, ভক্তি করি, পূজা করি।"

---

* ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে, শ্রীঅরবিন্দ যখন পণ্ডিচেরীতে, মৃণালিনী দেবী বঙ্গবাসী কলেজের প্রতিষ্ঠাতা স্বনামধন্য ৺গিরিশচন্দ্র বসু মহাশয়ের কলিকাতার আবাসে দেহরক্ষা করেন।

পঞ্চম অধ্যায়

বিপ্লবাগ্নি

এইবার যে পর্ব্বের কথা লিখা হইতেছে তাহা ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসের এক গুপ্ত অধ্যায়। ইহার কথা এক স্বয়ং শ্রীঅরবিন্দ ও তাঁহার একান্ত অনুগত অনুচরবর্গ বলিতে পারেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই পরলোকে। এ সম্বন্ধে কাহারও কাহারও একটা ধারণা আছে, কাহারও কাহারও ধারণা ভ্রমপূর্ণ। এমন কি শ্রীঅরবিন্দের সহিত যাঁহারা আলিপুর বোমার মামলায় আসামী ছিলেন, তাহার মধ্যে এক জন ঘটনাবলীর ভুল বা বিকৃত বিবরণ দিয়াছেন এবং শ্রীঅরবিন্দের রাজনৈতিক উদ্দেশ্যের যে বিশ্লেষণ করিয়াছেন তাহা হাস্যোদ্দীপক।

সৌভাগ্যের বিষয় ভারত স্বাধীন হইবার পরে পণ্ডিচারী আশ্রম হইতে শ্রীঅরবিন্দের জীবনের ঘটনাবলী সম্বন্ধে একখানি ক্ষুদ্র ইংরাজী পুস্তিকা বাহির হইয়াছে, যাহা অমূল্য তথ্যপূর্ণ। তাহাতে জাতীয় সংগ্রামের ইতিহাসের সেই অজ্ঞাত অধ্যায়টি আমাদের চোখের সামনে ভাসিয়া উঠিয়াছে। এখানে শ্রীঅরবিন্দের রাজনীতি সম্বন্ধে যে তথ্য দেওয়া যাইতেছে তাহা ঐ পুস্তিকা অবলম্বনেই লিখিত।

এখন স্পষ্ট বুঝা গিয়াছে যে, দেশকে স্বাধীন করিবার ব্রত লইয়াই শ্রীঅরবিন্দ ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। তাহার প্রথম নিদর্শন "ইন্দু প্রকাশে" লিখিত সাতটি রাজনৈতিক প্রবন্ধ। ইহার কয়েক বৎসর পরেই শ্রীঅরবিন্দ স্বাধীনতা সংগ্রামের কর্ম্মপ্রণালী নিরূপণ করেন এবং স্বয়ং এই কাজে ব্রতী হন। শ্রীঅরবিন্দের ধারণা হয় যে, জাতীয় সংগ্রামকে ত্রিধারায় পরিচালিত করিতে হইবে।

একদিকে গুপ্ত সমিতি গঠন দ্বারা বিদ্রোহমূলক আদর্শ প্রচার করিতে হইবে, জাতিকে বীর্য্যবান করিয়া তুলিতে হইবে এবং সশস্ত্র বিদ্রোহের জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে।

অপরদিকে, প্রকাশ্য প্রচার দ্বারা, অর্থাৎ সংবাদপত্রে লেখা এবং বক্তৃতাদি দ্বারা জাতিকে স্বাধীনতার আদর্শে উদ্বুদ্ধ করিতে হইবে। তখনকার দিনে অধিকাংশ লোক পূর্ণ স্বাধীনতার আদর্শকে নিছক পাগ্‌লামি ছাড়া আর কিছু মনে করিত না।

তৃতীয় পন্থা হইবে, প্রকাশ্যভাবে জনসংঘ গঠন করা, যাহা সাহসিকতার সহিত সরকারের বিরোধিতা করিবে, এবং বৈদেশিক শাসনের ভিত্তি শিথিল করিবে অসহযোগ ও নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ দ্বারা।

যদিও তখন ইংরাজের বিক্রমে ধরণী প্রকম্পিত তথাপি শ্রীঅরবিন্দ সশস্ত্র বিপ্লবের প্রচেষ্টাকে বাতুলতা মনে করেন নাই। বিলাতে থাকার সময়ে তিনি দেখিয়াছিলেন যে ক্ষুদ্র আইরিশ জাতি কিরূপে দুর্দ্ধর্ষ ইংরাজশক্তিকে নাস্তানাবুদ করিয়াছিল। তখনও লড়াইএর কায়দা মামুলি ধরণের ছিল এবং এক রাইফেল ও গেরিলা যুদ্ধ দ্বারা বৃহৎ শক্তিকে অতিষ্ঠ করিয়া তোলা যাইত।* তাহার উপর যদি ভারতীয় সেনাবাহিনীকে বিপ্লবী মনোভাবাপন্ন করিয়া তোলা যায়? এককালে ত সিপাহী-বিদ্রোহ হইয়াছিল, তাহার স্মৃতি ভারতীদের মনে ত চির-জাগরূক!

নব্য বাঙ্গালীর মধ্যে ক্ষাত্রধর্ম্ম একেবারেই স্তিমিত হইয়া পড়িয়াছিল। সৌখিন শিক্ষিত বাঙ্গালী 'বাবু' আখ্যা পাইয়াছিল এবং বাঙ্গালী মস্তিষ্কের যতই কেরামতি দেখাক না কেন তাহার বাহুবলের কথা ভারত ভুলিয়া গিয়াছিল। ইংরাজের কৃপায় সামরিক বাহিনীতে

* আশ্চর্য্যের বিষয় দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে কয়েকটি শত্রু-কবলিত দেশ বিশেষ করিয়া গেরিলা যুদ্ধের উপযোগিতা দেখাইয়াছে। আমাদের দেশে গেরিলা যুদ্ধের অপূর্ব্ব কৌশল দেখান বীর যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (বাঘা যতীন) আর তাঁর স্বল্প কয়েকজন অনুচর, উড়িষ্যার সমুদ্রতটে (১৯১৫)।

বাঙ্গালীর কোন স্থান ছিল না। সুরেশ বিশ্বাস সুদূর ব্রাজিল দেশে যাইয়াই বীরত্ব দেখাইতে পারিয়াছিলেন।

শ্রীঅরবিন্দ যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় নামে এক বীর যুবককে তাঁহার পরম বন্ধু লেফ্‌টেনান্ট মাধব রাও যাদবের সহায়তায় বরোদার সৈন্যবিভাগে পদাতিকরূপে প্রবেশ করান। এই যতীন্দ্রনাথই শ্রীঅরবিন্দ-নির্দ্দিষ্ট গুপ্তসমিতি গঠন করিবার জন্য কিছুকাল পরে বাংলায় আসেন। শ্রীঅরবিন্দ স্বয়ং তাঁহাকে পাঠান এবং কর্ম্মকৌশল শিখাইয়া দেন। নানারূপ সংঘ সমিতি গড়িয়া বিপ্লবাত্মক প্রচার চালান, দলে যুবকদের ভিড়ান এবং অবস্থাপন্ন ব্যক্তিদের সাহায্য ও সহানুভূতি আকর্ষণ করা, ইহাই ছিল কর্ম্মকৌশল। আর যুবকদের উৎসাহ দেওয়া হইতে লাগিল শরীরচর্চায়, কুচকাওয়াজ করায় এবং নানারূপ শারীরিক কসরৎ শিক্ষা করায়।

তখন বাংলায় পি, মিত্র নামে একজন দেশপ্রাণ ব্যারিষ্টার ছিলেন, তিনি এই কার্য্যে বিশেষ উৎসাহী হন। তাঁহার সংগঠিত দলগুলি লাঠিখেলায় সুদক্ষতা লাভ করিল, এ বিষয়ে স্বর্গীয়া সরলা দেবীও বিশেষ উৎসাহী ছিলেন। (অনেকদিন পরে ইনি বাংলায় বীরাষ্টমী ব্রত প্রবর্ত্তন করেন)। এই প্রচেষ্টার ফলে বাংলার যুবকবৃন্দ উৎসাহের সহিত ক্ষাত্রধর্ম্ম গ্রহণ করিল। স্বামী বিবেকানন্দের প্রচারে বাংলার নৈতিক ক্ষেত্র বেশ উর্ব্বর হইয়াছিল, এখন যেন তাহাতে বীজ নিক্ষিপ্ত হইল।*

পশ্চিম ভারতেও এই সময়ে এক গুপ্ত-সমিতি গঠিত হয়। তাহার এক সদস্যের সঙ্গে শ্রীঅরবিন্দের দেখা হয়। ইহার পরামর্শ-সমিতির সহিত শ্রীঅরবিন্দকে পরিচিত করিয়া দেওয়া হয় এবং তিনি ইহার প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করেন, যেমন বিলাতে থাকিতে তিনি এক গুপ্ত সমিতির প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করিয়াছিলেন। বাংলায় ব্যারিষ্টার পি, মিত্রের ও

* স্বামীজি স্বদেশী আন্দোলন সুরু হইবার দুই বৎসর পূর্ব্বে (১৯০৩) দেহরক্ষা করেন।

অপরাপর বিপ্লবপন্থীদের সহিত তিনি সমিতির বিষয়ে আলোচনা করেন এবং তাঁহারা এই সমিতির প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করেন এবং শ্রীঅরবিন্দের নির্দ্দেশমত চলিতে রাজি হন। অবশ্য এই সমস্ত গুপ্ত সমিতি সম্বদ্ধ হয় নাই, যাহা শ্রীঅরবিন্দের আদর্শ ছিল, কিন্তু ইহাদের উৎসাহে ও নিষ্ঠায় দেশে নবপ্রাণের সঞ্চার হইল। শ্রীঅরবিন্দ ছুটির সময়ে কলিকাতায় দীর্ঘকাল থাকিয়া এই প্রকারে দেশাত্ম-উদ্বোধনের সাধনা করিতেন। সাধনা-কেন্দ্র অবশ্য তখনও বরোদায়। সেই সময়ে শ্রীঅরবিন্দের কনিষ্ঠ ভ্রাতা বারীন্দ্রকুমার বরোদায় যান (তিনি কলেজের পড়া ছাড়িয়া দিয়াছিলেন) এবং অগ্রজের নিকট দেশ-সেবার মহান ব্রত গ্রহণ করেন।

ইতোমধ্যে লোকমান্য তিলকের সহিত শ্রীঅরবিন্দের সাক্ষাৎ হয়। লোকমান্য ইতিপূর্ব্বে কারাদণ্ড ভোগ করিয়া দেশখ্যাত হইয়াছিলেন। শ্রীঅরবিন্দ অনুভব করিলেন যে, লোকমান্য একজন অসামান্য বিপ্লবী নেতা। আহমেদাবাদ কংগ্রেসে তিলকের সহিত শ্রীঅরবিন্দের দেশের অবস্থা লইয়া আলোচনা হয়। তিলক শ্রীঅরবিন্দকে লইয়া পাণ্ডালের বাহিরে আসেন। উভয়ের মধ্যে এক ঘন্টা আলোচনা চলে এবং তিলক রাজনৈতিক সংস্কারপন্থী আন্দোলনের প্রতি তাচ্ছিল্য প্রকাশ করেন। তিনি মহারাষ্ট্রে তাঁহার কর্ম্মপ্রণালী কি তাহা বলেন। রাজনীতি ক্ষেত্রে এই দুই পরম দেশপ্রেমিকের* নিবিড় বন্ধুত্বের+

* স্বদেশীযুগে বিখ্যাত ইংরাজ সাংবাদিক নেভিনসন সাহেব ভারত ভ্রমণে আসিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার এক পুস্তকে তদানীন্তন ভারতের এক সুন্দর চিত্র আঁকিয়াছেন। তাহাতে তিনি শ্রীঅরবিন্দ ও লোকমান্য তিলকের কথা বিশেষ করিয়া লিখিয়াছেন। তিনি যে শ্রীঅরবিন্দের সত্তার স্পর্শ অনুভব করিয়াছিলেন তাহা বেশ বুঝা যায়। তাঁর লেখায় লোকমান্যের মহত্ত্ব ও ঔদার্য্য সুন্দরভাবে ফুটিয়াছে।

\+ কয়েক বৎসর পূর্ব্বে লেখক পুনার তিলক-তীর্থ "কেশরী"-কার্য্যালয়ে গিয়াছিলেন। সেখানে তিলকের দৌহিত্র কেতকরের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। তিনি লেখককে লোকমান্যের তিরোধানের পরে লিখিত কয়েকখানি তিলক-প্রশস্তি পুস্তক

সূত্রপাত। স্বদেশী আন্দোলনের সময়ে এই কারণেই বাংলা ও মহারাষ্ট্র পূর্ণ-স্বাধীনতার আদর্শে উদ্দীপিত হইয়াছিল। আর কয়েক বৎসর পরে মজঃফরপুরের বোমার কথা লিখিয়াই লোকমান্যের ছয় বৎসর কঠোর কারাদণ্ড হইল। লোকমান্যের যখন বিচার চলিতেছিল তখন শ্রীঅরবিন্দ বিচারাধীন অবস্থায় কারাগারে।

জাতির জীবনে সন্ধিক্ষণ আসিতে বিলম্ব হইল না। শ্রীঅরবিন্দের আবাহনেই যেন দেশমাতৃকা জাগ্রত হইলেন। জাতি নূতনের স্বপ্ন দেখিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর রাজনৈতিক আশা-আকাঙক্ষা বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভেই পূর্ণ হইল। সে শুভক্ষণ আসিল বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন উপলক্ষ্য করিয়া। এই আন্দোলনেও শ্রীঅরবিন্দ পূর্ব্বের ন্যায় অন্তরালে থাকিয়া কাজ করিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু "বন্দেমাতরমে" লেখার জন্য অভিযুক্ত হওয়ায় একদিনেই তিনি ভারত-খ্যাত হইলেন। বাংলার জাতীয় কবি রবীন্দ্রনাথ আবেগভরে তাঁহাকে আবাহন করিলেন—
'অরবিন্দ, রবীন্দ্রের লহ নমস্কার!'

শ্রীঅরবিন্দ রাজনীতি-ক্ষেত্রে আবির্ভূত হওয়ায় বিপ্লবের ত্রিধারা, পূর্ব্বে যাহা বলা হইয়াছে, প্রবাহিত হইল। প্রকাশ্যভাবে জাতির নিকট পূর্ণ স্বাধীনতার আদর্শ প্রচার করা হইতে লাগিল; গুপ্ত সমিতি সুপ্ত জাতিকে আবার প্রাণবন্ত ও বীর্য্যকামী করিল; জাতীয় আন্দোলনের লক্ষ্য হইল জাতিকে ইংরাজ-শাসনের অনাচারের বিরুদ্ধে উত্থিত করা আর স্বাদেশিকতার দ্বারা আত্মপ্রতিষ্ঠ করা। এই উদ্দেশ্যেই জাতীয় দল গঠিত হইল, এবং এই দলই জাতীয় কংগ্রেসকে প্রভাবান্বিত করিবার জন্য বিবিধ উপায়ে চেষ্টা করিতে লাগিল। এই জাতীয় দলের আদর্শই উত্তরকালে কংগ্রেস গ্রহণ করিল এবং তাহার ফলে কালক্রমে স্বাধীনতা সংগ্রাম সফল হইল।

উপহার দেন। প্রসঙ্গক্রমে কেতকর মহাশয় বলেন যে, লোকমান্যের সম্বন্ধে যতগুলি লেখা বাহির হইয়াছে তাহার মধ্যে শ্রীঅরবিন্দের লেখাই শ্রেষ্ঠ। লেখক অবশ্য শ্রীঅরবিন্দের কোন উল্লেখও করেন নাই।

মাত্র তিন কি সাড়ে তিন বৎসর শ্রীঅরবিন্দ প্রকাশ্যভাবে রাজনীতি-ক্ষেত্রে ছিলেন ; তাহার মধ্যে এক বৎসর জেলে। কিন্তু এই স্বল্প-কালের মধ্যে তিনি জাতিকে তাঁহার রাজনীতিক ও আধ্যাত্মিক আদর্শে এরূপভাবে প্রভাবান্বিত করিলেন যে, জাতির দেহে যেন নব-জীবনের সঞ্চার হইল।

ষষ্ঠ অধ্যায়

বন্দে মাতরম্

এই অধ্যায়ে জাতীয় ইতিহাসের যে পর্ব্বের বর্ণনা করা যাইতেছে তাহাকে ভারতের এক স্বর্ণ-যুগ বলা চলে। কালে বোধ হয় ইহা লইয়া এক নব পুরাণ রচিত হইবে। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের ঠিক পঞ্চাশ বৎসর পরে ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে আসিল বিপ্লবের সন্ধিক্ষণ এবং ইহার ঠিক চল্লিশ বৎসর পরে ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দে ভারত স্বাধীন হইল। অবশ্য বলা যাইতে পারে ১৯০৫ খৃষ্টাব্দ হইতে এই পর্ব্বের সুরু, কারণ ঐ বৎসরেই ইংরাজের বিধানে বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ হয় এবং তাহারই প্রতিক্রিয়ায় জাতীয় আন্দোলনের প্রারম্ভ। পর বৎসর স্বদেশী আন্দোলন মূর্ত্তরূপ ধারণ করে, কিন্তু পূর্ণ স্বাধীনতার আদর্শ প্রকট হয় ইহার পর বৎসর।

এই যুগে যে সকল পুণ্যশ্লোক সহীদের আবির্ভাব ঘটে তাঁহাদের গৌরবময় কাহিনী অধুনা জাতির স্মৃতিপট হইতে মুছিয়া যাইতেছে বলিয়া মনে হয়। আশা করা যায় কোন দিন কোন দেশপ্রেমিক ইঁহাদের কীর্ত্তির এক যোগ্য ইতিহাস রচনা করিবেন। যাঁহার পুণ্য-জীবনী এই পুস্তকের বিষয়বস্তু, তিনি ছিলেন ইঁহাদের অগ্রণী। সুতরাং তাঁহার কীর্ত্তিতেও ইঁহাদের কীর্ত্তি পরোক্ষভাবে বিঘোষিত হইবে।

পূর্ব্ব অধ্যায়ে বলা হইয়াছে যে, বরোদায় থাকিতেই শ্রীঅরবিন্দের বাংলা ও মহারাষ্ট্রের মধ্যে বিশেষ যোগাযোগ স্থাপিত হয়। বঙ্গভঙ্গের প্রাক্কালেই শ্রীঅরবিন্দ বাংলায় সংগঠন কার্য্যে বিশেষ তৎপর হন। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন সুরু হইবার পরেই তাঁহার কর্ম্মতৎপরতা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় এবং ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে তিনি বরোদার চাকুরি হইতে বিনাবেতনে দীর্ঘ ছুটি লইয়া পূর্ণভাবে রাজনৈতিক কর্ম্মে আত্মনিয়োগ করেন।

যখন তিনি জাতীয়-শিক্ষা-পরিষদের অধ্যক্ষতা গ্রহণ করেন তখনই জনসাধারণ তাঁহার কথা জানিতে পারে ; আর সেই সময়ে তিনি প্রকাশ্যভাবে বরোদার চাকুরিতে ইস্তফা দেন।

বিশেষ করিয়া ১৯০৪ হইতে ১৯০৭ পর্য্যন্ত শ্রীঅরবিন্দের বহু-মুখী কর্ম্মের গতি অনুসরণ করা বা তাহার যথাযথ বিবরণ দেওয়া সম্ভব নহে। মোটামুটিভাবে বলা যাইতে পারে যে, রাজনীতি-ক্ষেত্রে আত্মপ্রকাশ করিবার পূর্ব্বেই তিনি জাতীয়দলের শুধু মূল নীতিগুলি নির্দ্ধারণ করেন নাই, তিনিই সুনিপুণভাবে কর্ম্মপ্রণালীও ঠিক করিয়া-ছিলেন। তিনি বাংলায় আসিয়াই ঐ মহান্ আদর্শে অনুপ্রাণিত নেতৃ-বর্গ ও কর্ম্মীবৃন্দের সহিত কাজ সুরু করেন। একদিকে গুপ্ত সমিতি গঠনের কাজ চলে, অপর দিকে প্রকাশ্য রাজনৈতিক দল গঠন ও জাতীয় আদর্শ প্রচারের কাজ চলে। এই কাজে তিনি বিপিনচন্দ্র পালের সহিত বাংলার নানা স্থানে ভ্রমণ করেন। প্রচারের কাজে তিনি বিপিনচন্দ্র কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত 'বন্দেমাতরম' কাগজে লিখিতে থাকেন। অপরদিকে যখন তিনি জাতীয় শিক্ষাপরিষদের অধ্যক্ষতা গ্রহণ করেন, তখন তিনি জাতীয় শিক্ষার আদর্শ প্রচারে এবং প্রতিষ্ঠান সংস্থাপনে উদ্যোগী হন।

বঙ্গভঙ্গ উপলক্ষ্যে দেশব্যাপী যে বিরাট বিক্ষোভ ঘটে, শ্রীঅরবিন্দ সেই উদ্দীপনায় সশস্ত্র বিপ্লবের ক্ষেত্র প্রস্তুত করিবার কাজে ব্রতী হন। এই কার্য্যে তাঁহার কনিষ্ঠ সহোদর বারীন্দ্রকুমার বিশেষ উৎসাহী ছিলেন। তাঁহারই অনুরোধে শ্রীঅরবিন্দ সেই অগ্নিযুগের "যুগান্তর" পত্রিকা স্থাপনে সম্মত হন। সকলেই জানেন এই কাগজের ব্রত ছিল প্রকাশ্য বিদ্রোহের আদর্শ প্রচার করা, ইংরাজ শাসন একেবারেই অস্বীকার করা এবং গেরিলা-যুদ্ধ-কৌশল সম্বন্ধে ইঙ্গিত দেওয়া। শ্রীঅরবিন্দ নিজেই গোড়ার দিকে কয়েকটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন এবং তিনি সাধা-রণ ভাবে কাগজটি পরিচালনা করিতেন, যদিও ইহার অগ্নিময় লেখক-বৃন্দের মধ্যে মুখ্য ছিলেন বারীন্দ্রকুমার ও উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

"যুগান্তর" যখন অভিযুক্ত হয় তখন শ্রীঅরবিন্দের নির্দ্দেশেই স্বামি বিবেকানন্দের ভ্রাতা ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত ইংরাজ আদালতে আত্মপক্ষ সমর্থন করিতে অস্বীকার করেন। ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের "সন্ধ্যাও" পরে "যুগান্তরের" যোগ্য সহযোগী হইয়াছিল।

এইখানে একটা কথা বলার দরকার যে, শ্রীঅরবিন্দের ইঙ্গিতে প্রতিষ্ঠিত এই গুপ্তসমিতিগুলির মূল আদর্শ সন্ত্রাসবাদ ছিল না, উদ্দেশ্য ছিল সশস্ত্র বিদ্রোহের উদ্যোগ করা। শ্রীঅরবিন্দ বহুপূর্ব্বেই বুঝিয়াছিলেন যে জনসাধারণের সাহায্য ব্যতীত বিপ্লব সাফল্যলাভ করিতে পারে না, এই কারণেই তিনি জাতীয় কংগ্রেসকে বুর্জোয়া বা মধ্যবিত্ত প্রতিষ্ঠান হইতে গণপ্রতিষ্ঠানে পরিণত করিতে চাহিয়াছিলেন। ১৮৯৩-৯৪তে লিখিত "ইন্দু প্রকাশে" তিনি সেই আদর্শ প্রচার করিয়াছিলেন। উত্তরকালে অবশ্য বিপ্লবীরা সন্ত্রাসবাদ নীতি গ্রহণ করে ইংরাজের পীড়ন-নীতির প্রতিক্রিয়ায় যখন উহা চরমমাত্রায় উঠে, জনসাধারণের পক্ষে দুঃসহ হইয়া উঠে। অত্যাচারীর নিপাতসাধন করা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মানবধর্ম্ম, ইহা ইতিহাস বার বার দেখাইয়াছে।

অপরপক্ষে ইংরাজী দৈনিক "বন্দেমাতরমের" লেখায় শ্রীঅরবিন্দ জাতীয়তার আদর্শ, পূর্ণ স্বাধীনতার আদর্শ, জাতীয় শিক্ষার আদর্শ, জাতীয় সংগঠনের আদর্শ, জন আন্দোলনের কর্ম্মপ্রণালী, যথা স্বদেশী, নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ প্রভৃতি প্রচার করিতেন আর ইংরাজ শাসন ও ইংরাজ চরিত্রের সমালোচনা করিতেন। অর্থাৎ শ্রীঅরবিন্দ দেশমাতাকে পরাধীনতার শৃঙ্খল-মুক্ত করিবার জন্য দুইটি অস্ত্র গড়িতেছিলেন—একদিকে বাহুতে শক্তি, অর্থাৎ সশস্ত্র বিদ্রোহ, অপর দিকে জনশক্তি-সংগঠন।

দ্বিতীয় উদ্দেশ্যের জন্য তিনি কংগ্রেসকে জাতীয় প্রতিষ্ঠানে পরিণত করিবার আশু প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিলেন। বিলাত হইতে ফিরিয়াই তাঁহার প্রতীতি হইয়াছিল যে, কংগ্রেসের নিবেদন-নীতি জাতিকে জাগ্রত করিতে পারে না। ইহার জন্য চাই স্বাধীনতার

আদর্শ। তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল, এক দিকে লেখায়, বক্তৃতায় স্বাধীনতার আদর্শ প্রচার করা, অপর দিকে সংঘশক্তিদ্বারা জাতিকে স্বাধীনতা-সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত করা। কংগ্রেস তখন জাতীয় প্রতিষ্ঠান হিসাবে খ্যাতি অর্জন করিয়াছিল। সুরেন্দ্রনাথপ্রমুখ পাণ্ডিত্যপূর্ণ মহান চরিত্র খ্যাতনামা বহু বাগ্মী দেশপ্রেমিক ছিলেন ইহার নেতা। কিন্তু ইংরাজ বুঝিত কংগ্রেসের দৌড় বেশি দূর নয়। একজন বড়লাট বিদ্রূপ করিয়াছিলেন ইহা একটি মুষ্টিমেয় ব্যক্তিদিগের প্রতিষ্ঠান। জাতীয় দল যদি ইহাকে আয়ত্ত করিতে পারে তাহা হইলে ইহা সত্যই জাতীয় প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইবে, এবং তখন ইহা স্বাধীনতা সংগ্রাম পরিচালনা করিতে পারিবে,—ইহাই ছিল শ্রীঅরবিন্দের প্রতীতি। তাঁহার আরও গভীর উদ্দেশ্য ছিল ইংরাজ-প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রের কাঠামোর মধ্যে ক্রমশঃ একটা জাতীয় রাষ্ট্র গঠন করা (State within State) এবং ইংরাজরাজের সহিত উত্তরোত্তর অসহযোগ দ্বারা তাহাকে একেবারে কাবু করিয়া ফেলা। শ্রীঅরবিন্দ ঠিক করিয়াছিলেন যে, যদি কংগ্রেসকে জাতীয়দল আয়ত্ত না করিতে পারে, তাহা হইলে একটা কেন্দ্রিক বিপ্লবী সংঘ গঠন করা হইবে।*

এই বৈপ্লবিক আদর্শানুযায়ী কার্য্য করিবার জন্য বাংলার তরুণেরা পূর্ব্ব হইতেই অনেকটা প্রস্তুত হইয়াছিলেন। এই আদর্শের আর এক সুবিখ্যাত প্রবর্ত্তক ছিলেন সখারাম গণেশ দেউস্কর। ইনি মারাঠি হইলেও বাঙ্গালী হইয়া গিয়াছিলেন। তিনি অতি সুন্দর বাংলা

---

* বঙ্গভঙ্গ উপলক্ষে অসহযোগ আন্দোলন পূর্ণরূপ গ্রহণ করে নাই। গান্ধিজীর নেতৃত্বে ১৯২০ খৃষ্টাব্দে জাতীয় কংগ্রেস অসহযোগ-নীতি গ্রহণ করে। উহার তিন বৎসর পূর্ব্বেই মডারেট বা মধ্যপন্থী দল কংগ্রেস হইতে সরিয়া পড়িয়াছিলেন। ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে সুরাটে মধ্যপন্থীদলের সহিত জাতীয় দলের সংঘর্ষ হয়। শ্রীঅরবিন্দের অভাবে জাতীয় দল একরূপ ভাঙ্গিয়া যায়, কিন্তু ১০ বৎসরের মধ্যে কংগ্রেসেই এরূপ পরিস্থিতি ঘটে যে মধ্যপন্থীদলকে সরিয়া পড়িতে হয়। শ্রীঅরবিন্দ যাহা চাহিয়াছিলেন, কালে তাহাই হইল।

লিখিতেন এবং "হিতবাদী" সাপ্তাহিক সম্পাদনা করিতেন। তাঁহার "দেশের কথা" পুস্তক বাংলায় বিপ্লববাদকে প্রাণবন্ত করিয়াছিল। "দেশের কথা" অতি সরল ভাষায় বহু বাস্তব তথ্য প্রকাশ করিয়া ইংরাজ শাসনের কুফল অকুণ্ঠভাবে প্রকট করে। বলা বাহুল্য অচিরেই এই পুস্তক ইংরাজরাজের বিধানে নিষিদ্ধ হইল। সখারামই প্রথম 'স্বরাজ' কথাটি পূর্ণ স্বাধীনতার অর্থে ব্যবহার করেন এবং ইহা এরূপ-ভাবে দেশবাসীর প্রাণস্পর্শ করে এবং চিত্তাকর্ষণ করে যে, ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা কংগ্রেসের সভাপতি দাদাভাই নওরোজি—প্রকাশ্য-ভাবে 'স্বরাজ' ভারতের আদর্শ বলিয়া ব্যক্ত করেন। অবশ্য দাদাভাই স্বরাজ অর্থে ঔপনিবেশিক স্বরাজ মনে করেন—যেমন ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে লোকদেখান স্বায়ত্বশাসন প্রতিষ্ঠিত করিবার সময়ে ডিউক অব কনট 'স্বরাজ' শব্দ ব্যবহার করেন। মধ্যপন্থীদের আদর্শ ছিল ঔপ-নিবেশিক স্বায়ত্তশাসন, তাই ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে ইংরাজ-মার্কা স্বরাজ পাইয়া তাঁহারা আহ্লাদে গদগদ হন এবং অর্দ্ধ-ইঙ্গ—অর্দ্ধ-ভারতীয় মন্ত্রিত্ব ভোগে মশগুল হন।

সখারামের লেখা পড়িয়াই বাংলা বিশেষভাবে স্বদেশী আদর্শের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে। স্বদেশীর প্রচার এবং পরদেশীর আর্থিক নাগপাশ হইতে মুক্ত হওয়া শ্রীঅরবিন্দেরও রাজনৈতিক কর্ম্ম-প্রণালীর অন্তর্ভুক্ত ছিল। বস্তুত 'বন্দেমাতরমের' লেখায় তিনিও দেশবাসীকে সর্ব্বতোভাবে স্বদেশীমন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করেন। ১৯০৬ খৃষ্টাব্দের ৭ই আগষ্ট বাংলায় স্বদেশী আন্দোলন সুরু হয়। ক্ষেত্র এমনভাবে প্রস্তুত হইয়াছিল যে বলিতে গেলে সমগ্র বাঙ্গালী জাতি কি-এক মন্ত্রবলে এই আন্দোলনে যোগদান করিল। এই আন্দোলনের প্রতিক্রিয়ায়ই ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে স্বদেশী শিল্পের পত্তন হয়, স্বদেশী কলকারখানা স্থাপনে ধনিক সম্প্রদায় উদ্যোগী হন।*

* ব্যক্তিগতভাবে বিলাত হইতে ফিরিবার পরই শ্রীঅরবিন্দ যথাসম্ভব স্বদেশী গ্রহণ করেন। দেশের কয়টা লোক তখন খাদির নাম জানিত সন্দেহ, কিন্তু

এই পর্ব্বের ইতিহাসে 'বন্দেমাতরম' ইংরাজী দৈনিক এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে, যাহার কথা দেশের অনেক লোক এখনও ভুলেন নাই। এই যুগকে বন্দেমাতরমের যুগ বলা চলে। কি ক্ষণে, যেন কাহার অলক্ষ্য প্রেরণায় জাতি বন্দেমাতরম মন্ত্র গ্রহণ করিল! কি করিয়া সহসা সহস্রকণ্ঠে বন্দেমাতরম ধ্বনি উঠিল তাহা সুরেন্দ্রনাথ তাঁহার আত্মজীবনীতে বর্ণনা করিয়াছেন। 'আনন্দমঠে' বঙ্কিম এই বিপ্লবের স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন, আর তিনি যে দৈবমন্ত্র দিয়াছিলেন তাহা যেন অলৌকিকভাবে জাতির কণ্ঠে ধ্বনিত হইল।

এই জাতীয় জাগরণের মুখপত্র হিসাবে বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয় 'বন্দেমাতরম' সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠিত করেন। বিপিনচন্দ্রের উৎসাহ ছিল অপরিমেয়, কিন্তু তাঁহার ত বিত্ত ছিল না। তিনি মাত্র পাঁচ শত টাকা পুঁজি লইয়া ঐ ইংরাজী দৈনিক বাহির করেন। বিপিনচন্দ্র এই কাজে শ্রীঅরবিন্দের সহায়তা চাহিলে তিনি সোৎসাহে ইহাতে যোগদান করেন, কারণ শ্রীঅরবিন্দ দেখিলেন যে 'বন্দেমাতরমের' লেখায় জাতীয় আদর্শ ও বিপ্লবাত্মক ভাব প্রচার করিলে তাহা ব্যাপকভাবে ফলপ্রসূ হইবে। অবশ্য জাতীয় জাগরণে "বেঙ্গলী," "অমৃতবাজার পত্রিকা" প্রভৃতি ইংরাজী দৈনিক এবং "বঙ্গবাসী", "হিতবাদী", "সঞ্জীবনী" প্রভৃতি বাংলা সাপ্তাহিকগুলির অবদান অবিস্মরণীয়; কিন্তু তাহাদের কেহই হয়ত পুরাপুরিভাবে বিপ্লবী আদর্শের মুখপত্র হইতে পারিত না; এই কারণেই শ্রীঅরবিন্দ বা তাঁহার দলের নেতৃবৃন্দ নূতন নূতন সংবাদপত্র সৃষ্টি করিলেন।

এই সময়েই শ্রীঅরবিন্দ দেশের তরুণদের জাতিসেবায় আহ্বান করিলেন এবং প্রকাশ্যভাবে নূতন রাজনৈতিক দল গড়িয়া মহারাষ্ট্রে লোকমান্য তিলক কর্ত্তৃক গঠিত দলের সহিত এক যোগে কাজ করিতে লাগিলেন। এই দলই পরে চরমপন্থী দল নামে পরিচিত হয়।

দীনেন্দ্রকুমার রায় তখনই শ্রীঅরবিন্দকে আহমেদাবাদ মিলের মোটা থাদি পরিতে দেখিয়াছেন। তাহার অনেক পরে 'মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়ের' প্রচলন হয়।

"বন্দেমাতরমকেই" দলের মুখপত্র হিসাবে গ্রহণ করা হয় শ্রীঅরবিন্দেরই পরামর্শে। এই উদ্দেশ্যে যে কোম্পানী গঠিত হইল, তিনিই তাহার ভার গ্রহণ করিলেন, কারণ বিপিনচন্দ্র তখন প্রচার উদ্দেশ্যে বাংলার জেলায় জেলায় ঘুরিতেছিলেন।

অচিরে "বন্দেমাতরম" ভারতের সংবাদপত্রের ইতিহাসে যুগান্তর আনয়ন করিল। "বন্দেমাতরমের" লেখা পড়িয়া শুধু যে দেশের লোক তারিফ করিল তাহা নয়, জাতির ধমনীতে যেন নবরক্তপ্রবাহ বহিল। শুধু যে বিপিনচন্দ্র ও শ্রীঅরবিন্দ ইহার লেখক ছিলেন তাহা নয়, ইঁহাদের যোগ্য সহকর্ম্মীদের মধ্যে সর্ব্বাগ্রে নাম করিতে হয় আত্ম-ভোলা পণ্ডিত শ্যামসুন্দরের। আর লেখকগোষ্ঠীর মধ্যে ছিলেন সুবিখ্যাত পরলোকগত ব্যারিষ্টার বি, সি, চ্যাটার্জি, লব্ধপ্রতিষ্ঠ সম্পাদক হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ প্রভৃতি আরও অনেকে।

"বন্দেমাতরম"এর লেখা যেমন একদিকে তেজঃপূর্ণ ছিল, অপর-দিকে তেমনি ইহা আইনের নাগপাশ অতি সুকৌশলে এড়াইয়া চলিত। এই কারণে অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সংবাদপত্রগুলির গাত্রদাহের অন্ত ছিল না। একবার একটা লেখার জন্য শ্রীঅরবিন্দকে সম্পাদকরূপে অভিযুক্ত করা হয়, কিন্তু তিনি যে সম্পাদক তাহা প্রমাণিত হইল না, কারণ বিপিনচন্দ্র বন্ধুর বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে অস্বীকার করিলেন। ফলে বিপিনচন্দ্রের ছয় মাস বিনাশ্রম কারাবাস ঘটিল, আর মুদ্রাকর অপূর্ব্বকৃষ্ণ বসু পাইলেন ছয় মাস সশ্রম কারাদণ্ড। তখনকার দিনে সম্পাদকের নাম কাগজে ছাপিবার নিয়ম ছিল না।

এই মামলার ফলে একদিকে যেমন শ্রীঅরবিন্দের নাম দেশময় ছড়াইয়া পড়িল, তেমনি "বন্দেমাতরম" পড়িয়া লোকে ধন্য ধন্য করিতে লাগিল। অনেকে 'বন্দেমাতরমের"সব লেখাকেই শ্রীঅরবিন্দের লেখা বলিয়া মনে করিত। শোনা যায় অতি ইংরাজী-ভক্ত বাঙ্গালীদের মধ্যে কেহ কেহ বলিতেন যে, তাঁহারা ভারতীয়দের লেখা ইংরাজী পড়েন না। কিন্তু সকালে "বন্দেমাতরম" না পড়িয়া তাঁহারা স্বস্তি পান

না। দুঃখের বিষয় ঘটনাচক্রে বিপিনচন্দ্রের সহিত "বন্দেমাতরমের" যোগাযোগ ছিন্ন হইল, কারণ তাঁহার সহিত অন্যান্য সহকর্ম্মীদের বনিবনাও হইল না, আদর্শগত মতভেদেরই জন্য। শ্রীঅরবিন্দ তখন কলিকাতায় ছিলেন না, দারুণ ম্যালেরিয়ায় ভুগিয়া তিনি তখন দেওঘরে স্বাস্থ্যোদ্ধার করিতেছিলেন। শ্রীঅরবিন্দ কলিকাতায় থাকিলে বিপিন-চন্দ্রকে যাইতে দিতেন না। একদিন কাগজে শ্রীঅরবিন্দের বিনা-নুমতিতে, তাঁহার নাম সম্পাদক বলিয়া ঘোষণা করা হয়, কিন্তু তখনও তিনি পাকাপাকি ভাবে বরোদার চাকুরি ছাড়েন নাই বলিয়া ঐরূপ করিতে নিষেধ করেন। বিপিনচন্দ্র কারাগার হইতে মুক্তি পাইয়া বিলাতে চলিয়া যান। বাংলায় পর বৎসর যখন তাণ্ডব চলিতেছিল তখন বিপিনচন্দ্র ভাগ্যক্রমে ভারতের ইংরাজ কর্ত্তাদের আয়ত্তের বাহিরে ছিলেন, নতুবা তাঁহার ভাগ্যে কি ঘটিত কে জানে?

বিপিনচন্দ্রের সহিত তাঁহার সহকর্ম্মীদের যে আদর্শগত বিরোধ* ছিল তাহার কারণ এই যে, বিপিনচন্দ্র বলিয়াছিলেন যে নূতন (জাতীয়) দলের আদর্শ হইতেছে, বৃটিশ-কর্তৃত্বমুক্ত পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন। মধ্যপন্থী-দলের (তখনকার কংগ্রেসের) আদর্শ ছিল, ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন। বিপ্লবীদল বলিলেন যে, বিপিনচন্দ্রের নীতিকে কূট ব্যাখ্যাদ্বারা মধ্য-পন্থীনীতির অন্তর্ভুক্ত বলা চলে, কারণ তখনকার দিনেও বৃটিশ উপ-নিবেশগুলি বহুল পরিমাণে ইংলণ্ডের কর্তৃত্বমুক্ত ছিল। জাতীয়বাদী দলের, তথা বিপ্লবীদলের যুক্তি ছিল এই যে, জাতিকে পূর্ণ স্বাধীনতার আদর্শে অনুপ্রাণিত না করিলে সত্য জাতীয় জাগরণ ঘটিবে না। পূর্ব্বেও বলা হইয়াছে যে দাদাভাই নওরোজি 'স্বরাজ'কে জাতীয় আদর্শ

---

* জাতীয় সংগ্রামের ইতিহাসের পরবর্ত্তী পর্ব্বেও বিপিনচন্দ্রের সহিত তাঁহার বন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয়ের তথা কংগ্রেসী দলের ঘোরতর মতভেদ ঘটে। ১৯২১ খৃষ্টাব্দে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনের বরিশাল অধিবেশনে বিপিনচন্দ্র 'স্বরাজের' স্বরূপ জানিতে চাহেন। তিনি অসহযোগ আন্দোলনের বিরোধী ছিলেন, এবং বলেন, 'I want logic not magic'.

বলেন, কিন্তু তাঁহারা অর্থাৎ কংগ্রেস স্বরাজ অর্থে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত-শাসনের অতিরিক্ত কিছু কল্পনা করাও বাতুলতা মনে করিতেন। অপরপক্ষে শ্রীঅরবিন্দ স্বরাজ অর্থে পূর্ণ স্বাধীনতা—এই আদর্শই 'বন্দে মাতরমের' মারফত দেশবাসীর নিকট প্রচার করিতেছিলেন। দেশ যে শুধু ইহার অভিনবত্বে আকৃষ্ট হইল না, ইহা ঐশী মন্ত্রের মত কার্য্য করিল—জাতি যেন নবজন্ম গ্রহণ করিল। স্বদেশী আন্দোলন যদি এই উচ্চভাব-প্রণোদিত না হইত, তাহা হইলে উহা আন্দোলন মাত্রেই পর্য্যবসিত হইত। কিন্তু তাহা হইল না। স্বদেশী আন্দোলনের উদ্দেশ্য, অর্থাৎ বঙ্গভঙ্গ নাকচ হইলেও, আন্দোলন বন্ধ হইল না, উহা স্বাধীনতা আন্দোলনে রূপান্তরিত হইল, আর জাতি স্বদেশী মন্ত্র চিরতরে গ্রহণ করিল। পরবর্ত্তী পর্ব্বেরও বুলি হইল 'স্বদেশী ও স্বরাজ'।

অবশ্য একথাও বলা দরকার যে, কংগ্রেস অনেকদিন—এমন কি অসহযোগ আন্দোলনের সময়েও—স্বরাজকে পূর্ণ স্বাধীনতা বলিয়া মনে করে নাই। কংগ্রেসের ধারণা ছিল ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন পাইলেই যথেষ্ট লাভ হইবে। ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু ইয়ুরোপ ভ্রমণ করিয়া আসিয়া বলিলেন যে, পূর্ণ স্বাধীনতার লক্ষ্য গ্রহণ না করিলে ভারত জাতিপুঞ্জের মধ্যে সমাদর লাভ করিতে পারে না। পর বৎসর কলিকাতা কংগ্রেসে ইংরাজের সহিত আপোষ করিবার শেষ চেষ্টা হইল, এবং তাহা ব্যর্থ হওয়ায় ১৯২৯ খৃষ্টাব্দের ৩১ ডিসেম্বর লাহোরের ইরাবতী তীরে কংগ্রেস পূর্ণ স্বাধীনতার ব্রত গ্রহণ করিল, এবং ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে করাচী অধিবেশনে ঐ সম্বন্ধে জাতীয় ঘোষণা করা হইল।

১৯৩১ খৃষ্টাব্দে অবশ্য বৃটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের আমূল পরিবর্ত্তন ঘটিল। উপনিবেশগুলি পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করিল ; শুধু তাহারা ঐক্যের খাতিরে ইংলণ্ডের সহিত সমপর্য্যায়ভুক্ত রহিল। এ সম্বন্ধে রাজনীতির সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধ না থাকা সত্ত্বেও, শ্রীঅরবিন্দ ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে "আর্য্যে"র এক লেখায় ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন, তাহা পরে আলোচনা করা হইবে।

সপ্তম অধ্যায়

লোকনায়ক

বরোদার চাকুরি হইতে দীর্ঘকালের ছুটি লইয়া শ্রীঅরবিন্দ দেশো-দ্বোধনের কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন, অথচ প্রকাশ্যভাবে স্বদেশী আন্দোলনে যোগদান করিতেছেন না—ইহার কারণ তাঁহার একান্ত আত্মপ্রচার-বিমুখিতা। কিন্তু তিনি আর বেশীদিন আত্মগোপন করিতে পারিলেন না, প্রকাশ্যভাবে বঙ্গীয় জাতীয় শিক্ষাপরিষদে যোগদান করিয়া বঙ্গীয় জাতীয় কলেজের অধ্যক্ষতা গ্রহণ করিলেন, আর বরোদার চাকুরিতে ইস্তফা দিলেন। শ্রীঅরবিন্দের বন্ধু পুণ্যশ্লোক রাজা সুবোধচন্দ্র মল্লিকের সহায়তায় ইহা সম্ভব হইল। সুবোধচন্দ্রের বদান্যতার যশঃসৌরভ আজও সারা বঙ্গে ব্যাপ্ত। তিনি ছিলেন যেন জাতীয় আন্দোলনের কুবের। সুবোধচন্দ্র জাতীয় শিক্ষাপরিষদে এক লক্ষ টাকা দান করেন; তাহার মধ্যে একটি সর্ত্ত ছিল যে শ্রীঅরবিন্দকে ১৫০ টাকা বেতনে কলেজে নিয়োগ করিতে হইবে। তখন তিনি বরোদার চাকুরিতে প্রায় ৮০০ টাকা বেতন পাইতেন। শুনা যায় জাতীয় কলেজের চাকুরি ছাড়িবার পর শ্রীঅরবিন্দ 'বন্দেমাতরম' হইতে মাত্র ৫০ টাকা লইতেন।

নিজের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের জন্য শ্রীঅরবিন্দ অতি সামান্য ব্যয় করিতেন। বরোদায় থাকিতে বেতনের অধিকাংশ পুস্তক-ক্রয়ে ব্যয় করিতেন। দীনেন্দ্রকুমার "অরবিন্দ প্রসঙ্গ" নামক পুস্তকে শ্রীঅরবিন্দের ব্যক্তিগত জীবনের সারল্য ও আড়ম্বরহীনতা সম্বন্ধে বিশদ বিবরণ দিয়াছেন। তিনি যেন আজীবন সন্ন্যাসী, বিত্তের মধ্যে ভোগ নাই, বিত্তের অভাবে দুঃখ নাই। জীবনে কোনদিন তাঁহার কোনরূপ চাহিদা ছিল না, অপর দিকে তাঁহার বিরাট ত্যাগের কথা তাঁহার একান্ত অন্তরঙ্গগণ ছাড়া আর কেহ জানে না।

জাতীয় শিক্ষা পরিষদে কর্ম্ম গ্রহণ করিবার কারণ হইতেছে এই যে, বহুদিন শিক্ষকতা করিয়া শ্রীঅরবিন্দের প্রতীতি হইয়াছিল যে, ইংরাজ-প্রবর্ত্তিত শিক্ষা আমাদের মানুষ করে না, ইঙ্গ-ভারতীয় এক বর্ণসঙ্কর সৃষ্টি করে। এ সম্বন্ধে তিনি বিলাত হইতে আসিয়াই "ইন্দু প্রকাশে" এক প্রবন্ধে বাঙ্গালী যুবকের চরিত্রের অপূর্ণতা আলোচনা প্রসঙ্গে, জাতীয় শিক্ষা সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ইঙ্গিত করেন। জাতীয় আন্দোলনের ভিত্তি যে জাতীয় শিক্ষা ইহাই ছিল তাঁহার নির্দ্দেশ এবং এ সম্বন্ধে তিনি কয়েকটি মূল্যবান প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, তাহার কতকগুলি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। জাতীয় শিক্ষাদানের প্রচেষ্টা স্বদেশী আন্দোলনের সময়ে হইয়াছিল, অসহযোগ আন্দোলনের প্রাক্কালেও হইয়াছে, কিন্তু সত্য বলিতে আমরা এখনও জাতীয় শিক্ষার গভীরত্ব উপলব্ধি করিতে পারি নাই। আশা করা যায় স্বাধীন ভারতে এই মহান্ আদর্শে আমাদের শিক্ষায়তনগুলি গঠিত হইবে।

শ্রীঅরবিন্দ কিন্তু বেশিদিন জাতীয় কলেজে কাজ করিতে পারিলেন না, কারণ কর্ত্তৃপক্ষের সহিত তাঁহার মতভেদ ঘটিল ছাত্রভর্ত্তির ব্যাপারে। তখন ছাত্র-নিপীড়নের যুগ। অনেকস্থলে 'বন্দেমাতরম' ধ্বনি করিলেই ছাত্রদের স্কুল বা কলেজ হইতে বাহির করিয়া দেওয়া হইত। শ্রীঅরবিন্দ এই সকল ছাত্রদিগকে অবাধে জাতীয় কলেজে ভর্ত্তি করিতে ইচ্ছুক ছিলেন, কিন্তু কর্ত্তৃপক্ষ জেদ করেন যে শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের রাজনৈতিক ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট হওয়া সঙ্গত নহে। তাঁহাদের উদ্দেশ্য ছিল এই যে, সরকারী শিক্ষায়তনগুলির অপূর্ণতা জাতীয় শিক্ষার দ্বারা পূর্ণ করা।*

* জাতীয় আন্দোলনের দুইটি পর্ব্বে জাতীয় শিক্ষা দেওয়ার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয় এবং প্রতিষ্ঠিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি বেশী দিন টিকে নাই। বঙ্গীয় শিক্ষা পরিষদ কর্ত্তৃক স্থাপিত টেক্‌নিক্যাল স্কুলটি কেবল আজ ভারত-প্রসিদ্ধ যাদবপুর College of Technology and Engineeringএ পরিণত হইয়া স্বদেশীযুগের কীর্ত্তির সাক্ষ্য দিতেছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্যর আশুতোষ শিক্ষা সংস্কার করিয়া জাতীয় শিক্ষার অভাব কিয়দংশে পূর্ণ করিয়াছিলেন।

১৯০৭ খৃষ্টাব্দের ২২শে আগষ্ট জাতীয় কলেজের ছাত্রগণ শ্রীঅরবিন্দকে বিদায় অভিনন্দন দেয়। সেই উপলক্ষ্যে শ্রীঅরবিন্দ যে বক্তৃতা করেন তাহা হইতে একদিকে অনুভব করি শ্রীঅরবিন্দের গভীর দেশপ্রেম, অপরদিকে ছাত্রদের শ্রীঅরবিন্দের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও ভক্তি। শ্রীঅরবিন্দ বলেন :

"আজ তোমরা আমার প্রতি যে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়াছ, আমি মনে করি, তাহা আমার জন্য নয়, এমন কি (তোমাদের) অধ্যক্ষের জন্য নয় ; তাহা তোমাদের দেশের প্রতি—আমার ভিতর দেশমাতৃকার যে বিকাশ তাহার প্রতি অর্পণ করিয়াছ। কারণ আমি অল্প যাহা কিছু করিয়াছি, সেই দেশমাতার জন্য করিয়াছি এবং আমি যে সামান্য দুঃখ ভোগ করিতে যাইতেছি তাহা সেই দেশমাতারই জন্য।" (ইংরাজী হইতে অনুবাদ।)

কোন্ আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া শ্রীঅরবিন্দ জাতীয় কলেজের কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন, সে সম্বন্ধে তিনি বলেন—"আশা করিয়াছিলাম এই প্রতিষ্ঠানে আমরা জাতির একটা শক্তিকেন্দ্র, নবীন ভারতের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হইতে দেখিব, যাহাতে ভারত দুঃখের নিশার অবসানে নূতন জীবন গড়িতে পারে—সেই জয়-মহিমামণ্ডিত দিনের জন্য, যখন ভারত জগৎ-হিতার্থে কার্য্য করিবে।" ছাত্রদেরও দেশ-সেবার মহান্ আদর্শে অনুপ্রাণিত হইবার জন্য আহ্বান করিয়া শ্রীঅরবিন্দ বলেন : "আমার ইচ্ছা তোমাদের মধ্যে কয়েকজন মহান্ হউক—কিন্তু তোমাদের নিজেদের জন্য নহে, তোমাদের অহঙ্কার তৃপ্ত করিবার জন্য নহে। মহান্ হও দেশমাতার জন্য, ভারতকে মহান করিবার জন্য, যাহাতে ভারত পৃথিবীর জাতিবর্গের মধ্যে উন্নতশিরে দাঁড়াইতে পারে—যেমন সে পুরাকালে ছিল, যখন জগৎ তাহার নিকট জ্ঞান ভিক্ষা করিত।"

এই মহৎ সঙ্কল্প লইয়া যেমন একদিকে শ্রীঅরবিন্দ স্বয়ং প্রকাশ্য-ভাবে কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন, তেমনি তাঁহারই প্রেরণায় এক যবকগোষ্ঠী দেশের জন্য জীবন উৎসর্গ করিবার ব্রত লইল এবং এক

বৎসরের মধ্যে তাহাদের আত্মোৎসর্গের পরাকাষ্ঠা দেখিয়া দেশবাসী স্তম্ভিত হইল, এক নূতন প্রাণপ্রবাহে সারা দেশ আপ্লুত হইল।

কলেজ ত্যাগ করিবার পূর্ব্বেই (১৬ই আগষ্ট, ১৯০৭) শ্রীঅরবিন্দ 'বন্দেমাতরমে' লেখার জন্য অভিযুক্ত হইলেন। আর তাঁহার পক্ষে আত্মগোপন করা সম্ভবপর হইল না। মধ্যাহ্ন-সূর্য্যের মত সারা দেশে তাঁহার খ্যাতি ছড়াইয়া পড়িল। জাতীয় দলের নেতারূপে তিনি মধ্য-পন্থীদলের সহিত আদর্শ-সংঘাতে, রাজনৈতিক-সংঘাতে অগ্রসর হই-লেন। প্রথম প্রকাশ্য সংঘর্ষ হইল মেদিনীপুর বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মে-লনের অধিবেশনে। মেদিনীপুর ছিল গুপ্ত সমিতির কেন্দ্র, কাজেই ওখানে ছিল জাতীয়দলের অখণ্ড প্রভাব।

১৯০৬ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে কলিকাতার কংগ্রেসে দাদাভাই-নওরোজির সভাপতিত্বে বঙ্গ-ভঙ্গ, বৃটিশপণ্য-বর্জন, আদালত-বর্জন ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান-বর্জন সম্বন্ধে যে প্রস্তাবগুলি গৃহীত হইয়াছিল (জাতীয়দল অবশ্য ইহাতে সন্তুষ্ট হন নাই, তাঁহারা কংগ্রেসকে পূর্ণ স্বাধীনতার সঙ্কল্প গ্রহণ করাইতে চাহিয়াছিলেন), মেদিনীপুরে মধ্যপন্থীদল তাহার কিছু রদবদল করিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু এ প্রস্তাবগুলি সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দ পর্ব্বতের ন্যায় অটল রহিলেন।

কিছুকাল পূর্ব্বে, শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষের সৌজন্যে, কল-কাতার "ওরিয়েন্ট" নামক সাপ্তাহিক মেদিনীপুর সম্মেলনের সময়ে শ্রীঅরবিন্দকে লিখিত সুরেন্দ্রনাথের এক পত্র প্রকাশ করিয়াছেন। উহার তারিখ ১৯০৭ খৃষ্টব্দের ৭ই ডিসেম্বর। সুরেন্দ্রনাথ, মধ্যপন্থী ও চরমপন্থীদলের মধ্যে একটা মিটমাটের জন্য, উভয়পক্ষীয় কয়েক-জন নেতাকে মিলিত হইয়া পরামর্শ করিবার জন্য আমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। কিন্তু মিটমাট হইল না, প্রকাশ্য সম্মেলনে জাতীয় দলের প্রস্তাবগুলিই গৃহীত হইল।

ইহার কয়েকদিন পরেই সুরাট কংগ্রেসে উভয় দলের মধ্যে প্রকাশ্য সংঘর্ষ হইল। বোম্বাইয়ের সুপ্রসিদ্ধ কংগ্রেস নেতা স্যর ফেরোজশা

মেটা একান্তভাবে জাতীয়দলের বিরোধী ছিলেন। তিনি জাতীয়-দলকে একেবারে চর্ণ করিতে চাহিলেন। এ কার্য্যে বৃটিশ মন্ত্রীসভার ভারত-সচিব মর্লি সাহেব পরোক্ষভাবে সহায়ক ছিলেন, কারণ ইংরাজ সরকার মধ্যপন্থীদলকে শক্তিমান করার নীতি গ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং এই নীতিই কংগ্রেসের চরম বিজয় পর্য্যন্ত চলিয়াছিল। এমন কি মধ্যপন্থীদলের নিরপেক্ষতার সুযোগ লইয়াই ভারতে ইংরাজ-রাজ নিরঙ্কুশ দমন-নীতি চালাইতে পারিয়াছিলেন।

মেদিনীপুরে সম্মেলনের পরেই (১৫ই ডিসেম্বর) কলিকাতার বিডন পার্কে এক বিরাট সভা হয়, তাহাতে জাতীয় দলের আদর্শ বিবৃত করা হয়। এই সভায় শ্রীঅরবিন্দ প্রথম জনমণ্ডলীর সম্মুখে বক্তৃতা করেন। তিনি বলেন যে, বাল্য-কালে শিক্ষার জন্য তাঁহাকে বিলাতে পাঠান হইয়াছিল, এই কারণেই তিনি মাতৃভাষা ভাল করিয়া শিখেন নাই, এমন কি মাতৃভাষায় কথা বলিতে তিনি অনভ্যস্ত। কিন্তু বিজাতীয় ভাষায় বক্তৃতা করা অপেক্ষা চুপ করিয়া থাকা তিনি শ্রেয় মনে করিয়াছিলেন, এবং এই কারণে এত দিন দেশবাসীর সমক্ষে বক্তৃতাদি করেন নাই।

ইহার পরেই, তিনি রাজনীতি-ক্ষেত্রে যতদিন ছিলেন তাহার মধ্যে কয়েকটি স্মরণীয় বক্তৃতা করেন। বক্তৃতা-সম্বলিত পুস্তকখানি অনেক বছর পরে আবার পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে। কলিকাতায় বক্তৃতার পর, সুরাট কংগ্রেস দক্ষযজ্ঞে পরিণত হইলে জাতীয় দলের যে সভা হয়, শ্রীঅরবিন্দ তাহাতে সভাপতিত্ব করেন। সুরাট হইতে কলিকাতায় ফিরিবার পথে তিনি বোম্বাই এবং মধ্যপ্রদেশের কয়েকটি সহরে জাতীয়তাবাদের আদর্শ সম্বন্ধে কয়েকটি উদ্দীপনাপূর্ণ বক্তৃতা করেন এবং দেশের নবজাগরণের স্বরূপ বুঝাইয়া দেন।

সেবার নাগপুরে কংগ্রেসের অধিবেশন হইবার কথা, কিন্তু মধ্য-পন্থীদল দেখিলেন যে, মহারাষ্ট্রীয় রাজনীতির প্রতিপত্তির জন্য সেখানে তাঁহাদের বিশেষ সুবিধা হইবে না। অতএব গুজরাতের সুরাট বন্দরে

অধিবেশনের ব্যবস্থা হইল। রাজনৈতিক ব্যাপারে সুরাটে কখন কোনরূপ তৎপরতা দেখা যায় নাই, কাজেই মধ্যপন্থী দল ভাবিলেন তাহারা নিরুপদ্রবে তাঁহাদের কার্য্য সমাধা করিবেন। কিন্তু তাহা হইল না, একদিকে লোকমান্য ও তাঁহার দলবলের এবং অপর দিকে শ্রীঅরবিন্দ এবং তাঁহার অনুচরবর্গের জন্য। শ্রীঅরবিন্দ "বন্দেমাতরমের" সহকর্ম্মী এবং অপরাপর কর্ম্মীবৃন্দ লইয়া সুরাটে উপস্থিত হইলেন।

আসন্ন রাজনীতিক কুরুক্ষেত্রের আশঙ্কায় কংগ্রেসের অধিবেশন সুরু হইল। তখনকার দিনে প্রাদেশিক সমিতিগুলি কংগ্রেসের সভাপতি নির্ব্বাচিত করিত না ; আগে কর্ত্তারা ঠিক করিতেন কোন্ নেতা সভাপতি হইবেন, এবং কংগ্রেসের অধিবেশনেই তিনি মনোনীত হইতেন। মধ্যপন্থীদলের পক্ষে সুরেন্দ্রনাথ স্যার রাসবিহারী ঘোষের নাম প্রস্তাব করিলেন ; জাতীয়দলের পক্ষ হইতে লোকমান্য তিলকের নাম প্রস্তাব করা হইল। ইহার ফলে তুমুল বাদবিতণ্ডা সুরু হইল এবং অচিরেই দক্ষযজ্ঞ আরম্ভ হইল। জুতা, চেয়ার প্রভৃতি চারিদিকে ছুটিতে লাগিল, দুই এক জন নেতা আঘাত পাইলেন, নেতাদিগের মঞ্চের দিকে জনতা ধাওয়া করিল। সুরেন্দ্রনাথ এ সম্বন্ধে তাঁহার "আত্মজীবনী"তে ("A Nation in Making") লিখিয়াছেন :—

"কংগ্রেসের পূর্ব্ব-প্রেসিডেন্ট হিসাবে আমার কাজ ছিল স্যর রাসবিহারী ঘোষের নাম প্রস্তাব করা। পূর্ব্বেও আমি কংগ্রেসের সম্মতি লইয়া এইরূপ প্রস্তাব করিয়াছি। কিন্তু এবার সেরূপ হইবার নয়। মেদিনীপুর সম্মেলনের ঘটনাবলী (সেখানে আমিই গণ্ডগোল থামাইয়াছিলাম) মনে পড়িল, এবং আমার বক্তৃতায় বারবার বাধা দিবার চেষ্টা চলিতে লাগিল। আমার পক্ষে এ এক অভিনব অভিজ্ঞতা কারণ আমি কংগ্রেসের মঞ্চে উঠিলেই প্রাথমিক হর্ষধ্বনির পরেই পূর্ণ নিস্তব্ধতা বিরাজ করিত।"

অতঃপর সুরাট দক্ষযজ্ঞের বিবরণ দিয়া সুরেন্দ্রনাথ লিখিতেছেন :

"জনতা মঞ্চের দিকে ধাবিত হইলেও আমি সেইখানেই রহিলাম। আমার কয়েকজন বন্ধু আমাকে রক্ষা করিয়াছিলেন। পরে আমাকে, স্যর ফেরোজশা মেহ্‌তাকে ও অপরাপর কয়েকজনকে তাঁহারা পিছনের তাঁবুতে লইয়া গেলেন এবং পুলিশ আসিয়া প্যাণ্ডেল হইতে সমস্ত লোকজন সরাইয়া দিল। এই প্রকারে কংগ্রেসের এক স্মরণীয় অধ্যায়ের অবসান হইল এবং এক নূতন অধ্যায়ের সুরু হইল।"

এই নূতন অধ্যায়েই কংগ্রেস স্বাধীনতার দিকে অগ্রসর হইয়া ক্রমশঃ এমন শক্তিমান হইল যে নানা সংঘাতের মধ্য দিয়া অবশেষে চরম লক্ষ্যে পৌঁছাইতে পারিল—ভারতকে স্বাধীন করিল। জাতি নিবেদন-নীতি সম্পূর্ণ বর্জন করিল এবং কংগ্রেসের যশ পৃথিবীময় ছড়াইয়া পড়িল। কালক্রমে কংগ্রেস একান্তভাবে গণ-সম্মেলনে পরিণত হইল। কিন্তু খুব কম লোকই আজ স্মরণ করেন যে, কংগ্রেসের এই রূপান্তরের সুরু হইয়াছিল শ্রীঅরবিন্দ ও লোকমান্য তিলকের কার্য্যের ফলে।

যাহা হউক, সুরাটের দক্ষযজ্ঞের দৃশ্যেও শ্রীঅরবিন্দ অচল অটল ছিলেন। বারীন্দ্রকুমার লিখিয়াছেন যে, কংগ্রেসে যখন 'মার মার' রব উঠিয়াছে, চারিদিকে জুতা, লাঠি, চেয়ার প্রভৃতি শন্ শন্ করিয়া ছুটিতেছে, তখন শ্রীঅরবিন্দ প্রশান্ত বদনে বসিয়া আছেন, তাঁহার একটুও বিচলিত হইবার লক্ষণ নাই, আত্মরক্ষার জন্যও একটু ব্যস্ততা নাই; অবশেষে পুলিশ প্যাণ্ডেলকে জনশূন্য করিলে তিনি কয়েকজন সহকর্ম্মীর সহিত বাহিরে আসিলেন। জাতীয়দলের এক সভা হইল এবং শ্রীঅরবিন্দ তাহার সভাপতিত্ব করিতে আহুত হইলেন। রাস-বিহারী ঘোষ মহাশয়ের আর বক্তৃতা দেওয়া হইল না। "বন্দেমাতরমে" বক্তৃতাটি "Undelivered Masterpiece" (অপঠিত ভাষণ-শ্রেষ্ঠ) শিরোনামা দিয়া ছাপা হইল।

আপাতদৃষ্টিতে মনে হইবে যে, কংগ্রেসের এই আত্মকলহে জাতির অমঙ্গল সাধিত হইয়াছিল, কিন্তু পরবর্ত্তী কয়েক বৎসরের ঘটনাপরম্পরায় প্রমাণিত হইয়াছে যে, ইহার ফলে জাতীয় আন্দোলন সুপ্রতিষ্ঠিত

হইয়াছিল। সুরাটের পরে কয়েক বৎসর কংগ্রেস স্তিমিত হইয়া পড়িয়াছিল সত্য, কারণ দমন-নীতির ফলে জাতীয়দল ছত্রভঙ্গ হইয়াছিল; কিন্তু অচিরেই তিলকের নির্ব্বাসন হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পর স্বরাজ আন্দোলন সুরু হইল এবং তাহার সহিত এনি বেসান্তের নেতৃত্বে 'হোমরুল' আন্দোলন দেশকে সরগরম করিয়া রাখিয়াছিল। তাহার পরই গান্ধীজীর আবির্ভাব এবং অসহযোগ আন্দোলন হইতে স্বাধীনতা আন্দোলন। ১৯১৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত কংগ্রেস মধ্যপন্থীদলের হাতেই ছিল, কিন্তু ঐ বৎসরে লক্ষ্ণৌ অধিবেশনে সাময়িক ভাবে দলাদলির অবসান হইয়া যুক্তকংগ্রেস হইল। এই মিলনের সাত বৎসর পূর্ব্বে, দলাদলির চরম অবস্থায়ও, "ধর্ম্মে" এক প্রবন্ধে এ সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দ আশ্চর্য্য এক ইঙ্গিত করিয়াছিলেন—এমনিই ছিল তাঁহার রাজনীতিক দূরদৃষ্টি। যাহা হউক, রাজনীতিক উত্তাপের মাত্রা ক্রমশঃ বাড়িয়া উঠিতেছে দেখিয়া মধ্যপন্থী-দল আর বেশী দিন কংগ্রেসে থাকিতে পারেন নাই। ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা কংগ্রেস উপলক্ষেই দলাদলি সুরু হয় এবং পর বৎসরই মধ্য-পন্থীদল কংগ্রেসের সংস্রব বর্জন করিয়া ভিন্ন দলীয় প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। কিন্তু তখন হইতেই মধ্যপন্থীদলের প্রভাব বিলুপ্ত হইতে সুরু করিল এবং বর্ত্তমানে দলের কোন চিহ্ন নাই। স্বাধীনতা লাভের পর সকলেই কংগ্রেসের দলেই ভিড়িয়াছেন।

সুরাট হইতে ফিরিয়া শ্রীঅরবিন্দ উৎসাহের সহিত জাতীয়দলের প্রচারকার্য্য সুরু করেন। তিনি বোম্বাই ও মধ্যপ্রদেশের কয়েকস্থানে জাতীয়দলের আদর্শ সম্বন্ধে কয়েকটি মর্ম্মস্পর্শী বক্তৃতা করেন এবং বুঝাইয়া দেন কংগ্রেসে দলাদলি অনিবার্য্য হইল কেন। গ্রেপ্তার হইবার মাস-খানেক পূর্ব্বে, ১৯০৮ খৃষ্টাব্দের ১০ই এপ্রিল, কলিকাতায় যুক্তকংগ্রেস সম্বন্ধে এক বক্তৃতায় শ্রীঅরবিন্দ বলেন যে, ভগবানের ইচ্ছায়ই সুরাট কংগ্রেস ভঙ্গ হইয়াছে এবং যদি কংগ্রেস পুনর্ব্বার যুক্ত হয় তাহা হইলে তাঁহারই ইচ্ছায় হইবে। তিনি বিশেষভাবে বুঝাইয়া দেন যে, কোন ব্যক্তিগত ব্যাপারের জন্য কংগ্রেস ভঙ্গ হয় নাই, কতকগুলি সুস্পষ্ট

সমস্যার জন্যই দলাদলি প্রকট হইয়াছে। প্রথম, সভাপতি নির্ব্বাচনে অনিয়ম ; দ্বিতীয়, পূর্ব্ব বৎসর (১৯০৬ খৃষ্টাব্দে) কলিকাতায় যে চারিটি প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছিল দলবিশেষের তাহা নাকচ করিবার চেষ্টা ; তৃতীয়, স্থানীয় (সুরাটের) দলের সংখ্যাধিক্যের জোরে শক্তিমান (জাতীয়) দলকে দাবাইয়া কংগ্রেসের মূল আদর্শ পরিবর্ত্তন করিবার চেষ্টা। এই অবস্থায় সংঘর্ষ ছাড়া উপায় ছিল না এবং তিলক প্রস্তাব করেন যে, কংগ্রেসকে নিয়মানুযায়ীভাবে গড়িবার জন্য একটি কমিটি গঠিত হউক এবং এই কমিটিই সেই অধিবেশনের সভাপতি নির্ব্বাচিত করিবে। অপর পক্ষ, অর্থাৎ মধ্যপন্থীদল তিলককে ঐ প্রস্তাব উত্থাপিত করিবার সুযোগ না দিয়া সহসা ঘোষণা করিলেন যে, সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্যর রাস বিহারী ঘোষ সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। ঐ বিষয়ে যখন সুস্পষ্ট মতভেদ ছিল, তখন কি করিয়া বলা চলে যে, সভাপতি সর্ব্বসম্মতিক্রমে নির্ব্বাচিত হইলেন ?

অতঃপর শ্রীঅরবিন্দ বলেন যে, জাতীয়দল এ সকল অনিয়ম উপেক্ষা করিতেও প্রস্তুত আছেন, যদি অপর দল কলিকাতা অধিবেশনে গৃহীত প্রস্তাবগুলি বজায় রাখিবার অঙ্গীকারে যুক্তকংগ্রেসে রাজি হন। যদি তাঁহারা রাজি না হন, তাহা হইলে কংগ্রেস ভাঙ্গিয়া দলগত প্রতিষ্ঠান স্থাপিত করিবার দায়িত্ব তাঁহাদেরই। "আমাদের নীতি এই যে, আমরা ভিন্ন দল হিসাবে আমাদের প্রতিষ্ঠানেই কার্য্য করিব, কিন্তু আমরা চাই সমগ্র জাতির যুক্তকংগ্রেস।"

অষ্টম অধ্যায়

রুদ্রের আহ্বান

১৯০৭ এবং ১৯০৮ খৃষ্টাব্দের চারিমাস, এই স্বল্প কালের মধ্যে শ্রীঅরবিন্দের রাজনীতিক কর্ম্মতৎপরতা তাঁহাকে ভারত-খ্যাত করে। এ সময়ে দিনের পর দিন তিনি "বন্দেমাতরমে" লিখিতে থাকেন, নানা সম্মেলনে যোগদান করেন ও সভাসমিতিতে এবং জনসাধারণের মধ্যে বক্তৃতা করেন। এই সকল বক্তৃতাদির বিবরণ পড়িয়া মনে হইতে পারে যে, এই সময়ে তিনি যেন এক উদ্দীপনাময় উচ্ছল জীবনের মধ্যে ছিলেন। কিন্তু তাহা ঠিক নয়। এই কর্ম্মপ্রবাহের মধ্যেও তিনি যোগমগ্ন ছিলেন।

সুরাটে কংগ্রেস অধিবেশন পণ্ড হইবার পর কলিকাতা ফিরিবার পথে তিনি বোম্বাই সহরে এবং বোম্বাই ও মধ্যপ্রদেশের কয়েকটি সহরে জনসভায় বক্তৃতা করেন। এই বক্তৃতাগুলি যেমন একদিকে তেজো-ব্যঞ্জক এবং দেশপ্রাণতায় ভরপুর, অপরদিকে সেগুলি জাতীয় আন্দো-লনের স্বরূপ-প্রকাশক। অতীব ওজস্বিনী ও গম্ভীর ভাষায় শ্রীঅরবিন্দ দেশবাসীকে বুঝান যে, জাতীয় আন্দোলন নিছক রাজনীতিক আন্দো-লন নয়—ইহা জাতির তন্দ্রাভঙ্গসূচক, তমোনাশক অভ্যুত্থান, আত্ম-চেতনার উদ্বোধন। ভারতের আত্ম-চেতনা হইতেছে অধ্যাত্ম-চেতনা। তিনি বলেন যে, স্বয়ং ভগবানই রহিয়াছেন জাতীয় জাগরণের মূলে—এমন কি এই আন্দোলনের প্রচ্ছন্ন নেতাও তিনি।

কোন এক ঊর্দ্ধের প্রেরণায় যেন এই বক্তৃতাগুলি তাঁহার মুখ-নিঃসৃত হইয়াছিল! তখন তাঁহাকে দেখিলে মনে হইত যোগমগ্ন, যদিও বাহিরে তিনি কাজকর্ম্ম করিতেছেন। নাগপুরে তিনি যে বক্তৃতা

করেন সে সম্বন্ধে সংবাদপত্রে যে বিবরণ বাহির হয় তাহা হইতে জানা যায় যে, নাগপুরের জনসাধারণ তাঁহার শান্তযোগী মূর্ত্তি দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিল। এ সম্বন্ধে তাঁহার অন্যতম এক সহকর্ম্মী লিখিয়াছেন যে, কলিকাতায় থাকিতে সংসার বিষয়ে তিনি একান্ত উদাসীন থাকিতেন। কোন কোন দিন এমন হইয়াছে যে হয় তিনি ধ্যানমগ্ন রহিয়াছেন, নয়ত লেখায় নিমগ্ন রহিয়াছেন, ওদিকে সংসার খরচের ব্যবস্থা নাই। কাজেই তাঁহার সহকর্ম্মীদের সে ব্যবস্থা করিতে হইত।

ইহার কিছুকাল পরে দেশের ভাগ্যচক্র ঘুরিল—কালের ভেরী বাজিল, রুদ্রের আহ্বান আসিল। দেশজননী সন্তানদের 'রক্ত তিলক ললাটে পরাল'। রুদ্রযজ্ঞে শ্রীঅরবিন্দের অন্তরতম অনুচর কয়েক-জনকে জীবনাহুতি দিতে হইল, অপর অনুচরদের দিতে হইল নিদারুণ অগ্নিপরীক্ষা। 'ভায়ের মায়ের' স্নেহ-পুষ্ট, ক্লেশবিমুখ বাঙ্গালী যুবক যে বীরত্ব ও নির্ভীকতা দেখাইল তাহা একান্ত ঈশ্বরপরায়ণ ব্যক্তিদের পক্ষেই সম্ভব। এই তরুণদের অধিকাংশ ছিলেন ভগবদ্‌মুখী। তাঁহাদের আধ্যাত্মিক আশ্রয় ছিল 'গীতা'; আর দেশপ্রেমের প্রেরণা, সন্তানসঙ্ঘের মহান্‌ আদর্শের প্রেরণা দিত বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ'। তাঁহাদের বুলি ছিল: "যায় যাবে জীবন চলে, বন্দেমাতরম বলে"!

এই তরুণদের নেতা শ্রীঅরবিন্দকেও কঠোর অগ্নিপরীক্ষার মধ্যে পড়িতে হইল—যেন তাহাদিগকে দুঃখের, নির্য্যাতনের মধ্যে আশ্বাস দিবার জন্য। ইহা হইতেছে সেই চিরস্মরণীয় ঘটনার এক দিক। অপরদিকে, গভীরভাবে দেখিলে বুঝা যাইবে যে, স্বয়ং বাসুদেব তাহার পরমগূঢ় যোগ উপলব্ধি করাইবার জন্যই শ্রীঅরবিন্দকে বাহিরের কর্ম্ম-ক্ষেত্র হইতে অপসৃত করিয়া কারাকক্ষের নির্জনতার মধ্যে লইয়া গেলেন। ভগবান বাসুদেব রণক্ষেত্রের সংঘাতের প্রাক্কালে প্রিয় শিষ্য অর্জুনকে বিশ্বরূপ দেখাইয়াছিলেন; তিনি শ্রীঅরবিন্দকে সেই রূপ দেখাইলেন কারাগারে। শ্রীঅরবিন্দ মানবরূপী, শ্রীকৃষ্ণ নাম-ধারী সত্তাবিশেষের মধ্যে শ্রীভগবানের বিশ্বরূপ দেখিলেন না, বিশ্বের

মধ্যে, সমগ্র সৃষ্টিমধ্যে বিশ্বরূপ দেখিলেন—ভূমা উপলব্ধি করিলেন। দেখিলেন বাসুদেবময় জগৎ। এই বিরাট উপলব্ধিই হইল তাঁহার উত্তর-কালের যোগভিত্তি।

ঘটনাটা এমনই আকস্মিকভাবে ঘটিল যে, শ্রীঅরবিন্দ নিজেই অনুমান করিতে পারেন নাই যে এত শীঘ্র তাঁহার অবস্থা-বিপর্য্যয় ঘটিবে। এ সম্বন্ধে তিনি "কারাকাহিনী"তে লিখিয়াছেন :—

"১৯০৮ সনের ১লা মে, শুক্রবার আমি "বন্দেমাতরম" অফিসে বসিয়াছিলাম, তখন শ্রীযুক্ত শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী আমার হাতে মজঃফর-পুরের একটি টেলিগ্রাম দিলেন। পড়িয়া দেখিলাম মজঃফরপুরে বোমা ফাটিয়াছে, দুইটি ইয়ুরোপীয়ান স্ত্রীলোক হত। সে দিন 'এম্পায়ার' কাগজে আরও পড়িলাম, পুলিশ কমিশনার বলিয়াছেন, আমরা জানি কে কে এই হত্যাকাণ্ডে লিপ্ত এবং তাহারা শীঘ্র গ্রেপ্তার হইবে। জানিতাম না যে তখন যে আমি এই সন্দেহের মুখ্য লক্ষ্যস্থল, আমিই পুলিশের বিবেচনায় প্রধান হত্যাকারী, রাষ্ট্রবিপ্লব-প্রয়াসী যুবকদলের মন্ত্রদাতা ও গুপ্ত-নেতা। জানিতাম না যে, এই দিনই আমার জীবনের একটা অঙ্কের শেষ পাতা, আমার সম্মুখে এক বৎসর কারাবাস, এই সময়ের জন্য মানুষের জীবনের সঙ্গে যতই বন্ধন ছিল সবই ছিন্ন হইবে, এক বৎসর কাল মানবসমাজের বাহিরে পিঞ্জরাবদ্ধ পশুর মত থাকিতে হইবে। আবার যখন কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিব, তথায় সেই পুরাতন পরিচিত অরবিন্দ ঘোষ প্রবেশ করিবে না, কিন্তু একটি নূতন মানুষ, নূতন চরিত্র, নূতন বুদ্ধি, নূতন প্রাণ, নূতন মন লইয়া, নূতন কর্ম্মভার গ্রহণ করিয়া আলিপুরস্থ আশ্রম হইতে বাহির হইবে।"

রাজনীতিক্ষেত্রে শ্রীঅরবিন্দকে নানা শ্রেণীর লোকের সংস্পর্শে আসিতে হইয়াছে; তাঁহাদের মধ্যে যুবক সম্প্রদায়ই প্রধান। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে শ্রীঅরবিন্দ তাহাদেরই নেতা ছিলেন। আধুনিক যুগে প্রায় সকল দেশেই জাতীয় অভ্যুত্থানে তরুণগণকেই পুরোভাগে দেখা গিয়াছে, কারণ তাহাদের পিছনের টান নাই, অতীতের সংস্কার নাই,

ভবিষ্যতের উজ্জ্বলতায় তাহাদের হৃদয় উদ্ভাসিত। তাহাদের মতো অন্য কোন সম্প্রদায়ই উচ্ছল প্রাণস্পর্শে জাগিতে পারে না ; এই কারণেই তাহাদের ত্যাগের ক্ষমতা অপরিমেয়। তাহারাই অম্লান বদনে দুঃখকে বরণ করিতে পারে, সহাস্য বদনে জীবনের সকল সম্পদ বিসর্জন করিতে পারে।

জাতীয় আন্দোলনে বাংলার যুবক সম্প্রদায়ের মধ্যে এক শ্রেণীর ধারণা হইল যে, সশস্ত্র বিপ্লবদ্বারা দেশের স্বাধীনতালাভ সহজসাধ্য হইবে—অন্ততঃ শাসকসম্প্রদায়ের মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টি করিয়া অচিরেই জাতীয় দাবী আদায় করা যাইবে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে এই ক্ষত্রশক্তি-উদ্বোধনে ছিল শ্রীঅরবিন্দের প্রেরণা। তাহারা হয়ত সহসা কিছু করিত না, কিন্তু দেশের অবস্থা-বিপর্য্যয়ে তাহাদের আচম্বিতে আত্মপ্রকাশ করিতে হইল। তাহাদের এই উৎকট পন্থা গ্রহণ করার একটি কারণ এই ছিল যে, তখনকার দিনে শাসকসম্প্রদায় বিবেচনাশূন্য হইয়া দমন-নীতির আশ্রয় গ্রহণ করিতেন এবং ভারতীয়দের শ্বেতাঙ্গদিগের নিকট শুধু উপেক্ষা নহে, অনেক লাঞ্ছনা ও অপমান সহ্য করিতেও হইত, এবং অনেক স্থলে বিচারালয়েও তাহার কোন প্রতিকার পাওয়া যাইত না।

এইরূপ মনোবৃত্তিসম্পন্ন অনেকেই ছিলেন জাতীয়দলের শ্রেষ্ঠ কর্ম্মী, কাজেই শ্রীঅরবিন্দের সহযোগী। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে তাঁহাদের নেতা বারীন্দ্রকুমার শ্রীঅরবিন্দের কনিষ্ঠ সহোদর ; অন্যতম নেতা শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শুধু "যুগান্তরে"র পরিচালক নহে, "বন্দেমাতরম্"-এও শ্রীঅরবিন্দের সহকর্ম্মী ছিলেন। কাজেই পুলিশের স্বতঃই সন্দেহ হইয়াছিল যে রাজনীতিক্ষেত্রে যেমন শ্রীঅরবিন্দ জাতীয়দলের প্রকাশ্য নেতা, তেমনি তিনি বিপ্লববাদীদলেরও গুপ্ত নেতা। বিচারকালে সরকারী কৌঁসুলি নর্টন সাহেব আগাগোড়া এই যুক্তি দ্বারাই শ্রীঅরবিন্দের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণের হাস্যোদ্দীপক চেষ্টা করিয়াছিলেন। যাহা হউক, মজঃফরপুরে হত্যাকাণ্ডের পরই যেই মাণিকতলায় বোমার কারখানা বাহির হইয়া পড়িল, অমনি বিপ্লবী-

দলের সহিত শ্রীঅরবিন্দ ধৃত হইলেন এবং অপর সকলের সহিত তাঁহার বিরুদ্ধেও বিপ্লব ও হত্যা ষড়যন্ত্রের অভিযোগ আনা হইল।

গ্রেপ্তার হইবার কয়েকদিন পূর্ব্বে শ্রীঅরবিন্দ স্কট্‌স লেনের বাসা হইতে গ্রে ষ্ট্রীটের একটি বাসায় উঠিয়া আসিয়াছিলেন। তিনি "নবশক্তি" নামে একখানি জাতীয়তাবাদী দৈনিক নূতন রূপে প্রকাশের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। নূতন বাসায় তাহার অফিস হইয়াছিল; সেখানে তাঁহার সঙ্গে দুএকজন সহকর্ম্মী ছিলেন; তাঁহারাও গ্রেপ্তার হন।

শ্রীঅরবিন্দ "কারাকাহিনী"তে তাঁহার গ্রেপ্তার ও আনুষঙ্গিক ঘটনার মনোরম বিবরণ দিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে তিনি পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেন্ট ক্রেগানের যে হাস্যোদ্দীপক কাহিনী লিখিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার ভাগ্য-বিড়ম্বনায়ও হাসিতে হয়। পুলিশের দল রিভলবার হাতে লইয়া সিঁড়ি দিয়া বীরদর্পে দোতালায় আসিল এবং শ্রীঅরবিন্দ যে ঘরে ছিলেন সেখানে ভিড় করিল। শ্রীঅরবিন্দ ঘুমাইতেছিলেন, জাগিয়া দেখিলেন এই বিরাট ব্যাপার। শ্রীঅরবিন্দ লিখিয়াছেন, "ক্রেগানের কথার ভাবে প্রকাশ পাইল যে, তিনি যেন হিংস্র পশুর গর্ত্তে ঢুকিয়াছেন, যেন আমরা অশিক্ষিত হিংস্রস্বভাববিশিষ্ট আইনভঙ্গকারী, আমাদের প্রতি ভদ্র ব্যবহার করা বা ভদ্রকথা বলা নিষ্প্রয়োজন। তবে ঝগড়ার পর সাহেব একটু নরম হইয়া পড়িলেন। বিনোদবাবু (অন্যতম পুলিশ কর্ম্মচারী) তাঁহাকে আমার সম্বন্ধে কি বুঝাইতে চেষ্টা করেন। তাহার পর ক্রেগান আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, 'আপনি নাকি বি, এ, পাশ করিয়াছেন? এরূপ বাসায়, এমন সজ্জাবিহীন কামরায় মাটিতে শুইয়াছিলেন, এই অবস্থায় থাকা কি আপনার মত শিক্ষিত লোকের পক্ষে লজ্জাজনক নহে?' আমি বলিলাম, 'আমি দরিদ্র, দরিদ্রের মতই থাকি।' সাহেব অমনি সজোরে উত্তর করিলেন, 'তবে কি আপনি ধনী লোক হইবেন বলিয়া এই কাণ্ড ঘটাইয়াছেন?' দেশহিতৈষিতা, স্বার্থত্যাগ ও দারিদ্র্যব্রতের মাহাত্ম্য এই স্থূলবুদ্ধি ইংরাজকে বোঝান দুঃসাধ্য বিবেচনা করিয়া আমি সে চেষ্টা করিলাম না।"

অবশ্য ইহার পরে, এমন কি দীর্ঘ এক বৎসর কারাবাসেও শ্রীঅরবিন্দ কাহারও নিকট বিশেষ কোন প্রকার দুর্ব্ব্যবহার পান নাই, বরং জেলের কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহার সহিত যেরূপ সদয় ব্যবহার করিয়াছিলেন, তিনি তাহার হৃদয়গ্রাহী বিবরণ দিয়াছেন। তাহা পাঠ করিলে বড়ই আনন্দ হয়। অবশ্য দুর্ব্ব্যবহার পাইলেও তিনি বিচলিত হইতেন না। শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 'নির্ব্বাসিতের আত্মকথা'য় লিখিয়াছেন যে, শ্রীঅরবিন্দকে যখন বিচারালয় হইতে কার্য্যবশতঃ বাহিরে লইবার সময়ে প্রহরীরা বন্ধন করিয়া লইয়া যাইত, তাহা দেখিয়া সকলের যেন ধৈর্য্যরক্ষা করা কষ্টসাধ্য হইত—কিন্তু শ্রীঅরবিন্দ একেবারে অবিচল মুহূর্ত্তের জন্যও কোনদিন তাঁহার ভাবান্তর দেখা যায় নাই। বিচারের সময়ও সঙ্গিগণ তাঁহার অবিচল ভাব দেখিয়া চমৎকৃত হইতেন—কোন দিকেই তাঁহার ভ্রূক্ষেপ নাই, যেন যোগাসনে বসিয়া আছেন!

'কারাকাহিনী'তে তাঁহার বিচারের স্বলিখিত সরস বিবরণ একটা পড়িবার জিনিষ—তিনি নিম্ন আদালতে ম্যাজিষ্ট্রেট, সরকারী কেঁৗসুলি নর্টন সাহেব এবং সাক্ষীদের যে অপূর্ব্ব চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন তাহাতে বিচার-প্রহসনটি সম্যক্ পরিস্ফুট হইয়াছে। অবশেষে এক বৎসর যাবৎ দীর্ঘ বিচারের পর তিনি সম্পূর্ণরূপে নির্দ্দোষ সাব্যস্ত হইয়া মুক্তি পাইলেন। ১৯০৮ খৃষ্টাব্দের ৫ই মে তিনি কারাগারে প্রবেশ করিয়া-ছিলেন, ১৯০৯ খৃষ্টাব্দের ৫ই মে তিনি কারাদ্বারের বাহিরে আসিলেন। তিনি যে মুক্তি পাইবেন তাহা তিনি পূর্ব্বেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন।

শ্রীঅরবিন্দ ও তাঁহার সঙ্গীদের গ্রেপ্তারে যেন সমগ্র দেশ টলমল করিয়া উঠিল। 'পীড়িত মূর্ছিত দেশে' এ কি অভিনব কাণ্ড! শীর্ণকায় বাঙ্গালী যুবকের বুকে কি দুর্জয় সাহস! আত্মত্যাগের কি দিব্য প্রেরণা! দেশের স্বাধীনতার জন্য কি অপূর্ব্ব পণ! ভারতে ও ইংলণ্ডে ইংরাজ প্রমাদ গণিল। একদিকে নরমপন্থীদের সহায়তায় দেশের মন ফিরাইবার চেষ্টা চলিল, তারপর দেশকে চরমপন্থীদের নিপীড়নে পিষ্ট করিবার ব্যবস্থা হইল। বলা বাহুল্য এই আকস্মিক আলোড়নে

জাতীয় আন্দোলন দারুণ আঘাত পাইল, বিপ্লব প্রচেষ্টা সাময়িকভাবে ব্যর্থ হইল। "যুগান্তর" লিখিল :

"না হইতে মা বোধন তোমার
ভাঙ্গিল রাক্ষস মঙ্গল-ঘট!"

ভারতে বিপ্লবের এই সুরু। পরে নিদারুণ দমননীতি সত্ত্বেও সশস্ত্র বিপ্লবের চেষ্টা চলিতে লাগিল, রাসবিহারী বসু ও যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের উদ্যোগে। সে অন্য কাহিনী।

একদিকে দেশ স্তম্ভিত, অপরদিকে শ্রীঅরবিন্দ ও তাঁহার সঙ্গীদের বিচারের ব্যবস্থা হইল খুব তোড়জোড়ের সঙ্গে। নিম্ন আদালতে প্রাথমিক সাক্ষ্যসাবুদ গ্রহণের পর তাঁহারা আলিপুরের দায়রায় সোপর্দ্দ হইলেন। দিনের পর দিন বিচার চলিতে লাগিল।

বিচার উপলক্ষে শ্রীঅরবিন্দ এক মহৎ ব্যক্তির সাহায্য পাইয়াছিলেন, যিনি পরে দেশের জন্য সর্ব্বস্বত্যাগ করিয়া শুধু ভারতখ্যাত নয় জগৎখ্যাত হইয়াছিলেন। তিনি হইতেছেন ব্যারিষ্টার চিত্তরঞ্জন দাশ, যাঁহাকে পরে দেশবাসী নাম দিয়াছিল দেশবন্ধু। চিত্তরঞ্জনই যেন ভগবানের যন্ত্রীরূপে শ্রীঅরবিন্দের মুক্তিলাভে সহায়তা করিলেন। শ্রীঅরবিন্দের গ্রেপ্তার হইবার সংবাদ প্রচারিত হইতেই, বিচারে তাঁহার পক্ষ সমর্থনের সাহায্যার্থ, অযাচিতভাবে বহু অর্থ আসিয়াছিল। তাঁহার ভগিনী সরোজিনী দেবী তাঁহার পক্ষ সমর্থনের সমস্ত ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, কিন্তু অল্পকালের মধ্যেই সমস্ত অর্থ নিঃশেষ হইয়া গেল। তখন শ্রীঅরবিন্দের সাহায্যার্থ অগ্রসর হইলেন চিত্তরঞ্জন। চিত্তরঞ্জন তখন ব্যারিষ্টার হিসাবে খ্যাতির পথে, তবু প্রায় এক বৎসরকাল বলিতে গেলে বিনা পারিশ্রমিকে শ্রীঅরবিন্দের জন্য তিনি যে ত্যাগ স্বীকার করিয়াছিলেন তাহা অতুলনীয়। এই মহত্ত্বেই তাঁহার ভাবী মহত্ত্ব ও ত্যাগের সূচনা, যাহার জন্য আজও প্রতি ভারতবাসী শ্রদ্ধাভরে তাঁহার কথা স্মরণ করে।

এই বিচার উপলক্ষে চিত্তরঞ্জন শুধু ত্যাগ ও মহত্ত্বের পরিচয় দেন নাই, তাঁহার আইন-জ্ঞান ও বাগ্মিতায়ও সকলে মুগ্ধ হইয়াছিল। বিচার

শেষে জজ ও এসেসরদিগের নিকট শ্রীঅরবিন্দের নির্দ্দোষিতা প্রতিপন্ন করিবার জন্য তিনি যে ওজস্বিনী বক্তৃতা করেন, তাহাতে শ্রীঅরবিন্দের জীবন-আদর্শ এত চমৎকাররূপে ব্যক্ত হইয়াছিল যে আজ তাহা রবীন্দ্র-নাথের সেই স্মরণীয় কবিতার ন্যায় অপূর্ব্ব ভবিষ্যদ্বাণীরূপে প্রতীয়মান হয়। ঐ কথাগুলি যেন বার বার আবৃত্তি করিতে ইচ্ছা করে :—

"Long after this controversy is hushed in silence, long after this turmoil, this agitation, ceases, long after he is dead and gone, he will be looked upon as the poet of patriotism, as the prophet of nationalism and the lover of humanity. Long after he is dead and gone his words will be echoed and re-echoed not only in India, but across distant seas and lands."

(এই বিতণ্ডা, কোলাহল ও আন্দোলন স্তব্ধ হইবার দীর্ঘকাল পরে, তাঁহার তিরোধানের দীর্ঘকাল পরে, মানুষ তাঁহাকে স্বদেশ-প্রেমের কবি, জাতীয়তার নবী, মানবপ্রেমিক বলিয়া শ্রদ্ধা করিবে। তাঁহার তিরোধানের দীর্ঘকাল পরে তাঁহার বাণী ধ্বনিত হইবে শুধু এ দেশে নয়, সাগরপারে দূর-দূরান্তরে।)*

এই ঘটনার পূর্ব্ব হইতেই শ্রীঅরবিন্দ চিত্তরঞ্জনের সহিত গভীর প্রীতি-বন্ধনে আবদ্ধ ছিলেন। রাজনীতি-ক্ষেত্রে চিত্তরঞ্জন শ্রীঅরবিন্দের জাতীয়দলভুক্ত ছিলেন এবং "বন্দমাতরম্‌কে" আর্থিক সাহায্য করিতেন। তাঁহাদের মধ্যে ভাবের এইরূপ আদর্শ ছিল যে, চিত্তরঞ্জনের সুবিখ্যাত কাব্য "সাগর সঙ্গীত"-এর ইংরাজী কাব্যানুবাদ করিয়াছিলেন অনুপম ভাষায় শ্রীঅরবিন্দ নিজেই। শ্রীঅরবিন্দের চিত্তরঞ্জনের রাজনৈতিক দূরদৃষ্টি ও কর্ম্মকৌশলের প্রতি এরূপ আস্থা ছিল যে, দেশবন্ধুর তিরোধানের

* চিত্তরঞ্জনের সম্পূর্ণ বক্তৃতাটী অধ্যাপক জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষের "Life-Work of Sri Aurobindo" পুস্তকে পাওয়া যাইবে। তাহাতে মামলারও চুম্বক আছে।

পর তিনি বলেন যে, তিলকের মৃত্যুর পর একমাত্র চিত্তরঞ্জনেরই ভারতে স্বরাজ স্থাপনা করিবার ক্ষমতা ছিল। ১৯২২ খৃষ্টাব্দে গয়া কংগ্রেসে সভাপতি হইবার পূর্ব্বে স্বীয় রাজনৈতিক আদর্শ প্রচার উপলক্ষে চিত্তরঞ্জন মাদ্রাজ প্রদেশে ভ্রমণকালে পণ্ডিচারীতে শ্রীঅরবিন্দের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া রাজনীতিক ও আধ্যাত্মিক বিষয়ে বহু আলোচনা করিয়াছিলেন।

সরকারপক্ষ শ্রীঅরবিন্দের বিপ্লব-ষড়যন্ত্রের সহিত সংস্রব প্রমাণ করিবার জন্য যে সাক্ষ্য-জাল বিস্তার করিয়াছিলেন, তাহা ছিন্ন করিতে চিত্তরঞ্জন যে আশ্চর্য্য বিচারবুদ্ধি ও আইনজ্ঞান প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহাতে সকলেই মুগ্ধ হইয়াছিল। নর্টন সাহেব কোন প্রকার যুক্তি-যুক্ত সাক্ষ্য প্রমাণ না পাইয়া, পরোক্ষভাবে প্রমাণ করিতে চেষ্টা করেন যে, বৃটিশবিদ্বেষ-প্রণোদিত হইয়াই শ্রীঅরবিন্দ স্বাধীনতার আদর্শ প্রচার করিতেছিলেন এবং জাতীয়দল গঠন করিয়া দেশকে বিপ্লবে উত্তেজিত করিতেছিলেন। নর্টন সাহেব এই উদ্দেশ্যে শ্রীঅরবিন্দের বহু চিঠি পত্র প্রবন্ধাদি, ও বক্তৃতা পাঠ করেন। তাহার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইতেছে বারীন্দ্রকুমারের লেখা বলিয়া একখানি পোষ্টকার্ড। উহাতে লেখা ছিল, এখনই মিষ্টান্ন ছড়াইবার সময়। ঐ কার্ডখানি পুলিশ নাকি পথিমধ্যে আটক করিয়াছিল এবং নর্টন প্রমাণ করিতে চাহেন "মিষ্টান্ন"র অর্থ বোমা! এই অদ্ভুত যুক্তি গ্রহণ করা দূরের কথা চিত্তরঞ্জনের ব্যাখ্যায় এসেসরগণের সিদ্ধান্ত হইল ঐ চিঠি একেবারেই জাল। জজ ওরূপ সিদ্ধান্ত না করিলেও অভিমত প্রকাশ করেন যে ঐ সাক্ষ্যের কোনই মূল্য নাই।

শ্রীঅরবিন্দের রাজনীতিক কার্য্যাবলীর বিবরণ ছাড়া তাঁহার বিরুদ্ধে বিশেষ ব্যক্তিগত সাক্ষ্য ছিল না। তবে রাজার সাক্ষী নরেন গোঁসাই জেলে শ্রীঅরবিন্দের সহিত মেলা-মেশা করিয়া তাঁহাকে জড়াইবার চেষ্টায় ছিল। সে কি ভাবে শ্রীঅরবিন্দের ও অপর সকলের সহিত কথাবার্ত্তা বলিত তাহার বিবরণ "কারাকাহিনী"তে পাওয়া যায়।

কিন্তু গোঁসাই জেলে নিহত হওয়ায় তাহার উক্তি আইন-অনুসারে গ্রাহ্য হইল না।

অপর পক্ষে সরকারী কৌঁস্থলির যুক্তিধূম্রজাল উড়াইয়া দিয়া চিত্তরঞ্জন প্রমাণ করিলেন যে, এপর্য্যন্ত রাজনীতি-ক্ষেত্রে শ্রীঅরবিন্দ যাহা করিয়াছেন তাহা কোন মতেই বে-আইনী নহে। স্বাধীনতার আদর্শ প্রচার করা বে-আইনী হইতে পারে না। দেশপ্রেম কোন আইন অনুসারেই দূষ্য হইতে পারে না। জজ বীচক্রফ্‌ট্‌ রায়ে ঐ যুক্তিই মানিয়া লইলেন। সতীর্থের বিচারে শ্রীঅরবিন্দ সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ সাব্যস্ত হইলেন।*

---

* ১৯৪৯ খৃষ্টাব্দের ৬ই মে আলিপুরের জজ-আদালতের যে কক্ষে শ্রীঅরবিন্দ ও তাঁহার সঙ্গীদের বিচার হইয়াছিল, সেখানে এক স্মরণীয় উৎসব হয়। কক্ষে শ্রীঅরবিন্দের বিচারকালীন প্রতিকৃতির এক আলেখ্যর আবরণ উন্মোচন করেন কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। উৎসবে শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি শ্রীঅরবিন্দের পূর্ব্ব সঙ্গীদের কয়েকজন উপস্থিত ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে উপেন্দ্রনাথ উচ্ছ্বসিতভাবে শ্রীঅরবিন্দের স্তুতি করেন এবং বলেন শ্রীঅরবিন্দের যুগ আগত। বিচারপতি মুখোপাধ্যায় মহাশয় বলেন যে, জগৎ আণবিক বোমা দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছে—পণ্ডিচারীতে হয়ত তাহা অপেক্ষা শক্তিশালী কিছু আবিষ্কৃত হইতেছে। স্বাধীন ভারতে বাঙ্গলা সরকার কর্তৃক শ্রীঅরবিন্দের এই অপূর্ব্ব সম্বর্দ্ধনায় দেশবাসী পুলকিত হইয়াছেন।

নবম অধ্যায়

কারাগারে ভগবদ্দর্শন

জেলে শ্রীঅরবিন্দ মাত্র এক বৎসর ছিলেন, কিন্তু এই সময়ের মধ্যে তাঁহার জীবনের পূর্ণ রূপান্তর ঘটিল, যাহার জন্য রাজনীতিক নেতা, দেশপ্রেমিক অরবিন্দ, ভগবৎ-প্রেমিক মহাযোগী শ্রীঅরবিন্দ হইলেন। এই রূপান্তর আপাতদৃষ্টিতে অভিনব ও আকস্মিক বলিয়া মনে হইতে পারে, কিন্তু শ্রীঅরবিন্দ নিজেই ইঙ্গিত দিয়াছেন যে বাল্যকাল হইতেই তিনি যেন প্রচ্ছন্ন যোগী। দেশপ্রেমের ন্যায় ভগবৎ-জ্ঞান-লাভের আকাঙ্ক্ষা বাল্যকাল হইতেই তাঁহার হৃদয়ে জাগরিত হইয়াছিল। তিনি লৌকিক ভাবে ভগবান সম্বন্ধে ধারণা বা চিন্তা করিয়া তৃপ্ত থাকিতে পারেন নাই, তাঁহার জীবনের মুখ্য আদর্শ হইয়াছিল ভগবানের সহিত নিবিড় যোগ স্থাপন করা, তাঁহাকে বিশ্বের প্রতি অণুপরমাণুর মধ্যে পর্য্যন্ত উপলব্ধি করা। কিন্তু এতদিন যেন তিনি এই চরম উপলব্ধির সুযোগ পান নাই, কারাগারের নির্জনতায়—অধিকাংশ সময়েই তাঁহাকে নির্জন কারাবাস ভোগ করিতে হইয়াছিল—তিনি সে-সুযোগ পূর্ণভাবে পাইলেন। বলা চলে ভগবানই তাঁহাকে সে সুযোগ দিলেন। ভগবান বাসুদেবের কারাগারে জন্ম হইয়াছিল—কারাগারেই শ্রীঅরবিন্দ বাসুদেবের সাক্ষাৎ পাইলেন, তাঁহাকে হৃদয়ে এবং সমগ্র সত্তায় সমগ্র দৃষ্টিতে উপলব্ধি করিলেন।*

---

* কারাগারে ভগবদ্দর্শন লইয়া তখনকার দিনেও ব্যক্তিবিশেষরা ঠাট্টা বিদ্রূপ করিতে ছাড়িতেন না। বোম্বায়ের সুবিখ্যাত সমাজসংস্কারক নটরাজন (অধুনা পরলোকগত) সম্পাদিত "সোশ্যাল রিফরমার" নামক ইংরাজী সাপ্তাহিক এবং সুরেন্দ্রনাথের "বেঙ্গলী"-তে এ সম্বন্ধে মাঝে মাঝে বিদ্রূপাত্মক সমালোচনা প্রকাশিত হইত। শ্রীঅরবিন্দ "কর্ম্মযোগিন্" ও "ধর্ম্মে" ইহার যে উপযুক্ত জবাব দিয়াছিলেন তাহা বিশেষভাবে উপভোগ্য।

"খানাতল্লাসীতে বিশেষ কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনা হয় নাই। তবে মনে পড়ে ক্ষুদ্র কার্ডবোর্ডের বাক্সে দক্ষিণেশ্বরের যে মাটি রক্ষিত ছিল, ক্লার্ক সাহেব তাহা বড় সন্দিগ্ধ চিত্তে নিরীক্ষণ করেন, যেন তাঁহার মনে সন্দেহ হয় যে, এটা কি নূতন ভয়ঙ্কর তেজবিশিষ্ট স্ফোটক পদার্থ। এক হিসাবে ক্লার্ক সাহেবের সন্দেহ ভিত্তিহীন বলা যায় না। শেষে ইহা যে মাটি ভিন্ন আর কিছু নয়, এবং রাসায়নিক বিশ্লেষণকারীর নিকট পাঠান অনাবশ্যক এই সিদ্ধান্তই গৃহীত হয়।"

জাতীয় জাগরণে যে শ্রীঅরবিন্দ ভাগবত শক্তির বিকাশ দেখিতেন তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। কারাগারে যাইবার পূর্ব্বে ভারতের বিভিন্ন স্থানে বক্তৃতায় তিনি আবেগভরে সেই কথা বলেন। উপরোক্ত বোম্বাইয়ের বক্তৃতায় (১৯০৮ খৃষ্টাব্দের ১৯শে জানুয়ারী) তিনি বলেন যে, অনাদৃত, দুর্ব্বল বাঙ্গলা জাগ্রত হইয়াছে কারণ তাহার বিশ্বাস ছিল। "জাতীয়তা একটা রাজনীতিক কর্ম্মপদ্ধতি নহে, জাতীয়তা ভগবান-সম্ভূত ধর্ম্ম। জাতীয়তা কখনই বিনষ্ট হইবে না, ভাগবত শক্তিতেই জাতীয়তা টিকিয়া থাকিবে—যে কোন প্রকার অস্ত্রই ইহার বিরুদ্ধে প্রয়োগ করা হউক না কেন। জাতীয়তা অমর, কারণ ইহা মানবীয় জিনিষ নহে। ভগবানই বাংলায় কাজ করিতেছেন। ভগবানকে মারা যায় না, ভগবানকে জেলে পাঠান যায় না।" এতদিন তিনি নানা অবস্থার ভিতর ভগবানের মহিমা উপলব্ধি করিয়াছিলেন, এইবার কারাবাস উপলক্ষে তিনি পূর্ণ ভাগবত সত্তায় নিমজ্জিত হইলেন।

গ্রেপ্তার হইয়া হাজতে নীত হইবার পর হইতেই শ্রীঅরবিন্দের নূতন সাধনা আরম্ভ হইল। তাঁহার সহকর্ম্মীগণ জানেন যে, শ্রীঅরবিন্দ বরাবরই অত্যন্ত শান্ত, দারুণ সঙ্কটেও অবিচল। এবারকার জীবনের অগ্নিপরীক্ষায় তাঁহার ধৈর্য্য আরও প্রকট হইল। তিন দিন হাজত-বাসের পর আদালতে নীত হলে তিনি তাঁহার জনৈক আত্মীয়কে বলেন, "বাড়ীতে বল কোন ভয় যেন করে না, আমার নির্দ্দোষিতা সম্পূর্ণরূপে প্রমাণিত হইবে।" অতঃপর তিনি লিখিয়াছেন, "আমার মনে তখন

হইতে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে ইহা হইবেই। প্রথম নির্জন কারাবাসে মন একটু বিচলিত হয়, কিন্তু তিন দিন প্রার্থনা ও ধ্যানে কাটানর ফলে নিশ্চল শান্তি ও অবিচলিত বিশ্বাস পুনঃ প্রাণকে অভিভূত করে।"

এই প্রকারে কারাগারে তাঁহার যোগারম্ভ হইল! বিচারাধীন আসামী হইলেও তাঁহার ও আর সকলের প্রতি নির্জন কারাবাসের আদেশ হইল, কারণ পুলিশের চোখে তাঁহারা ভয়ঙ্কর মানুষ। কারা-বাসের চিত্র আমরা শ্রীঅরবিন্দ ও অপর কয়েকজনের লেখায় পাই। "কারাকাহিনী"তে শ্রীঅরবিন্দ জেলের বাসস্থান, স্নান, আহার প্রভৃতি ব্যবস্থার যে সরস রহস্যপূর্ণ বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাতে বুঝা যায় যে, এই অমানুষিক ক্লেশভোগে তিনি একটুও কাতর হন নাই। পাঠকের মনে হয়, যিনি বাল্যকাল হইতে বিলাতের স্বাধীন হাওয়ায় মানুষ হইয়াছিলেন তিনি কি করিয়া তখনকার দিনের কারাগারের নিকৃষ্ট জীবনেও হৃষ্ট ছিলেন! আমরা দেখিয়াছি যে, বরোদায় থাকিতেই তিনি ব্যক্তিগত জীবনে সন্ন্যাসীর ন্যায় থাকিতেন। বাংলায় আসিয়া তাহার কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই। বরং বরোদায় যথেষ্ট টাকা উপার্জন করিতেন, কিন্তু এখানে তিনি "বন্দেমাতরম্" হইতে অতি সামান্য টাকা লইতেন এবং বলিতে গেলে শাকভাতে জীবন ধারণ করিতেন। বলিতেন যে, যে-দেশের অর্দ্ধেক লোক অর্দ্ধাহারে থাকে সে দেশে শাকভাত খাওয়াই উচিত। তাঁহার এই দারিদ্র্যব্রত লক্ষ্য করিয়াই তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিবার সময়ে ক্রেগান বিস্মিত হইয়া বলিয়াছিলেন যে, তাঁহার ন্যায় শিক্ষিত লোক এই অবস্থায় কি করিয়া থাকেন!

কিন্তু তখনকার দিনে কারাগার কি করিয়া মানুষকে অমানুষ করিত, কয়েদীকে পশু অপেক্ষাও দুঃসহ জীবন যাপন করিতে হইত তাহা পাঠ করিয়া আধুনিকযুগের লোকও হয়ত বিস্মিত হইবেন, যদিও ভারতের সহস্র সহস্র নরনারী গত ৪০ বৎসরের মধ্যে কারাব্রত উদ্‌যাপন করিয়াছেন। কিন্তু শ্রীঅরবিন্দ তাহা লইয়াই কত রহস্য

করিয়াছেন! যথা, তিনি লিখিয়াছেন, "শোবার ঘরের পার্শ্বে পায়খানা রাখা, স্থানে স্থানে বিলাতী সভ্যতার অঙ্গ বিশেষ, কিন্তু একটি ক্ষুদ্র ঘরে শোবার ঘর, খাবার ঘর ও পায়খানা—ইহাকেই too much of a good thing বলে। আমরা কু-অভ্যাসগ্রস্ত ভারতবাসী, সভ্যতার এত উচ্চ সোপানে পৌঁছা আমাদের পক্ষে কষ্টকর।"

কয়েদীদের স্নান করিবার নামমাত্র ব্যবস্থা ছিল, সে সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছেন, "ইংরাজেরা বলে ভাগবত-প্রেম ও শরীরের স্বচ্ছন্দতা প্রায়ই সমান ও দুর্লভ সদ্‌গুণ, তাহাদের জেলে এই জাতীয় প্রবাদের যাথার্থ্য রক্ষণার্থ অথবা অতিরিক্ত স্নানসুখে কয়েদীর অনিচ্ছাজনিত তপস্যার রসভঙ্গ ভয়ে এই ব্যবস্থা প্রচলিত, তাহা নির্ণয় করা কঠিন।" কিছুদিন পরে পানীয় জলের কষ্ট কিঞ্চিৎ লাঘব হইয়াছিল, সেই সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছেন, "তাহার আগেই আমি তৃষ্ণার সঙ্গে অনেক দিনের ঘোর সংগ্রামে পিপাসামুক্ত হইয়া উঠিয়াছিলাম।" দুইখানি কম্বলে শুইবার ব্যবস্থা সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, "যখন গরমের ক্লেশ অসহ্য হইয়া আর থাকা যাইত না, তখন মাটিতে গড়াইয়া শরীর শীতল করিয়া আরাম লাভ করিতাম। মাতা বসুন্ধরার শীতল উৎসঙ্গ স্পর্শের কি সুখ তাহা তখন বুঝিতাম। তবে জেলের সেই উৎসঙ্গ স্পর্শ বড় কোমল নয়, তদ্দ্বারা নিদ্রার আগমন বাধাপ্রাপ্ত হইত বলিয়া কম্বলের শরণ লইতে হইত।"

অতঃপর তিনি লিখিতেছেন, "আলিপুর গবর্ণমেন্ট হোটেলের যে বর্ণনা করিলাম...তাহা নিজের কষ্টভোগ জ্ঞাপন করিবার জন্য নয়...। যে সব কষ্টের কারণ দেখাইয়াছি, সে সব ছিল বটে, কিন্তু ভগবানের দয়াদৃষ্টি ছিল বলিয়া কয়েকদিন মাত্র এই কষ্ট অনুভব করিয়াছিলাম, তাহার পরে—কি উপায়ে পরে বলিব—মন সেই দুঃখের অতীত হইয়া কষ্ট অনুভব করিতে অসমর্থ হইয়াছিল। সেইজন্য জেলের স্মৃতি মনে উদয় হইলে ক্রোধ বা দুঃখ না হইয়া হাসিই পায়। যখন সর্ব্বপ্রথম জেলের বিচিত্র পোষাক পরিয়া আমার পিঞ্জরে ঢুকিয়া

থাকিবার বন্দোবস্ত দেখিলাম তখন এই ভাবই মনে প্রকাশ পাইল। মনে মনে হাসিতে লাগিলাম। আমি ইংরাজ জাতির ইতিহাস ও আধুনিক আচরণ নিরীক্ষণ করিয়া তাহাদের বিচিত্র ও রহস্যময় চরিত্র অনেকদিন আগেই বুঝিয়া লইয়াছিলাম, সেইজন্য আমার প্রতি তাহাদের এইরূপ ব্যবহার দেখিয়াও কিছুমাত্র আশ্চর্য্যান্বিত বা দুঃখিত হইলাম না।

ইহাকেই বলে ভাগ্যচক্র! যিনি সিভিল সার্ভিসে চাকুরি লইলে বহুলোককে এইরূপ কারাগারে পাঠাইতেন, তিনিই স্বয়ং কারাগারে এই ভীষণ অবস্থা বৎসরকাল ভোগ করিলেন! মহামতি রাণাড়ে একদা তাঁহাকে এই কারা-সংস্কারের ভার লইতে বলিয়াছিলেন। সত্যই স্বদেশী আন্দোলনের সময় হইতে সহস্র সহস্র নেতা ও কর্ম্মী এই কারা-যন্ত্রণা ভোগ না করিলে ভারতের কারাগারের ভীষণতা দূর হইতে কত যুগ লাগিত কে বলিতে পারে!

শ্রীঅরবিন্দ বৃটিশ-চরিত্র সম্বন্ধে স্থানে স্থানে কঠোর সমালোচনা করিয়াছেন, কিন্তু তাহা জাতিগত বিদ্বেষপ্রণোদিত হইয়া নহে—যে জাতি জগতে সভ্য বলিয়া পরিচয় দেয় সেই জাতির ব্যবস্থায় ভারতীয় কারাগারে এইরূপ অমানুষিক রীতি প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল বলিয়াই। অপরদিকে তিনি জেলের কর্ত্তৃপক্ষ ও সাধারণ কয়েদীদের নিকট হইতে যে সদয় ব্যবহার পাইয়াছিলেন তাহার মর্ম্মস্পর্শী বর্ণনা করিয়াছেন। নিম্নলিখিত কাহিনীটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য :—

"আলিপুরের একজন নিরপরাধীর কথা বলি। এব্যক্তি ডাকাতিতে লিপ্ত বলিয়া দশ বৎসর সশ্রম কারাবাসে দণ্ডিত। জাতে গোয়ালা, অশিক্ষিত, লেখাপড়ার ধার ধারে না, ধর্ম্ম-সম্বলের মধ্যে ভগবানে আস্থা এবং আর্য্যশিক্ষা-সুলভ ধৈর্য্য ও অন্যান্য সদ্‌গুণ ইহাতে বিদ্যমান। এই বৃদ্ধের ভাব দেখিয়া আমার বিদ্যা ও সহিষ্ণুতার অহঙ্কার চূর্ণ হইয়া গেল। বৃদ্ধের নয়নে সর্ব্বদা প্রশান্ত সরল মৈত্রীভাব বিরাজিত, মুখে সর্ব্বদা অমায়িক প্রীতিপূর্ণ আলাপ। সময় সময় নিরপরাধ কষ্ট-ভোগের কথা পাড়েন, স্ত্রীছেলেদের কথা বলেন, কবে ভগবান কারামুক্তি

দিয়া স্ত্রীছেলেদের মুখদর্শন করাইবেন, এই ভাবও প্রকাশ করেন, কিন্তু কখনও তাঁহাকে নিরাশ বা অধীর দেখি নাই। ভগবানের কৃপাপেক্ষায় ধীরভাবে জেলের কর্ম্ম সম্পন্ন করিয়া দিন যাপন করিতেছেন। বৃদ্ধের যত চেষ্টা ও ভাবনা নিজের জন্য নহে, পরের সুখ-সুবিধা সংক্রান্ত। দয়া ও দুঃখীর প্রতি সহানুভূতি তাঁহার কথায় কথায় প্রকাশ পায়, পরসেবা তাঁহার স্বভাবধর্ম্ম। নম্রতায় এই সকল সদ্‌গুণ আরও ফুটিয়া উঠিয়াছে। আমা হইতে সহস্রগুণ উচ্চহৃদয় বুঝিয়া এই নম্রতায় আমি সর্ব্বদা লজ্জিত হইতাম, বৃদ্ধের সেবাগ্রহণ করিতে সঙ্কোচ হইত, কিন্তু তিনি ছাড়েন না, তিনি সর্ব্বদা আমার সুখসোয়াস্তির জন্য চিন্তিত।"

এই কাহিনী বর্ণনা করিয়া শ্রীঅরবিন্দ লিখিতেছেন, "এই অবনতির দিনেও ভারতবর্ষের চাষার মধ্যে—আমরা যাহাকে অশিক্ষিত ছোটলোক বলি,—তাহাদের মধ্যে এইরূপ হিন্দুসন্তান পাওয়া যায়, ইহাতেই হিন্দুধর্ম্মের গৌরব, আর্য্যশিক্ষার অতুল গুণপ্রকাশ এবং ইহাতেই ভারতের ভবিষ্যৎ আশাজনক। শিক্ষিত যুবকমণ্ডলী ও অশিক্ষিত কৃষক সম্প্রদায় এই দুইটি শ্রেণীতেই ভারতের ভবিষ্যৎ নিহিত, ইহাদের মিলনেই ভবিষ্যৎ আর্য্যজাতি গঠিত হইবে।"

অচিরেই তিনি নরের মধ্যে নারায়ণ প্রত্যক্ষ করিবার অপূর্ব্ব অভিজ্ঞতা লাভ করিলেন। জেলে প্রবেশ করিবার পরই তাঁহার যে ভাবান্তর উপস্থিত হইয়াছিল সে সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছেন, "এইখানে ক্ষুদ্র ঘরের দেওয়াল সঙ্গীস্বরূপ, যেন নিকটে আসিয়া ব্রহ্মময় হইয়া আলিঙ্গন করিতে উদ্যত।...উঠানের দেওয়ালের গায়ে একটি বৃক্ষ ছিল, তাহার নয়নরঞ্জক নীলিমায় প্রাণ জুড়াইতাম। ছয় ডিগ্রীর ছয়টি ঘরের সামনে যে সান্ত্রী ঘুরিয়া থাকে, তাহার মুখ ও পদশব্দ অনেকবার পরিচিত বন্ধুর ঘোরাফেরার মত প্রিয় বোধ হইত। ঘরের পার্শ্ববর্ত্তী গোয়ালঘরের কয়েদীরা ঘরের সম্মুখ দিয়া গরু চরাইতে লইয়া যাইত। গরু ও গোপাল নিত্য প্রিয় দৃশ্য ছিল। আলিপুরের

নির্জন কারাবাসে অপূর্ব্ব প্রেমশিক্ষা পাইলাম। এইখানে আসিবার আগে মানুষের মধ্যে আমার ব্যক্তিগত ভালবাসা অতি ক্ষুদ্র গণ্ডীতে আবদ্ধ ছিল এবং পশুপক্ষীর উপর রুদ্ধ প্রেমস্রোত প্রায়ই বহিত না। মনে আছে রবিবাবুর একটি কবিতায় মহিষের উপর গ্রাম্যবালকের গভীর ভালবাসা বড় সুন্দরভাবে বর্ণিত আছে, সেই কবিতা প্রথম পড়িয়া কিছুতেই তাহা আমার হৃদয়ঙ্গম হয় নাই, ভাবের বর্ণনায় অতিশয়োক্তি ও অস্বাভাবিকতা দোষ দেখিয়াছিলাম। আলিপুরে বসিয়া বুঝিতে পারিলাম, সর্ব্বপ্রকার জীবের উপর মানুষের প্রাণে কি গভীর ভালবাসা স্থান পাইতে পারে, গরু পাখী পিপীলিকা পর্য্যন্ত দেখিয়া কি তীব্র আনন্দ স্ফুরণে মানুষের প্রাণ অস্থির হইতে পারে।*

এই প্রেমের অভিজ্ঞতা বাসুদেবের বিরাটরূপ প্রত্যক্ষ করিবার পূর্ব্বাভাষ। কিরূপে তাঁহার সেই অপূর্ব্ব অনুভূতি হইল তাহা তিনি নিজেই চমৎকার ভাষায় লিখিয়াছেন। তাহার সংক্ষিপ্ত তাৎপর্য্য দিতে গেলে মাধুর্য্য ও মহিমা নষ্ট হইবে বলিয়া সমস্তটাই নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

"এই নির্জন কারাবাসে কালযাপনের উপায়স্বরূপ পুস্তক বা অন্য কোন বস্তু ব্যতীত কয়েকদিন থাকিতে হইয়াছিল। পরে এমারসন সাহেব আসিয়া আমাকে বাড়ী হইতে ধুতি, জামা ও পড়িবার বই আনাইবার অনুমতি দিয়া যান। আমি কর্ম্মচারীদের নিকট হইতে কালি কলম ও জেলের ছাপান চিঠির কাগজ আনাইয়া আমার পূজনীয় মেসো মহাশয় 'সঞ্জীবনী'র সুপ্রসিদ্ধ সম্পাদককে (কৃষ্ণকুমার মিত্র) ধুতি, জামা এবং পড়িবার বইএর মধ্যে গীতা ও উপনিষদ পাঠাইতে অনুরোধ করিলাম। এই পুস্তকদ্বয় আমার হাতে পোঁছিতে

* কিরূপে লাল বড় বড় পিপীলিকার দংশনে বেদনা অনুভব না করিয়া অন্যপ্রকার অনুভূতি লাভ করিয়াছিলেন, তাহার অপূর্ব্ব অভিজ্ঞতার কথা প্রসঙ্গক্রমে শ্রীঅরবিন্দ দিলীপকুমারকে লিখিত একখানি পত্রে লিখিয়াছেন। পত্রখানি দিলীপকুমারের কাব্যগ্রন্থ "অনামী"তে আছে।

দুই-চারি দিন লাগে। তাহার পূর্ব্বে নির্জন কারাবাসের মহত্ব বুঝিবার যথেষ্ট অবসর পাইয়াছিলাম। কেন এইরূপ কারাবাসে দৃঢ় ও সুপ্রতিষ্ঠিত বুদ্ধিরও ধ্বংস হয় এবং তাহা অচিরে উন্মাদ অবস্থা প্রাপ্ত হয়, তাহা বুঝিতে পারিলাম এবং সেই অবস্থায়ই ভগবানের অসীম দয়া এবং তাঁহার সঙ্গে যুক্ত হইবার কি দুর্লভ সুবিধা হয় তাহাও হৃদয়ঙ্গম হইল।

"কারাবাসের পূর্ব্বে আমার সকালে একঘন্টা ও সন্ধ্যাবেলায় একঘন্টা ধ্যান করিবার অভ্যাস ছিল। এই নির্জন কারাবাসে আর কোনও কার্য্য না থাকায় অধিককাল ধ্যানে থাকিবার চেষ্টা করিলাম। কিন্তু মানুষের সহস্র পথে ধাবিত চঞ্চল মনকে ধ্যানার্থে অনেকটা সংযত এবং একলক্ষ্যগত রাখা অনভ্যস্ত লোকের পক্ষে সহজ নয়। কোনমতে দেড়ঘন্টা ও দুইঘন্টা একভাবে রাখিতে পারিতাম, শেষে মন বিদ্রোহী হইয়া উঠিত, দেহও অবসন্ন হইয়া পড়িত।

"প্রথমে নানা চিন্তা লইয়া থাকিতাম। তাহার পরে সেই মানুষের আলাপরহিত চিন্তার বিষয়শূন্য অসহনীয় অকর্ম্মণ্যতায় মন ধীরে ধীরে চিন্তাশক্তি রহিত হইতে লাগিল। এমন অবস্থা হইতে লাগিল যে সহস্র অস্পষ্ট চিন্তা মনের দ্বার সকলের চারিদিকে ঘুরিতেছে অথচ প্রবেশপথ নিরুদ্ধ; দুএকটি প্রবেশ করিতে সমর্থ হইয়া সেই নিস্তব্ধ মনোরাজ্যের নীরবতায় ভীত হইয়া নিঃশব্দে পলায়ন করিতেছে। এই অনিশ্চিত অবশ অবস্থায় অতিশয় মানসিক কষ্ট পাইতে লাগিলাম।"

অতঃপর তিনি বর্ণনা করিয়াছেন কিরূপে তিনি নানা বিষয়ে মনোনিবেশের চেষ্টা করিয়া ব্যর্থকাম হইলেন। "আবার ধ্যানে বসিলাম, ধ্যান কিছুতেই হইল না, বরং সেই তীব্র বিফল চেষ্টায় মন আরও শ্রান্ত, অকর্ম্মণ্য ও দগ্ধ হইতে লাগিল।" তিনি লাল ও কাল পিপীলিকার যুদ্ধ নিবারণ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন এবং অত্যাচার পীড়িতদের বাঁচাইলেন। "তথাপি দীর্ঘ দিনার্দ্ধ যাপন করিবার উপায় আর জুটিতেছিল না। মনকে বুঝাইয়া দিলাম, জোর

করিয়া চিন্তা আনিলাম, কিন্তু দিন দিন মন বিদ্রোহী হইতে লাগিল, হাহাকার করিতে লাগিল। কাল যেন তাহার উপর অসহ্য ভার হইয়া পীড়ন করিতেছে, সেই চাপে চূর্ণ হইয়া সে হাঁপ ছাড়িবার শক্তিও পাইতেছে না, যেন স্বপ্নে শত্রুদ্বারা আক্রান্ত ব্যক্তি গলাপীড়নে মরিয়া যাইতেছে অথচ হাত পা থাকিয়াও নড়িবার শক্তি রহিত।" পূর্ব্বে কতবার একাকী চিন্তায় কালযাপন করিয়াছেন—কিন্তু অল্পদিনের নির্জনতায় কি আকুলতা! "কথা আছে, যে নির্জনতা সহ্য করিতে পারে, সে হয় দেবতা নয় পশু—এই সংযম মানুষের সাধ্যাতীত। সেই কথায় আমি আগে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিতাম না; এখন বুঝিলাম সত্যসত্যই যোগাভ্যস্ত সাধকেরও এই সংযম সহজসাধ্য নয়।"

কি করিয়া এই ভীষণ অবস্থায় তিনি অবিচল হইলেন তাহা বর্ণনা করিয়া তিনি লিখিয়াছেন, "ইতালীর রাজহত্যাকারী ব্রেসীর ভীষণ পরিণাম মনে পড়িল। তাঁর নিষ্ঠুর বিচারকগণ তাঁহাকে প্রাণে না মারিয়া সপ্ত বৎসরের নির্জন কারাবাসে দণ্ডিত করিয়াছিলেন। এক বৎসরও অতিবাহিত না হইতেই ব্রেসী উন্মাদাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তবে এতদিন সহ্য করিলেন ত! আমার মনের দৃঢ়তা কি এতই কম?

"তখন বুঝিতে পারি নাই যে ভগবান আমার সহিত খেলা করিতেছেন, ক্রীড়াচ্ছলে আমাকে কয়েকটি প্রয়োজনীয় শিক্ষা দিতেছেন। প্রথমতঃ, কিরূপ মনের গতিতে নির্জন কারাবাসের কয়েদী উন্মত্ততার দিকে ধাবিত হয়, তিনি তাহা দেখাইয়া এইরূপ কারাবাসের অমানুষিক নিষ্ঠুরতা বুঝাইয়া আমাকে ইয়ুরোপীয় জেল-প্রণালীর ঘোর বিরোধী করিলেন, এবং যাহাতে আমার সাধ্যমত আমি দেশের লোককে ও জগৎকে এই বর্ব্বরতা হইতে ফিরাইয়া দয়ানুমোদিত জেল-প্রণালীর পক্ষপাতী করিবার চেষ্টা করি তিনি সেই শিক্ষা আমাকে দিলেন।"

এই প্রসঙ্গে শ্রীঅরবিন্দ বহুপূর্ব্বে মহামতি রাণাড়ে তাঁহাকে কারাসংস্কারের ভার লইতে বলিয়াছিলেন সেই কথার উল্লেখ করিয়াছেন।

অতঃপর লিখিতেছেন, "ভগবানের দ্বিতীয় অভিসন্ধি বুঝিলাম, আমার মনের এই দুর্ব্বলতা মনের সম্মুখে তুলিয়া তাহা চিরকালের জন্য বিনাশ করা। যে যোগাবস্থাপ্রার্থী তাহার পক্ষে জনতা ও নির্জনতা সমান হওয়া উচিত। বাস্তবিক অল্পদিনের মধ্যে এই দুর্ব্বলতা ঘুচিয়া গেল, এখন বোধ হয় দশবৎসর একাকী থাকিলেও মন টলিবে না। মঙ্গলময় অমঙ্গল দ্বারাও পরম মঙ্গল ঘটান।

"তৃতীয় অভিসন্ধি, আমাকে এই শিক্ষা দেওয়া যে আমার যোগাভ্যাস স্বচেষ্টায় কিছু হইবে না, শ্রদ্ধা ও আত্মসমর্পণই সিদ্ধিলাভের পন্থা, ভগবান স্বয়ং প্রসন্ন হইয়া যে শক্তিসিদ্ধি বা আনন্দ দিবেন, তাহাই গ্রহণ করিয়া কার্য্যে লাগান আমার যোগলিপ্সার একমাত্র উদ্দেশ্য। যে দিন হইতে অজ্ঞানের প্রগাঢ় অন্ধকার লঘীভূত হইতে লাগিল, সেদিন হইতে আমি জগতের ঘটনাসকল নিরীক্ষণ করিতে করিতে মঙ্গলময় শ্রীহরির আশ্চর্য্য অনন্ত মঙ্গল স্বরূপত্ব উপলব্ধি করিতেছি।"

অবশেষে এইরূপে ভগবানের করুণা অনুভব করিলেন :— "এইরূপ ভাবে মনের নিশ্চেষ্টতায় পীড়িত হইয়া কয়েকদিন কষ্টে কালযাপন করিলাম। একদিন অপরাহ্ণে আমি চিন্তা করিতেছিলাম, চিন্তাই আসিতে লাগিল, হঠাৎ সেই চিন্তাসকল এমন অসংযত ও অসংলগ্ন হইতে লাগিল যে বুঝিতে পারিলাম চিন্তার উপর বুদ্ধির নিগ্রহশক্তি লুপ্ত হইতে চলিল। তাহার পরে যখন প্রকৃতিস্থ হইলাম তখন মনে পড়িল যে বুদ্ধির নিগ্রহশক্তি লুপ্ত হইলেও বুদ্ধি স্বয়ং লুপ্ত বা এক মুহূর্ত্তও ভ্রষ্ট হয় নাই, বরং শান্তভাবে মনের এই অপূর্ব্ব ক্রিয়া যেন নিরীক্ষণ করিতেছিল। কিন্তু তখন আমি উন্মত্ততাভয়ে ত্রস্ত হইয়া ইহা লক্ষ্য করিতে পারি নাই। প্রাণপণে ভগবানকে ডাকিলাম, আমার বুদ্ধিভ্রংশ নিবারণ করিতে বলিলাম। সেই মুহূর্ত্তেই আমার সমস্ত অন্তঃকরণে হঠাৎ এমন শান্তি প্রসারিত হইল, সমস্ত শরীরময় এমন শীতলতা ব্যাপ্ত হইতে লাগিল, উত্তপ্ত মন এমন স্নিগ্ধ, প্রসন্ন ও পরম সুখী হইল যে

পূর্ব্বে এই জীবনে এমন সুখময় অবস্থা অনুভব করিতে পারি নাই। শিশু মাতৃক্রোড়ে যেমন আশ্বস্ত ও নির্ভীক হইয়া শুইয়া থাকে আমিও যেন বিশ্বজননীর ক্রোড়ে সেইরূপ শুইয়া রহিলাম। এই দিনই আমার কারাবাসের কষ্ট ঘুচিয়া গেল।"

তিনি শুধু ব্যক্তিগতভাবে শান্তিলাভ করিলেন না, শীঘ্রই ভগবানের সর্ব্বময়ত্ব উপলব্ধি করিলেন। এই সময়ে ডাঃ ডেলী তাঁহার সকালে বিকালে একটু বাহিরে বেড়াইবার ব্যবস্থা করিলেন। তিনি ইতস্ততঃ পদচারণা করিতে করিতে উপনিষদের গভীর ভাবোদ্দীপক, অক্ষয় শক্তিদায়ক মন্ত্রসকল আবৃত্তি করিতেন এবং সর্ব্বঘটে নারায়ণ এই মূল সত্য উপলব্ধি করিবার চেষ্টা করিতেন। "বৃক্ষে, গৃহে, প্রাচীরে, মনুষ্যে, পশুতে, পক্ষীতে, ধাতুতে, মৃত্তিকায় সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম মনে মনে এই মন্ত্রোচচারণ পূর্ব্বক সর্ব্বভূতে সেই উপলব্ধি আরোপ করিতাম। এইরূপ করিতে করিতে এমন ভাব হইয়া যাইত যে, কারাগার আর কারাগারই বোধ হইত না। সেই উচচ প্রাচীর, লোহার গরাদ, সেই সাদা দেওয়াল, সেই সূর্য্যরশ্মিদীপ্ত নীলপত্রশোভিত বৃক্ষ, সেই সামান্য জিনিষপত্র যেন আর অচেতন নহে, যেন সর্ব্বব্যাপী চৈতন্যপূর্ণ হইয়া সজীব হইয়াছে, তাহারা আমাকে ভালবাসে, আমাকে আলিঙ্গন করিতে চায় এইরূপ বোধ হইত। মনুষ্য, গাভী, পিপীলিকা, বিহঙ্গ চলিতেছে, উড়িতেছে, গাহিতেছে, কথা বলিতেছে—অথচ সবই প্রকৃতির ক্রীড়া ; ভিতরে এক মহান্ নির্ম্মল নির্লিপ্ত আত্মা শান্তিময় আনন্দে নিমগ্ন হইয়া রহিয়াছে।

"এক একবার এমন বোধ হইত যেন ভগবান সেই বৃক্ষতলে আনন্দের বংশী বাজাইতে দাঁড়াইয়াছেন ; এবং সেই মাধুর্য্যে আমার হৃদয় টানিয়া বাহির করিতেছেন। সর্ব্বদা বোধ হইতে লাগিল যেন কে আমাকে আলিঙ্গন করিতেছে, কে আমাকে কোলে করিয়া রহিয়াছে। এই ভাব বিকাশে আমার সমস্ত মনপ্রাণ অধিকার করিয়া কি এক নির্ম্মল মহতী শান্তি বিরাজ করিতে লাগিল, তাহার বর্ণনা করা যায় না।

প্রাণের কঠিন আবরণ খুলিয়া গেল এবং সর্ব্বজীবের উপর প্রেম-স্রোত বহিতে লাগিল। প্রেমের সহিত দয়া, করুণা, অহিংসা ইত্যাদি সাত্ত্বিক ভাব আমার রজঃ-প্রধান স্বভাবকে অভিভূত করিয়া বিশেষ বিকাশ লাভ করিতে লাগিল। আর যতই বিকাশ পাইতে লাগিল, ততই আনন্দ বৃদ্ধি হইল এবং নির্ম্মল শান্তিলাভ গভীর হইল। মোকদ্দমার দুশ্চিন্তা প্রথম হইতেই দূর হইয়া গিয়াছিল। এখন বিপরীত-ভাব মনে স্থান পাইল। ভগবান মঙ্গলময়, আমার মঙ্গলের জন্যই আমাকে কারাগৃহে আনিয়াছেন, কারামুক্তি ও অভিযোগ নিশ্চয়ই খণ্ডন হইবে, এই বিশ্বাস দৃঢ় হইয়া গেল। ইহার পরে অনেকদিন আমায় জেলের কোনও কষ্টভোগ করিতে হয় নাই।"

ইহাই হইল শ্রীঅরবিন্দের ভূমা, বিশ্বাত্মা, সচ্চিদানন্দ, মহৎ আত্মার উপলব্ধি। তখন হইতেই তাঁহার সত্তায় মহৎ-আত্মা বিকশিত হইল। কারাগারে আসিবার পূর্ব্বেই শান্ত আত্মার উপলব্ধিতে তাঁহার সত্তা গভীর স্তব্ধতায় পূর্ণ হইয়াছিল, এক্ষণে সচ্চিদানন্দের উপলব্ধিতে পূর্ণ আনন্দ স্ফুরণ হইল। বিরাটের উপলব্ধির ফলে, কারাগার হইতে বাহির হইয়াই শ্রীঅরবিন্দ গীতার বাণী প্রচার করিতে আরম্ভ করিলেন, যাহার প্রথম প্রকাশ হইতেছে "ধর্ম্মে" লিখিত "গীতার ভূমিকা" এবং যাহার শ্রেষ্ঠদান পণ্ডিচারীতে লিখিত গীতার মহাভাষ্য—"Essays on the Gita" এ সম্বন্ধে তিনি উত্তরপাড়া অভিভাষণে বলিয়াছেন :—

"তারপর তিনি আমার হাতে গীতা দিলেন। তাঁর শক্তি আমার মধ্যে প্রবেশ করল এবং আমি গীতার সাধনা অনুসরণ করতে সক্ষম হলাম। আমাকে শুধু বুদ্ধি দিয়ে বুঝতে হয় নি, পরন্তু অনুভূতি উপলব্ধির ভিতর দিয়ে জান্‌তে হয়েছে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের কাছ থেকে কি চেয়েছিলেন, যারা তাঁর কাজ করবার আকাঙ্ক্ষা করে তাদের কাছ থেকে তিনি কি চান—রাগদ্বেষ থেকে মুক্ত হতে হবে, ফলাকাঙ্ক্ষা না রেখে তাঁর জন্যে কর্ম্ম করতে হবে, নিজের ইচ্ছা পরিত্যাগ করতে হবে, ভগবানের হাতে নির্ব্বিরোধ ও বিশ্বস্ত যন্ত্র হতে হবে, উচ্চনীচ,

শত্রুমিত্র, জয়পরাজয় সবের প্রতি সমভাবাপন্ন হতে হবে, অথচ তাঁর কাজে শৈথিল্য করা চলবে না।"

তাঁহাকে যখন সেলের বাহিরে বেড়াইতে দেওয়া হইল তখনকার অনুভূতি বর্ণনা করিয়া বলেন, "যখন আমি বেড়াতাম সেই সময়ে তাঁর শক্তি পুনরায় আমার মধ্যে প্রবেশ করল। যে-জেল আমাকে মানব-জগৎ থেকে আড়াল করে রেখেছে সেই দিকে আমি তাকালাম কিন্তু দেখলাম আমি আর জেলের উচচ দেওয়ালের মধ্যে বন্দী নই, আমাকে ঘিরে রয়েছেন বাসুদেব।"*

এইরূপে তিনি সর্ব্বত্র, সর্ব্বভূতে বাসুদেবকে দেখিলেন, যাহার বর্ণনা আমরা পূর্ব্বেই "কারাকাহিনী"তে পাইয়াছি। এমন কি জেলের কয়েদীদের—সেই সব তমসাচ্ছন্ন আত্মা ও অপব্যবহৃত দেহের মধ্যে তিনি নারায়ণকে দেখিতে পাইলেন। অতঃপর তিনি পুনর্ব্বার ভগবদ্-বাণী পাইলেন :—"পুনরায় ভগবান আমাকে বললেন, 'দেখ, কি সব লোকের মাঝে আমি তোমাকে পাঠিয়েছি আমার একটু কাজ করবার জন্যে। যে জাতকে আমি তুলতে চাই এই হচ্ছে তার স্বরূপ এবং এই কারণেই আমি তাদের তুলতে চাই।"

বিচারালয়েও তিনি ম্যাজিষ্ট্রেট, সরকারী উকিল প্রভৃতি সকলের মধ্যে বাসুদেব, নারায়ণ, শ্রীকৃষ্ণকে দেখিতে পাইলেন এবং তাঁহার পক্ষ সমর্থনে চিত্তরঞ্জনের আবির্ভাবে বুঝিলেন তাহাও নারায়ণের নির্দ্দেশ। আবার নির্জন কারাবাসে গভীরতর উপলব্ধি :—"এখন দিনের পর দিন আমি মনের মধ্যে হৃদয়ের মধ্যে, শরীরের মধ্যে হিন্দুধর্ম্মের সত্যগুলি উপলব্ধি করিতে লাগিলাম। সে সব আমার কাছে জীবন্ত অনুভূতি হয়ে উঠল, আমার সম্মুখে এমন সব জিনিষ উন্মুক্ত হ'ল জড়বিজ্ঞান যাদের কোন ব্যাখ্যাই দিতে পারে না।"

উত্তরপাড়া অভিভাষণে আমরা শ্রীঅরবিন্দের সাধনার ধারার একটা স্পষ্ট নির্দ্দেশ পাই। তিনি বলেন, "বহুদিন পূর্ব্বে স্বদেশী আন্দোলন

* উত্তরপাড়া অভিভাষণ—শ্রীযুক্ত অনিলবরণ রায়ের অনুবাদ।

আরম্ভ হবার কয়েক বৎসর আগে বরোদায় থাকার সময়ে আমি ভগবানকে চেয়েছিলাম এবং দেশের কাজের মধ্যে আকৃষ্ট হয়েছিলাম। সেই সময়ে আমি ভগবানের দিকে অগ্রসর হই, তাঁর উপর যে জ্বলন্ত বিশ্বাস ছিল তা বলতে পারি না। আমার মধ্যে বিদ্যমান ছিল অবিশ্বাসী, সংশয়বাদী নাস্তিক, ভগবান আদৌ আছেন কিনা সে বিষয়ে আমি সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহ ছিলাম না। আমি তাঁর বিদ্যমানতা অনুভব করতাম না। তত্রাপি কি যেন আমাকে বেদের সত্যের দিকে, গীতার সত্যের দিকে, হিন্দু-ধর্ম্মের সত্যের দিকে আকর্ষণ করত। আমি অনুভব করতাম যে এই যোগের মধ্যে, বেদান্তের উপর প্রতিষ্ঠিত এই ধর্ম্মের মধ্যে মহাশক্তিশালী সত্য নিশ্চয়ই আছে।

"তাই যখন আমি যোগের দিকে ফিরলাম, সঙ্কল্প করলাম যে যোগসাধনা করব, দেখব আমার ধারণা সত্য কিনা, তখন আমি এই ভাব নিয়ে অগ্রসর হয়েছিলাম, ভগবানকে এই প্রার্থনা জানিয়েছিলাম, 'যদি তুমি থাক, তুমি আমার মর্ম্মের কথা জান। তুমি জান, আমি মুক্তি চাই না, অপরে যা চায় এমন কোন জিনিষই আমি চাই না ; আমি শুধু চাই, এই যে ভারতের লোক-সকলকে আমি ভালবাসি, যেন এদের জন্যে আমার জীবন উৎসর্গ করতে পারি।'

"যোগের সিদ্ধির জন্যে আমি অনেক দিন ধরে চেষ্টা করেছিলাম এবং শেষ পর্য্যন্ত আমি তা কতকটা লাভ করেছিলাম, কিন্তু যেটি সবচেয়ে বেশী চাইতাম তাতে সন্তুষ্ট হতে পারি নি। তারপর জেলের নিঃসঙ্গতার মধ্যে, নির্জন সেলের মধ্যে আবার সেটি পাইলাম। আমি বললাম, 'দাও আমাকে তোমার আদেশ। আমি জানি না কি কাজ আমাকে করতে হবে, কেমন করে করতে হবে। আমাকে একটা বাণী দাও।'

"যোগ সাধনার ভিতর দিয়ে দুইটি বাণী এল। প্রথম বাণীটি হ'ল, 'আমি তোমাকে একটা কাজ দিয়েছি এবং সেটি হচ্ছে এই জাতিকে তুল্‌তে সাহায্য করা। শীঘ্রই এমন সময় আসবে যখন তোমাকে জেলের বাইরে যেতে হবে।'

"দ্বিতীয় বাণীটি এল এইরূপ :—'এই এক বৎসর নির্জন-বাসে তোমাকে কিছু দেখান হয়েছে, এমন কিছু যা সম্বন্ধে তোমার সন্দেহ ছিল এবং তা হচেছ হিন্দুধর্ম্মের সত্যতা। এই ধর্ম্মটিকে আমি জগতের সামনে তুলে ধরছি; ঋষি, সন্ত, অবতারদের ভিতর দিয়ে এই ধর্ম্মটিকে আমি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করে গড়ে তুলছি; আর এখন ইহা যাচেছ জাতি সকলের মধ্যে আমার কাজ সম্পন্ন করতে। আমার বাণী প্রচার করবার জন্যেই আমি এই জাতিটাকে তুলছি। এইটিই সনাতন ধর্ম্ম, তুমি এই ধর্ম্মকে আগে বাস্তবিক পক্ষে জানতে না, কিন্তু এখন আমি এটি তোমার কাছে প্রকাশ করেছি। তোমার মধ্যে যে অবিশ্বাসী ছিল, নাস্তিক ছিল তাহার উত্তর দেওয়া হয়েছে, কারণ আমি তোমাকে প্রমাণ দিয়েছি, অন্তরে ও বাহিরে, স্থূলে ও সূক্ষ্মে প্রমাণ দিয়েছি এবং সে প্রমাণে তুমি সন্তুষ্ট হয়েছ। যখন তুমি বাইরে যাবে, তোমার জাতিকে সর্ব্বদা এই বাণীই শোনাবে যে, সনাতন ধর্ম্মের জন্যেই তারা উঠ্ছে, নিজেদের জন্যে নয় পরন্তু সমস্ত জগতের জন্যেই তারা উঠ্ছে। আমি তাদের স্বাধীনতা দিচিছ জগতের সেবার জন্যে......"*

কি অমোঘ বাণী! যখন শ্রীঅরবিন্দ এই বাণী প্রাপ্ত হন তখন বোধ হয় কেহই কল্পনা করিতে পারেন নাই যে ভারত এত শীঘ্র স্বাধীনতা লাভ করিবে। আর আজ অনেক নেতাই বলিতেছেন যে, ভারতের স্বাধীনতাই জগতের রূপান্তরে সহায়তা করিবে।

এই বাণী—আদেশই—শ্রীঅরবিন্দের জীবনকে পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে। এই আদেশ অনুসারেই তিনি চল্লিশ বৎসর যাবৎ পণ্ডিচারীতে সাধনায় মগ্ন এবং তাহার মধ্যে পূর্ণ দ্বাদশ বৎসর নিঃসঙ্গ জীবন-যাপন করিয়াছেন। পূর্ণ উপলব্ধি এবং আদর্শে অখণ্ড বিশ্বাস না জন্মিলে কেহ এরূপভাবে সর্ব্বকার্য্য পরিত্যাগ করিয়া গভীর সাধনায় মগ্ন হইতে পারে না। তিনি নিজেই বলিয়াছেন এ সাধনা তাঁহার নিজের মুক্তির জন্য নহে, ভগবানের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য। চল্লিশ

* শ্রীযুক্ত অনিলবরণ রায়ের অনুবাদ।

বৎসর পূর্ব্বে তিনি যোগপথ অবলম্বন করিয়াছিলেন নিজের মুক্তির জন্য নহে, ভারতকে জাগ্রত করিবার জন্য। এই চল্লিশ বৎসর যাবৎ তাঁহার অখণ্ড যোগসাধনা চলিয়াছে, মানব-জীবনকে দিব্যজীবনে রূপান্তরিত করিবার জন্য।

অতি-আধুনিক মানুষের বর্ত্তমানে যে মনোভাব এককালে শ্রীঅরবিন্দের সেইরূপ মনোভাবই ছিল। আধুনিক বুদ্ধিজীবী মানুষের মত তিনি সংশয়বাদী ছিলেন, কিন্তু বুদ্ধিজীবীর ন্যায় তিনি সংশয়বাদ লইয়া গর্ব্ব করিতেন না, তাহাকেই চরম জ্ঞান বলিয়া মনে করিতেন না। তাঁহার বুদ্ধি ছিল গভীর, তাঁহার হৃদয় ছিল অবারিত—সত্য গ্রহণে উন্মুখ। তাই তাঁহার পূর্ণভাবে সত্য উপলব্ধি হইল নিজের সাধনা দ্বারা, কোন অলৌকিক উপায়ে নহে। ভগবানই প্রচ্ছন্নভাবে ঘটনাচক্রের মধ্য দিয়া তাঁহাকে পরম জ্ঞান দিলেন। জ্ঞানের উদয়ে ভক্তি অবিচল হইল, তাহাকে কর্ম্মে বিকাশ করিবার সঙ্কল্প লইয়া তিনি জেলের বাহিরে আসিলেন। কিন্তু অচিরেই পূর্ণ শক্তিবিকাশের জন্য তিনি পূর্ণযোগ গ্রহণ করিলেন। ইহাই তাঁহার বাহিরের কর্ম্মক্ষেত্র হইতে সরিয়া যাইবার কারণ। পূর্ণ সাধনা ত বাহিরের প্রাকৃতিক কর্ম্ম-ঝঞ্ঝার মধ্যে হয় না।

দশম অধ্যায়

বাংলা ত্যাগের পূর্ব্বে কয়েকমাস

প্রায় চারি বৎসর শ্রীঅরবিন্দ বাংলার কর্ম্মক্ষেত্রে ছিলেন, তাহার মধ্যে পূর্ণ এক বৎসর জেলে কাটিয়া গেল। জেল হইতে বাহির হইয়া তিন দেশবাসীর নিকট বিপুল অভিনন্দন পাইলেন, কিন্তু দেখিলেন যে, রাজনীতি ক্ষেত্রে সে উৎসাহ ও উদ্দীপনা নাই। গবর্ণমেন্টের প্রচণ্ড দমননীতিতে সকলেই সন্ত্রস্ত। কৃষ্ণকুমার মিত্র, অশ্বিনীকুমার দত্ত প্রভৃতি বাংলার নয় জন নেতা নির্ব্বাসন ভোগ করিতেছেন। তিলক কারাগারে,* বিপিনচন্দ্র বিলাতে, লালা লাজপত রায়ও আমেরিকায় নির্ব্বাসনে এবং অন্যান্য নেতারা কেহ কারাগারে, কেহ বা সরিয়া পড়িয়াছেন। ডাঃ মুঞ্জে, মতিলাল ঘোষ প্রভৃতি কয়েকজন কোন প্রকারে জাতীয় দলের আদর্শ আঁকড়াইয়া আছেন। মধ্যপন্থীদলই আসর জমাইয়া রাখিয়াছেন। ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে তাঁহারা স্যর রাসবিহারী ঘোষকে সভাপতি করিয়া মাদ্রাজে জাতীয়দল-বর্জিত কংগ্রেস করিয়াছেন। ও-দিকে বিপ্লববাদও প্রচ্ছন্নভাবে চলিয়াছে; বোমার হিড়িকে যুবক সমাজ উদ্দীপিত। জাতীয় আন্দোলনে খুব কম লোকই খোলা-খুলিভাবে যোগ দিতেছেন।

তথাপি জাতীয়দলের বিচ্ছিন্ন শক্তিকে যথাসম্ভব সংহত করিয়া শ্রীঅরবিন্দ পুনরুদ্যমে কার্য্য আরম্ভ করিলেন। তাঁহার অবর্ত্তমানে জাতীয়দলের মুখপত্র "বন্দেমাতরম্"-এর অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইয়াছিল।

---

* মজঃফরপুরে বোমা সম্বন্ধে, তাঁহার মুখপত্র "কেশরী"তে, এক প্রবন্ধ লিখিবার জন্য লোকমান্য তিলকের ছয় বৎসর কারাদণ্ড হয়। তাঁহাকে ব্রহ্মের মান্দালয় জেলে রাখা হইয়াছিল।

গবর্ণমেন্ট উহার প্রেস বাজেয়াপ্ত করিয়াছিলেন। "যুগান্তর", "সন্ধ্যা", "নবশক্তি" প্রভৃতি কাগজগুলি নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে। পরিবর্ত্তিত অবস্থায় শ্রীঅরবিন্দ পূর্ব্ব পদ্ধতিতে রাজনীতিক কার্য্য করিলেন না, জেলে তাঁহার যে গভীর উপলব্ধি হইয়াছিল তাহারই প্রেরণায় তিনি জাতীয় কার্য্য আরম্ভ করিলেন। একদিকে তিনি বাংলাকে সনাতন ধর্ম্মে, ভগবানে পূর্ণ বিশ্বাস রাখিয়া ফলাকাঙক্ষাহীন হইয়া কর্ত্তব্যপালন, জাতীয় ধর্ম্মরক্ষা করিতে উদ্বুদ্ধ করিলেন, অপরদিকে তদানীন্তন অবস্থায় যতদূর সম্ভব সংঘর্ষ বর্জন করিয়া ঐকান্তিকভাবে জাতীয় সংগঠন কার্য্যে দেশবাসীকে প্রেরণা দিতে লাগিলেন। এই উদ্দেশ্যেই তিনি ইংরাজি "কর্ম্মযোগিন্" ও বাংলা "ধর্ম্ম" নামক সাপ্তাহিকদ্বয় নিজেই চালাইতে লাগিলেন।

পূর্ব্বে "বন্দে মাতরম্" যেমন জাতিকে প্রেরণা দিত, তেমনি এই দুইখানি সাপ্তাহিক জাতীয় পাঞ্চজন্য নিনাদ করিতে লাগিল। "কর্ম্ম-যোগিন্"-এর প্রচ্ছদপট ছিল—শ্রীকৃষ্ণ মোহগ্রস্ত অর্জুনকে কর্ত্তব্যপালনে প্রবুদ্ধ করিতেছেন। শ্রীঅরবিন্দও বিভ্রান্ত, অবসন্ন জাতিকে প্রেরণা দিতে লাগিলেন যে সে যেন তম-আচ্ছন্ন না হইয়া পড়ে—সত্যে বিশ্বাস থাকিলে, আকাঙক্ষা অবিচল থাকিলে শত বিপত্তিতেও জাতি লক্ষ্যভ্রষ্ট হইবে না, ইহাই ছিল তাঁহার মূল নীতি। কিন্তু তখন রুদ্রের নৃত্য চলিয়াছে। একদিকে বিপ্লবের বিষাণ, অপর দিকে দমননীতির বিভীষিকা—বোধহয় শ্রীঅরবিন্দের বাণী শুনিবার অবস্থা জাতির ছিল না। তিনিও আদেশ পাইলেন যে, রাজনৈতিক কর্ম্মক্ষেত্র ত্যাগ করিয়া গভীরতর সাধনার জন্য তাঁহাকে সুদূরে যাইতে হইবে।

অনেকে বহুকাল মনে করিতেন যে শ্রীঅরবিন্দ রাজনীতিক ঝড়-ঝাপটা সহ্য করিতে না পারিয়া বাংলা ত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহারা ভুলিয়া যান যে, সমস্ত জীবনে তিনি কিরূপে স্বেচ্ছায় বারবার দুঃখকে বরণ করিয়া লইয়াছিলেন। তাঁহারা ভুলিয়া যান যে, কারাগারের অসহ্য ক্লেশ তিনি অম্লান বদনে সহ্য করিয়াছিলেন এবং সর্ব্বপ্রকার

দুঃখকে পূর্ণভাবে আয়ত্ত করিয়াছিলেন। তিনি যে পুনর্ব্বার কর্ত্তব্য পালনের জন্য রাজরোষের সম্মুখীন হইতে প্রস্তুত হইতেছিলেন তাহা "ধর্ম্মে" প্রকাশিত নিম্নলিখিত সম্পাদকীয় প্যারাগ্রাফটি হইতে বুঝা যায়—

"আমাদের পুলিশ বন্ধুগণ রটনা করিয়াছেন যে, আবার নির্ব্বাসনরূপ ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষিপ্ত হইবে, এইবার নয়জন নহে, চব্বিশ জনকে মোটরকারে, রেলে, Guide জাহাজে গবর্ণমেন্টের খরচে নানাপ্রদেশে ও বিবিধ জেলে ঘুরিয়া আসিবার জন্য প্রস্থান করিতে হইবে। পুলিশের এই তালিকায় শ্রীযুক্ত অরবিন্দ ঘোষ নাকি প্রথম নম্বর পাইয়াছেন। আমরা কখনও বুঝিতে পারি নাই, নির্ব্বাসন এমন কি ভয়ঙ্কর জিনিষ যে লোকে নির্ব্বাসনের নাম শুনিয়া ভয়ে জড়সড় হইয়া দেশের কার্য্য, কর্ত্তব্য, মনুষ্যত্ব পরিত্যাগপূর্ব্বক কম্পিত কলেবরে ঘরের কোণে মুখ ঢাকিয়া বসিয়া পড়ে। চিদাম্বরম্* প্রভৃতি কর্ম্মবীর বয়কট প্রচার দোষে যে কঠিন দণ্ড হাসিমুখে শিরোধার্য্য করিয়াছেন, তাহার তুলনায় এই দণ্ড লঘু, অতি অকিঞ্চিৎকর। বাহিরে পরিশ্রম করিতেছিলাম, নানা দুশ্চিন্তার মধ্যে দেশসেবার চেষ্টা করিতেছিলাম, না হয় ভগবান লর্ড মিন্টো ও মর্লীকে যন্ত্র করিয়া বলিলেন, যাও, নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া থাক, নির্জনে আমার চিন্তা কর, ধ্যান কর, পুস্তক পড়, পুস্তক লিখ, জ্ঞানসঞ্চয় কর, জ্ঞানবিস্তার কর। জনতায় থাকার রস আস্বাদন করিতেছিলে, নির্জনতার রস আস্বাদন কর। এই এমন কি ভয়ানক কথা যে ভয়ে কাতর হইতে হয়? কয়েকদিন প্রিয়জনের মুখ দেখিতে পাইব না—বিলাতে বেড়াইতে গেলে তাহা হয়, অথচ লোকে বিলাতে বেড়াইতে যায়। ধরুন অখাদ্য খাইয়া গ্রীষ্ম ও শীতে কষ্ট পাইয়া শরীর ভাঙ্গিয়া যাইবে। বাড়ীতে বসিয়াও রোগের হাত হইতে নিস্তার

* চিদাম্বরম পিলে মাদ্রাজের সুবিখ্যাত জাতীয় নেতা। ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে বয়কট প্রচারের জন্য ইঁহার সাত বৎসর কঠোর কারাদণ্ড হয়। জেলে ইঁহার প্রতি অতি জঘন্য কয়েদীর ন্যায় ব্যবহার করা হয়। গত ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে ইনি পরলোকে গমন করিয়াছেন।

নাই, বাড়ীতেও অসুখ হয়, মরণ হয়, অদৃষ্ট-লিখিত আয়ুক্রম কেহ অন্যথা করিতে পারে না। আর হিন্দুর পক্ষে মরণের ভীষণতা নাই। দেহ গেল, পুরাণ বস্ত্র গেল, আত্মা মরে না। সহস্রবার জন্মিয়াছি, সহস্রবার জন্মগ্রহণ করিব। ভারতের স্বাধীনতা না হয় স্থাপন করিতে পারিলাম না, ভারতের স্বাধীনতা ভোগ করিতে আসিব। কেহ আমাকে বারণ করিতে পারিবে না। এত ভয় কিসের? সস্তায় ইতিহাসে অমর নাম লিখাইলাম, স্বর্গের পথ উন্মুক্ত, অথচ কষ্ট নাই, অথচ সামান্য শরীর ক্লেশে মুক্তি ভুক্তি পাইলাম। এই ত' কথা। ট্রান্সভালের কুলীদের* মহৎ ভাব এবং ভারতের শিক্ষিত লোকের এই জঘন্য কাতরভাব দেখিয়া লজ্জিত হইতে হয়।"

পরবর্ত্তী প্যারাগ্রাফে ভারতের স্বাধীনতায় অখণ্ড বিশ্বাসভরে লিখিয়াছেন,...

"যাহা হউক চব্বিশ জনকে নির্ব্বাসন করুন বা একশ জনকে নির্ব্বাসন করুন, অরবিন্দ ঘোষকে নির্ব্বাসন করুন বা সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জীকে নির্ব্বাসন করুন, কালচক্রের গতি থামিবার নয়।"

"ধর্ম্ম" প্রকাশিত হয় ১৩১৬ সালের ৭ই ভাদ্র হইতে। উহাতে বরাবরই সম্পাদকরূপে শ্রীঅরবিন্দের নাম থাকিত। ঐ সালের ২৩শে ফাল্গুন হইতে মাত্র যে কয়েকখানি সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছিল তাহাতে তাঁহার নাম ছিল না। বোধহয় ঐ সময়ে তিনি পণ্ডিচারী প্রস্থানের পূর্ব্বে কলিকাতা ত্যাগ করিয়া অন্যত্র অবস্থান করিতেছিলেন। যাহা হউক উপরোক্ত উক্তিটি প্রকাশিত হয় ২৬শে পৌষ তারিখের "ধর্ম্মে"—তাঁহার কলিকাতা ত্যাগের বহুপূর্ব্বে। তখনই গুজব রটিয়াছিল তাঁহাকে নির্ব্বাসনে পাঠান হইবে।

যাঁহার মনে এইরূপ দৃঢ় সঙ্কল্প তিনি যে কোন রাজনৈতিক কারণে স্বেচ্ছায় কর্ম্মত্যাগ করিবেন তাহা একেবারেই অসম্ভব। তিনি বুঝি-

* ঐ সময়ে দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতবাসীর অধিকার লাভ করিবার জন্য মহাত্মা গান্ধী নিরুপদ্রব প্রতিরোধ আন্দোলন চালাইতেছিলেন।

য়াছিলেন তাঁহার আর পূর্ব্বের ন্যায় রাজনীতি ক্ষেত্রে কার্য্য করিবার প্রয়োজন নাই, কালক্রমে দেশ স্বাধীন হইবেই, তাঁহাকে ভারত-ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য গভীরতর সাধনায় মগ্ন হইতে হইবে। যদি তাঁহার নেতৃত্বের অহমিকা থাকিত তাহা হইলে তিনি এইরূপ করিতে পারিতেন না। কিন্তু তিনি নেতৃত্বের লালসায় বরোদার সুখের জীবন ত্যাগ করিয়া বাংলায় আসেন নাই, আসিয়াছিলেন সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া দেশমাতাকে সেবা করিবার জন্য, দেশবাসীর মধ্যে স্বাধীনতার প্রেরণা দিবার জন্য। তিনি বুঝিয়াছিলেন তাঁহার অবর্ত্তমানেও নানা বিঘ্নের ভিতর দিয়া জাতীয় আন্দোলন চলিবে এবং অচিরে তাহা শক্তিশালী হইয়া উঠিবে। কার্যতঃ হইয়াছিলও তাহাই।

তিনি পণ্ডিচারী যাইবার পর ও জাতীয় কংগ্রেস বারবার তাঁহাকে নেতৃত্ব গ্রহণ করিতে আহ্বান করিয়াছে, তাঁহাকে সভাপতি নির্ব্বাচিত করিয়াছে, কয়েকজন জাতীয় নেতা বিভিন্ন সময়ে তাঁহার নিকট গিয়া রাজনীতিতে যোগদান করিতে অনুরোধ করিয়াছেন। তখন জাতীয় আন্দোলন ব্যাপক ও শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছিল, এবং তিনি ইচ্ছা করিলেই আবার আন্দোলনের পুরোভাগে স্থান লইতে পারিতেন। কিন্তু সময় হয় নাই, তাঁহার সাধনা পূর্ণ হয় নাই বলিয়া তিনি কাহারও অনুরোধ রক্ষা করিতে পারেন নাই। যদি তিনি নেতৃত্ব-অভিলাষী, যশোলোলুপ হইতেন, তাহা চরিতার্থ করিবার যথেষ্ট সুযোগ পাইয়াছিলেন। তাঁহার জীবন-আদর্শের আভাস পাইয়াই বহুকাল পূর্ব্বে দূরদর্শী রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছিলেন, "আছ জাগি' পরিপূর্ণতার তরে সর্ব্ববাধাহীন।"

যে কয়মাস তিনি বাংলায় ছিলেন সেই সময়ে তিনি লেখা ও বক্তৃতা দ্বারা জাতির অধ্যাত্ম-চেতনা জাগাইবার কার্য্যে ব্রতী হইলেন বটে, কিন্তু অচিরে রাজনীতিক্ষেত্রেও আবার তাঁহাকে নেতৃত্ব গ্রহণ করিতে হইল। সুরাট কংগ্রেসের পর জাতীয়দল কংগ্রেসের সংস্রব একরূপ ত্যাগ করিয়াছিল এবং সেই সুযোগে মধ্যপন্থীদল রাজনীতিক প্রতিষ্ঠানগুলি করায়ত্ত করিয়াছিল। কাজেই শ্রীঅরবিন্দ অচিরেই জাতীয়দল

পুনর্গঠনে মনোনিবেশ করিলেন এবং বলিতে গেলে নেতৃত্বের ভার একা তাঁহাকেই লইতে হইল।

১৯০৭ খৃষ্টাব্দে যেমন মেদিনীপুরে প্রাদেশিক সম্মেলনে মধ্যপন্থী-দলের সহিত জাতীয়দলের শক্তি পরীক্ষা হইয়াছিল, তেমনি ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে হইল সম্মেলনের হুগ্‌লী অধিবেশনে। সেপ্টেম্বর মাসে ঐখানে সম্মেলন হইবার কথা। অভ্যর্থনা সমিতিতে স্থানীয় মধ্যপন্থী নেতারা যে সকল প্রস্তাবের খস্‌ড়া রচনা করিলেন তাহা জাতীয়দলের আদর্শের ঘোর পরিপন্থী। প্রতিনিধি নির্ব্বাচনেও তাঁহারা এমন ব্যবস্থা করিলেন যাহাতে তরুণগণ, বিশেষতঃ ছাত্রেরা যোগদান করিতে না পারে। এমন কি তাঁহারা চেষ্টার ত্রুটি করিলেন না যাহাতে শ্রীঅরবিন্দ পর্য্যন্ত প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হইতে না পারেন। এ সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দ নিজেই "ধর্ম্মে" লিখিয়াছিলেন :—

"বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইলাম যে যাহাতে শ্রীযুক্ত অরবিন্দ ঘোষ কোন জেলাসমিতি দ্বারা হুগ্‌লী অধিবেশনে প্রতিনিধি নিযুক্ত না হন কয়জন পরম দেশহিতৈষী সেজন্য গোপনে চেষ্টা করিয়াছে। এই জঘন্য নীতি এখনও আমাদের রাজনীতিতে স্থান পায় ইহা বড় দুঃখের কথা। অরবিন্দ বাবুকে যদি বয়কটই করিতে হয় করুন। তাহাতে তাঁহার আপত্তি নাই, তিনি দুঃখিত হইবেন না। তিনি কখনও কাহারও মুখাপেক্ষী হইয়া কার্য্য করেন নাই, পূর্ব্বে অনেকদিন স্বপথে একাকী অগ্রসর হইয়াছিলেন, ভবিষ্যতেও যদি একাকী যাইতে হয় ভয় করিবেন না। কিন্তু যদি এই মতই গৃহীত হয় যে, দেশের হিতের জন্য বা আপনার উদ্দেশ্য সাধনের জন্য অরবিন্দ বাবুর সংস্রব বর্জনীয়, প্রকাশ্যে দেশের সমক্ষে দণ্ডায়মান হইয়া এই মত প্রচারে কুণ্ঠিত হন কেন? এ গুপ্ত ষড়যন্ত্রের দ্বারা আপনাদের বা দেশের কি হিত সাধিত হইবে, তাহা বুঝা যায় না। ইতিমধ্যেই ডায়মণ্ড হারবার হইতে অরবিন্দবাবু প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। তোমাদের কন্‌ভেনসন্‌ নির্দ্ধারিত নিয়মানসারে হুগ্‌লী অধিবেশন হইতেছে না, যে কোন

সভা কোন প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করিতে পারে। ফলতঃ গুপ্তনীতি যেমন জঘন্য, তেমনি নিষ্ফল। কপটতার অভাব ইংরাজদের রাজনীতিক জীবনে একটা মহান্ গুণ; তাহারা যাহা করিতে হয় সাহসের সহিত সকলের সমক্ষে প্রকাশ্যভাবে, আর্য্যভাবে করে। ভারতের রাজনীতিক জীবনে এই মহান্ গুণের অবতারণা করিতে হইবে। চাণক্য-নীতি গণতন্ত্রে পোষায়, প্রজাতন্ত্রে কেবল ভীরুতা ও স্বাধীনতা-রক্ষণের অযোগ্যতা আনয়ন করে।"

জ্যোতিষ বাবুর পুস্তকে আমরা পাই (তিনি এই সম্মেলনের একজন কর্ম্মী ছিলেন) যে, শ্রীঅরবিন্দ দৃঢ়তার সহিত মধ্যপন্থীগণের এই ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করেন। তিনি প্রতিনিধি নির্ব্বাচনপত্র নিজের প্রেসে ছাপাইয়া প্রতিনিধির ২১ বৎসর বয়সের গণ্ডী উঠাইয়া সাহসভরে রিস্‌লে সার্কুলার অমান্য করিয়া ছাত্রদিগকে রাজনীতিতে যোগদান করিতে আহ্বান করেন, অভ্যর্থনা সমিতির ছাত্রপ্রতিনিধি নির্ব্বাচনের নিষেধ উপেক্ষা করেন এবং জাতীয় মনোভাবসম্পন্ন অধ্যাপকদিগকে পরামর্শ দেন যে তাঁহারা যেন নানাস্থানে সভা করিয়া সম্মেলনে প্রতিনিধি নির্ব্বাচনে সহায়তা করেন। তিনি হুগ্‌লীর জাতীয়দলকে নির্দ্দেশ দেন যে ছাত্রদের লইয়া স্বেচ্ছাসেবক দল গঠন করা হউক (অভ্যর্থনা সমিতি তাহাও নিষেধ করিয়াছিলেন)। অভ্যর্থনা সমিতি যে সকল প্রস্তাব উত্থাপিত হইবে বলিয়া ছাপাইয়াছিল, শ্রীঅরবিন্দ প্রতি প্রস্তাবের পাশে জাতীয়দলের প্রস্তাব লিখিয়া পুনরায় উহা ছাপাইয়া জাতীয় দলের প্রতিনিধিগণের মধ্যে বিতরণ করেন। এইরূপে তিনি সদলবলে সম্মেলনে উপস্থিত হইলেন।

তাঁহার এই দৃঢ়তা ও তৎপরতায় সম্মেলনে খুব উৎসাহ হইল। মধ্যপন্থীদল নানারূপ কৌশল অবলম্বন করিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু জনতার ধিক্কার ধ্বনিতে তাঁহাদিগকে নিরস্ত হইতে হইল। শ্রীঅরবিন্দের চেষ্টায় শান্তি স্থাপিত হইল এবং অবশেষে জাতীয় দলের প্রস্তাবগুলিই সম্মেলনে গৃহীত হইল।

জ্যোতিষবাবু দেখাইয়াছেন যে, শ্রীঅরবিন্দের কার্য্যের ফলে যেমন মধ্যপন্থীদল জাতীয়দলের প্রভাব স্বীকার করিতে বাধ্য হইল, তেমনি তাঁহারই চেষ্টায় দলাদলি ঘটিল না—যেমন মেদিনীপুরে হইয়াছিল। তাঁহার প্রতিপক্ষ দলকেও অবশেষে তাঁহার নেতৃত্ব স্বীকার করিতে হইল।

১৩১৬ সালের ২৮শে ভাদ্র তারিখের "ধর্ম্মে" শ্রীঅরবিন্দ "হুগ্‌লীর পরিণাম" সম্বন্ধে এক প্রবন্ধ লিখেন, "বঙ্গদেশ যে জাতীয়ভাবে পূর্ণ হইয়াছে তাহার আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। অনেকে সন্দেহ করিয়াছিলেন জাতীয়পক্ষের দুর্ব্বলতা ও সংখ্যার অল্পতাই অনুভূত হইবে; কিন্তু তাহা না হইয়া এই বর্ষব্যাপী দলন ও নিগ্রহে এই দলের কি অদ্ভুত শক্তিবৃদ্ধি ও তরুণদলের হৃদয়ে কি গভীর জাতীয়ভাব ও দৃঢ় সাহস জন্মিয়াছে তাহা দেখিয়া প্রাণ আনন্দিত ও প্রফুল্ল হইল।" অতঃপর তিনি নবীনদলের "শৃঙ্খলা ও নেতাদের আজ্ঞানুবর্ত্তিতার" উল্লেখ করিয়া মধ্যপন্থীদলের মনোভাব বিশ্লেষণ করেন এবং জাতীয়দল কর্ত্তৃক কংগ্রেসে মিলনের চেষ্টার কথা উল্লেখ করিয়া লিখেন, "এই অবস্থায় একতা অসম্ভব, কিন্তু যে ক্ষীণ আশা এখনও বিদ্যমান, তাহাই জাতীয়পক্ষ ধরিয়া আছেন, সেই আশায়, সংখ্যায় অধিক হইলেও, সর্ব্ববিষয়ে মধ্যপন্থীদিগের নিকট ইচ্ছা করিয়া হার মানিয়াছেন। এইরূপ ত্যাগস্বীকার ও আত্মসংযম সবল পক্ষই দেখাইতে পারে।"

অতঃপর তিনি জাতীয়দলের উদ্দেশ্যে লিখেন, "কিন্তু আমরা এই ক্ষীণ আশার উপর নির্ভর করিয়া নিশ্চেষ্ট থাকিতে পারি না। কবে কোন্ অতর্কিত দুর্ব্বিপাকে বঙ্গদেশের ঐক্য ছিন্নভিন্ন হইবে, তাহার কোন স্থিরতা নাই। মহারাষ্ট্র, মাদ্রাজ, যুক্তপ্রদেশ ও পাঞ্জাবের জাতীয়-পক্ষ আমাদের মুখের দিকে চাহিয়া রহিয়াছেন। বঙ্গদেশ ভারতের নেতা, বঙ্গদেশের দৃঢ়তা, সাহস ও কর্ম্মকুশলতায় সমস্ত ভারতের উদ্ধার হইবে, নচেৎ হওয়া অসম্ভব। অতএব আমরা জাতীয়দলকে আহ্বান করিতেছি, এখন কার্য্যক্ষেত্রে আবার অবতরণ করি, ভয়, আলস্য, নিশ্চেষ্টতা

দেশের জন্য উৎসর্গীকৃত প্রাণ সাধকের সাজে না। দেশময় জাতীয় ভাব প্রবল ভাবে জাগ্রত হইতেছে, কিন্তু কর্ম্মদ্বারা প্রকৃত আর্য্যসন্তান-রূপে পরিচয় দিতে না পারিলে সেই জাগরণ, সেই প্রাবল্য, সেই ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ স্থায়ী হইবে না।"

সুরাট কংগ্রেসের পর বাংলাই জাতীয়দলের আশাস্থল ছিল, কারণ মধ্যপন্থীদল একেবারেই সরকার-ঘেঁষা হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁহারা মর্লি-মিন্টো শাসন-সংস্কার পরিচালনা করিতে একান্ত আগ্রহান্বিত হইয়াছিলেন। "ধর্ম্মে"র দ্বিতীয় সংখ্যায় লিখিত সম্পাদকীয় মন্তব্যে আমরা জানিতে পারি যে, মধ্যপন্থীদল মাদ্রাজ কন্‌ভেন্‌সনে সম্মিলিত হইয়া "জাতীয় মহাসভা নাম ধারণপূর্ব্বক বয়কট বর্জন দ্বারা বঙ্গদেশের মুখে চূণকালি মাখাইয়াছিল, বাংলাদেশের মধ্যপন্থী নেতাগণ নীরবে এই লাঞ্ছনা সহ্য করিয়া সহ্যশক্তির পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন।"

ঐ সংখ্যায় অপর এক প্যারাগ্রাফে শ্রীঅরবিন্দ লিখেন, "শাসন-সংস্কারের ছায়ায় যে ভেদ-নীতি বৃক্ষ উৎপন্ন হইয়াছে লর্ড মর্‌লি তাহা রোপণ করিয়াছেন, দেশহিতৈষী গোখ্‌লে মহাশয় জল সিঞ্চন করিয়া সযত্নে পালন করিতেছেন।" "লর্ড মর্‌লির দ্বিতীয় চেষ্টা, রাজনীতিক ক্ষেত্রে মুসলমান ও হিন্দু সম্প্রদায়কে পৃথক করা। ইহাই ভেদ-নীতির দ্বিতীয় অঙ্গ, শাসন-সংস্কারের দ্বিতীয় বিষময় ফল।" অতঃপর তিনি লিখেন, "এই সংস্কারে বঙ্গবাসীর লেশমাত্র আস্থা নাই। যদি কয়েক-জন বড়লোক এই নূতন শাসন-প্রণালীতে যোগদান করিবার লোভ ছাড়িতে না পারিয়া দেশের প্রকৃত হিত ভুলিয়া যান, তাহাতে দেশের কোন অকল্যাণ হইবার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু সুরেন্দ্রবাবুর ন্যায় সর্ব্বজনপূজিত নেতা এই বিষবৃক্ষে জল সেচন করিলে দেশের নিতান্ত দুর্ভাগ্য বুঝিতে হইবে।"

কিন্তু মধ্যপন্থীদলের মনোভাব কিছুতেই পরিবর্ত্তিত হইবার নহে। যদিও সুরেন্দ্রনাথ ও ভূপেন্দ্রনাথ গোখ্‌লের মত বয়কট নীতির নিন্দা করেন নাই, তথাপি হুগ্‌লী প্রাদেশিক সম্মেলনের সভাপতি বৈকুণ্ঠ-

নাথ সেন জাতীয়দলকে অধীর ও অসম্ভব আদর্শের সন্ধানে ব্যস্ত বলিয়া অভিহিত করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। "বয়কট বিষরহিত প্রেমময় স্বদেশীতে পরিণত করাও নেতাদের স্থির অভিসন্ধি। স্বয়ং সভাপতি (বৈকুণ্ঠনাথ সেন) মহাশয় শেক্সপীয়রকে প্রমাণ করিয়া বয়কট নাম বয়কট করিবার পরামর্শ দিলেন, পাছে মর্‌লি-মডারেট মিলনমন্দিরে বিদ্বেষবহ্নি প্রবেশ করিয়া সব ভস্মসাৎ করে।"

এইরূপে শ্রীঅরবিন্দ মধ্যপন্থীদলের "পর-নির্ভরতা ও জড়ত্বের বিরুদ্ধে লেখনী চালনা করিয়া জাতীয়দলকে কর্ত্তব্য সাধনে আহ্বান করিলেন :—"এই অবস্থায় যাঁহারা দেশের জন্য সমস্ত জীবন উৎসর্গ করিতে প্রস্তুত, যাঁহারা ভয়ের পরিচয় রাখেন না, ভগবান ও বঙ্গজননী ভিন্ন কাহাকেও জানেন না ও মানেন না, তাঁহারা অগ্রসর না হইলে বঙ্গের ভবিষ্যৎ অন্ধকারময় হইবে।" ঝালকাঠিতে বরিশাল জেলা সম্মেলনের অধিবেশনেও তিনি পুনর্ব্বার বঙ্গদেশকে উদ্বোধিত করিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু আর দেশের যেন আগেকার মত সাড়া দিবার ক্ষমতা ছিল না। একা তিনি কি করিবেন? একদিকে মধ্যপন্থীদের বিপক্ষতা, অন্যদিকে জাতীয়দলে নেতার অভাব। এমন কি সংবাদপত্রগুলি বয়কট আন্দোলন সম্বন্ধে কিছু লিখিতে ভয় পাইত। জাতীয়দলের দৈনিক সংবাদপত্রের অভাবের কথা উল্লেখ করিয়া শ্রীঅরবিন্দ লিখেন, "সেদিন কলেজ স্কোয়ারে এক স্বদেশী সভা হইয়াছিল, তাহার বর্ণনা ও বক্তৃতার সারাংশ একটি সুপ্রসিদ্ধ দৈনিক পত্রিকায় দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু পত্রিকার কর্ত্তাগণ প্রকাশ করিতে অসম্মত হন। সেই সভার শ্রীযুক্ত অরবিন্দ ঘোষ অধ্যক্ষ হইয়া বক্তৃতা করিয়াছিলেন এবং ঘন ঘন বয়কটের উল্লেখ হইয়াছিল, ইহাতে বোধ হয় কর্ত্তাগণ ভীত ও বিরক্ত হইলেন। সে ভয় ও বিরক্তি স্বাভাবিক, আজকালকার দিনে বয়কট নামের যত কম উল্লেখ হয়, ততই ব্যক্তিগত মঙ্গল সম্ভব।"

শুধু তাহাই নয়, ৭ই আগষ্ট স্বদেশী উৎসব উপলক্ষে কলেজ স্কোয়ার হইতে মিছিল বাহির হইবার কথা লইয়া গোল হইয়াছিল। "কলেজ

স্কোয়ারের নামে কর্ত্তারা এত ভীত হইয়াছিলেন যে সেইদিন সভাপতি সভাপতিপদ ত্যাগ করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। অগত্যা মিছিল পান্তির মাঠ হইতে বাহির হইবার ব্যবস্থা হইল।" এমন কি ৩০শে আশ্বিন "রাখীবন্ধন" দিবসে কর্ত্তারা জাতীয় ঘোষণাপত্র পাঠের কথা বর্জন করিয়াছিলেন। এ বিষয়ে তীব্র প্রতিবাদ করিয়া, শ্রীঅরবিন্দ "ধর্ম্মে"র সম্পাদকীয় স্তম্ভে লিখেন,"আমরা বঙ্গভঙ্গের কুফল নিবারণ করিব, জাতীয় একতা সংরক্ষণ করিব, এই পবিত্র কর্ত্তব্য কর্ম্মে সমগ্র শক্তি প্রয়োগ করিব, এই কথাও ঘোষণা করিতে যদি সাহসে না কুলায়, তাহা হইলে ৭ই আগষ্টের ও ৩০শে আশ্বিনের অনুষ্ঠান বন্ধ কর। এতটুকু তেজ ও সাহস যদি না থাকে, তাহা হইলে জাতীয় জাগরণ ও উন্নতির চেষ্টা বিফল বুঝিতে হইবে, বৃথা তাহার বাহ্যিক আড়ম্বর করা মিথ্যাচার মাত্র।"

কিন্তু দেশের ভাগ্যচক্র অন্যদিকে ঘুরিতেছে। "মধ্যপন্থী-দল তাঁহাদের চিরবাঞ্ছিত শাসন-সংস্কার পাইয়াছেন, কিন্তু সেই লাভে হর্ষোৎফুল্ল না হইয়া শোকসন্তপ্ত হইতেছেন।" তথাপি তাঁহাদের চেতনা নাই। ওদিকে সন্ত্রাসবাদীদের দলনের সুযোগে পূর্ণভাবে পীড়ন-নীতি চলিয়াছে। এই দারুণ রাজনীতিক দুর্য্যোগে শ্রীঅরবিন্দ লিখিলেন :—

"বঙ্গবাসী, অনেকদিন ঘুমাইয়া রহিয়াছ; যে সব জাগরণ হইয়াছিল, যে নবপ্রাণ-সংস্কারক আন্দোলন সমস্ত ভারতকে আন্দোলিত করিয়াছিল, তাহা নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছে। ম্রিয়মাণ অবস্থায় অৰ্দ্ধনির্ব্বাণ-প্রাপ্ত অগ্নির ন্যায় অল্প অল্প জ্বলিতেছে। এখন সঙ্কটাবস্থা, যদি বাঁচাইতে চাও, মিথ্যা ভয়, মিথ্যা কূটনীতি ও আত্মরক্ষার চেষ্টা বর্জন করিয়া কেবলই মায়ের মুখের দিকে চাহিয়া আবার সম্মিলিত হইয়া কার্য্যে লাগ। যে মিলনের আশায় এতদিন অপেক্ষা করিয়াছিলাম, সে আশা ব্যর্থ। মধ্যপন্থীদল জাতীয়পক্ষের সহিত মিলিত হইতে চায় না, গ্রাস করিতে চায়। সেইরূপ মিলনের ফলে যদি দেশের

হিত হইত, আমরা বাধা দিতাম না। যাঁহারা সত্য-প্রিয়, মহান্ আদর্শের প্রেরণায় অনুপ্রাণিত, ভগবান ও ধর্ম্মকে একমাত্র সহায় বলিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ, তাঁহারা না হয় সরিয়া যাইতেন, যাঁহারা কূটনীতির আশ্রয় লইতে সম্মত, তাঁহারা মধ্যপন্থীদলের সহিত যোগদান করিয়া, মেহ্‌তার আধিপত্য, মর্‌লির আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া দেশের হিত করিতেন। কিন্তু সেইরূপ কূটনীতিতে ভারতের উদ্ধার হইবার নহে। ধর্ম্মের বলে, সাহসের বলে, সত্যের বলে ভারত উঠিবে। যাঁহারা জাতীয়তার মহান্ আদর্শের জন্য সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিতে প্রস্তুত, যাঁহারা জননীকে আবার জগতের শীর্ষস্থানীয়, শক্তিশালিনী, জ্ঞানদায়িনী, বিশ্বমঙ্গল-কারিণী ঐশ্বরিক শক্তি বলিয়া মানবজাতির সম্মুখে প্রকাশ করিতে উৎসুক, তাঁহারা মিলিত হউন, ধর্ম্মবলে, ত্যাগবলে বলীয়ান হইয়া মাতৃকার্য্য আরম্ভ করুন। মায়ের সন্তান! আদর্শ-ভ্রষ্ট হইয়াছ, আবার ধর্ম্মপথে এস। কিন্তু আর উদ্দাম উত্তেজনার বলে যেন কার্য্য না কর, সকলে মিলিয়া এক প্রতিজ্ঞা, এক পন্থা এক উপায় নির্দ্ধারণ করিয়া যাহা ধর্ম্মসঙ্গত, যাহাতে দেশের হিত অবশ্যম্ভাবী, তাহাই করিতে শিখ।" ("ধর্ম্ম", ১২ই পৌষ, ১৩১৬)

কিন্তু গবর্ণমেন্টের দমননীতির প্রকোপে দেশবাসীর আর জাগিবার উপায় রহিল না। গবর্ণমেন্ট এমন আইন প্রবর্ত্তিত করিলেন যাহাতে সকল প্রকার সভাসমিতি বন্ধ করা যাইত। ইহাই হইতেছে "শাসন-সংস্কারের নবযুগের প্রথম অবতারণা।" গবর্ণমেন্টের ধারণা হইয়াছিল যে, এই উপায়ে রাজনীতিক হত্যা ও অন্যান্য অপরাধ প্রশমিত হইবে। কিন্তু এই ব্যবস্থার ব্যর্থতা দেখাইয়া শ্রীঅরবিন্দ লিখিলেন, "যাহাতে এই রাজনীতিক হত্যা অবলম্বন করিবার প্রবৃত্তি দেশ হইতে উঠিয়া যায়, আমরাও সেই চেষ্টা করিতে চাই। কিন্তু তাহার একমাত্র উপায়, বৈধ উপায় দ্বারা ভারতের রাজনীতিক উন্নতি ও স্বাধীনতা সাধিত হইতে পারে, ইহাই কার্য্যেতে দেখান। কেবল মুখে এই শিক্ষা দিলে লোকে বিশ্বাস করিবে না, কার্য্যেতেও বুঝাইতে হইবে।

সেই পুণ্যকার্য্যে তোমরাই বাধা দিতে পার। কিন্তু তাহাতে যেমন আমাদের বিনাশ হইবে, তোমাদের বিনাশ হইবার সম্ভাবনা।"

রাজনীতিক আন্দোলন একেবারে মন্দীভূত হইয়া পড়িয়াছিল, তথাপি কেন এই রাজনীতিক অনাচার? "এতদিন কি সভাসমিতি বন্ধ ছিল না? চরমপন্থীদলের সভাসমিতি অনেক দিন লোপ পাইয়াছে, মধ্যপন্থী নেতাগণও নির্ব্বাসনের পরে আর সভাসমিতিতে যোগদান করা বন্ধ করিয়াছেন। মাঝে মাঝে কলেজ স্কোয়ারে যে স্বদেশী সভা হয়, তাহাতে কোন বিখ্যাত বক্তা উপস্থিত হন না, দর্শকমণ্ডলীও সংখ্যায় নগণ্য। শ্রীযুক্ত অরবিন্দ ঘোষ জেল হইতে আসিবার পরে কয়েকদিন বক্তৃতা করিয়াছিলেন বটে, তিনিও হুগ্‌লী প্রাদেশিক সভার পরে নীরব হইয়া পড়িয়াছেন।...সম্পূর্ণ নীরবতার মধ্যে হত্যা ও ডাকাইতির বৃদ্ধি দিন দিন হইতেছে। তাহাই স্বাভাবিক, ভিতরে বহ্নি থাকিলে অবাধ নির্গমনেই তাহা নিরাপদে ক্ষয় হয়, নির্গমনের পথ বন্ধ করায় তাহার তেজ বৃদ্ধি হয়, ফলে নির্গমনের পথ খুলিয়া প্রতিরোধককে বিনাশ করিতে বাহির হয়।"

এই অবস্থায় কি কর্ত্তব্য? শ্রীঅরবিন্দ লিখিলেন, "এখন বিবেচ্য এই, এই অবস্থায় জাতীয়পক্ষ কোন্ পথ অবলম্বন করিবে? আমরা আইনের ভিতর আমাদের রাজনীতিক কার্য্য আবদ্ধ রাখিতে চেষ্টিত আছি। আইনের গণ্ডী যদি এত সঙ্কীর্ণ হয় যে তাহার ভিতরে প্রকাশ্য আন্দোলন আর চলে না, তাহা হইলে আমাদের কি উপায় রহিয়াছে? এক উপায়, নীরবে এই সমস্ত ভ্রান্তনীতির ফল অপেক্ষা করা। আমরা জানি, গবর্ণমেন্টও জানে যে, ভারতবাসীর স্বাধীনতার আশা নির্ব্বাপিত হয় নাই, মস্তকে নিগ্রহদণ্ডের প্রহার করায় অসন্তোষ প্রেমে পরিণত হয় নাই। প্রজার স্পৃহা, প্রজার অসন্তোষ নিজের মধ্যে আবদ্ধ হইয়া গুমরিয়া রহিয়াছে। এখনও বিপ্লবকারীগণ লোকের মন গুপ্তহত্যা ও বল-প্রয়োগের পথে টানিতে পারে নাই, কিন্তু কবে টানিতে পারিবে তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই। একবার সেই অনর্থ ঘটিলে গবর্ণমেন্টের

বিপদ ও দেশের দুর্দ্দশার আর সীমা থাকিবে না। আমরা এই আশঙ্কায় এবং দেশের নবজীবন রক্ষার আশায় জাতীয়পক্ষকে সুশৃঙ্খল করিবার উদ্যোগ করিতেছিলাম। আমাদের ধারণা ছিল যে স্বাধীনতা লাভের নির্দ্দোষ পন্থা দেখাইতে পারিলে গুপ্ত হত্যা দেশ হইতে উঠিয়া যাইবে। এখন বুঝিলাম ইংরাজ গবর্ণমেন্ট সেই উপায় অবলম্বন করিতে দিবে না।"

এই মন্তব্য ৪ঠা মাঘের "ধর্ম্মে" প্রকাশিত হয়। ঐ সংখ্যায়ই "আমাদের আশা" শীর্ষক এক প্রবন্ধে শ্রীঅরবিন্দ লিখেন :"—দুই বৎসর নিপীড়ন, দুর্ব্বলতা ও পরাজয়ের ফলে ভারতবাসী নিজের মধ্যে শক্তির উৎস অন্বেষণ করিতে শিখিতেছে। বক্তৃতার উত্তেজনা নহে, ম্লেচ্ছদত্ত বিদ্যা নহে, সভাসমিতির ভাবসঞ্চারিণী শক্তি নহে, সংবাদ-পত্রের ক্ষণস্থায়ী প্রেরণা নহে, নিজের মধ্যে আত্মার বিশাল নীরবতায় ভগবান ও জীবের সংযোগে যে গভীর, অবিচলিত, অভ্রান্ত, শুদ্ধ, সুখ-দুঃখজয়ী, পাপপুণ্যবর্জ্জিত শক্তি সম্ভূত হয়, সেই মহাসৃষ্টিকারিণী, মহাপ্রলয়ঙ্করী, মহাস্থিতিশালিনী, জ্ঞানদায়িনী মহাসরস্বতী, ঐশ্বর্য্য-দায়িনী মহালক্ষ্মী, শক্তিদায়িনী মহাকালী, সেই তেজের সংযোজনে একীভূতা চণ্ডী প্রকট হইয়া ভারতের কল্যাণে ও জগতের কল্যাণে কৃতোদ্যম হইবেন। ভারতের স্বাধীনতা গৌণ উদ্দেশ্যমাত্র, মুখ্য উদ্দেশ্য ভারতের সভ্যতার শক্তি প্রদর্শন এবং জগৎময় সেই সভ্যতার বিস্তার ও অধিকার। আমরা যদি পাশ্চাত্য সভ্যতার বলে, সভা-সমিতির বলে, বক্তৃতার জোরে, বাহুবলে স্বাধীনতা ও স্বায়ত্তশাসন আদায় করিতে পারিতাম, সেই মুখ্য উদ্দেশ্য সাধিত হইত না। ভারতীয় সভ্যতার বলে, আধ্যাত্মিক শক্তিতে, আধ্যাত্মিক শক্তির সৃষ্ট সূক্ষ্ম ও স্থূল উপায়ে স্বাধীনতা অর্জন করিতে হইবে। সেইজন্য ভগবান আমাদের পাশ্চাত্য-ভাব-যুক্ত আন্দোলন ধ্বংস করিয়া বহির্ম্মুখী শক্তিকে অন্তর্ম্মুখী করিয়াছেন। ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় দিব্যচক্ষুতে যাহা দেখিয়া-ছিলেন, দেখিয়া বারবার বলিতেন, শক্তিকে অন্তর্ম্মুখী কর, কিন্তু সময়ের

দোষে তখন কেহ তাহা করিতে পারে নাই, স্বয়ং করিতে পারেন নাই। কিন্তু ভগবান আজ তাহা ঘটাইয়াছেন। ভারতের শক্তি অন্তর্ম্মুখী হইয়াছে। যখন আবার বহির্ম্মুখী হইবে, আর সেই স্রোত ফিরিবে না, কেহ রোধ করিতে পারিবে না। সেই ত্রিলোকপাবনী গঙ্গা ভারত প্লাবিত করিয়া, পৃথিবী প্লাবিত করিয়া অমৃত স্পর্শে জগতের নূতন যৌবন আনয়ন করিবে।"

ইহাই হইল শ্রীঅরবিন্দের রাজনৈতিক জীবন ত্যাগ করিয়া পূর্ণ-ভাবে যোগজীবন গ্রহণের ইঙ্গিত, তাঁহার পূর্ণ সাধনার উদ্দেশ্য। যে প্রেরণায় তিনি বরোদা হইতে আসিয়া ভারতের রাজনৈতিক আন্দোলনের ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই প্রেরণার উর্দ্ধ গতিতে তিনি পণ্ডিচারীতে সাধনামগ্ন হইলেন। সেই সাধনার ফলে তিনি মহেশ্বরী, মহাকালী, মহালক্ষ্মী ও মহাসরস্বতীর—জ্ঞান, শক্তি, শ্রী ও দিব্যপরিপূর্ণতার স্বরূপ উপলব্ধি—পৃথিবীতে পরাপ্রকৃতির বিকাশের ক্ষণের প্রতীক্ষায় আছেন এবং মানবকে পার্থিব সত্তার উর্দ্ধে দিব্যসত্তা উপলব্ধি করিবার ও তাহার সাহায্যে মানবজীবনকে পূর্ণভাবে রূপান্তরিত করিবার পথ প্রদর্শন করিতেছেন। কলিকাতায় থাকিতেই তিনি এই মহাসম্ভাবনার ইঙ্গিত পাইয়াছিলেন, কাজেই লৌকিক বুদ্ধিবশে পার্থিব কোন আদর্শকেই শ্রেয় মনে করেন নাই। দিব্য ইঙ্গিতেই তিনি পণ্ডিচারী প্রস্থান করিলেন।

একাদশ অধ্যায়

পণ্ডিচারী প্রস্থান

বাংলা ১৩১৬ সালের শেষ ভাগে (১৯১০ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসে) শ্রীঅরবিন্দ কলিকাতা ও চন্দননগরে অবস্থান করেন, এবং মাসখানেক পরে সমুদ্রপথে পণ্ডিচারী যাত্রা করেন। তখন কলিকাতায় তাঁহার সঙ্গী ছিলেন চারজন—শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত গুপ্ত, সুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, সৌরীন্দ্রনাথ বসু ও বিজয়কুমার নাগ। চন্দননগরে শ্রীঅরবিন্দ কয়েকদিন শ্রীযুক্ত মতিলাল রায়ের বাটিতে অবস্থান করেন। সেই সময় হইতে মতিবাবুর জীবনের যে গভীর পরিবর্ত্তন হইয়াছিল তাহা তিনি "জীবন-সঙ্গিনী" নামক পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। মতিবাবুর লেখায় শ্রীঅরবিন্দের যোগী মূর্ত্তিটি বেশ ফুটিয়া উঠিয়াছে।

বাংলার কর্ম্মক্ষেত্র ত্যাগ করিয়া কেন শ্রীঅরবিন্দ পণ্ডিচারীতে প্রস্থান করিলেন, পূর্ব্ব অধ্যায়ে তাহা বিশদভাবে আলোচনা করা হইয়াছে। তিনি বুঝিয়াছিলেন যে তাঁহার অবর্ত্তমানেও ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম অব্যাহতভাবে চলিতে থাকিবে এবং তাহা কালক্রমে সাফল্য লাভ করিবে। যে-বীজ তিনি বপন করিয়াছিলেন তাহার অমোঘ শক্তি তিনি ভাল করিয়াই উপলব্ধি করিয়াছিলেন এবং বুঝিয়াছিলেন উত্তরকালে তাহা বিরাট মহীরুহে পরিণত হইবে। কিন্তু ভারতের স্বাধীনতালাভই তাঁহার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল না, তিনি চাহিয়াছিলেন জাতির জীবনে ভাগবত শক্তির বিকাশ—মানব-জীবনের, মানব-স্বভাবের আমূল পরিবর্ত্তন—মানুষের সম্মুখে ভাগবত আদর্শ স্থাপন করা। তিনি শুধু ব্যক্তিগত-ভাবে ভাগবত উপলব্ধি, যোগসিদ্ধি চাহেন নাই ; পরে একখানি পত্রে লিখিয়াছিলেন যে, ব্যক্তিগত মুক্তিলাভের উদ্দেশ্য থাকিলে তিনি বহু পর্ব্বেই বাঁধা সড়ক ধরিয়া গন্তব্যস্থলে পৌঁছিতে পারিতেন।

এই অভিনব সাধনা করিবার প্রেরণা লাভ করিয়া শ্রীঅরবিন্দ স্বেচ্ছায় বাংলা ত্যাগ করিলেন, সংসার-বন্ধন ছিন্ন করিলেন। সংসার তিনি কোন দিনই করেন নাই—গার্হস্থ্য জীবনেও তিনি ছিলেন যোগী। বিবাহ করিলেও দীর্ঘকাল পত্নীর সহিত বসবাস করিবার সুযোগ তাঁহার ঘটে নাই। সংসারীর জীবন কোন দিনই তাঁহার আদর্শ ছিল না। তাঁহার পত্নীকে সেই অভিনব পথের পথিক হইতে তিনি কিরূপে আহ্বান করিয়াছিলেন তাহা মৃণালিনী দেবীকে লিখিত তিনখানি পত্রে ব্যক্ত হইয়াছে। আলিপুরের বোমার মামলায় পুলিশ এই তিনখানি পত্র দাখিল করে—উদ্দেশ্য ছিল ইহা প্রমাণ করা যে তিনি নিগূঢ়ভাবে বিপ্লববাদের আদর্শ-প্রণোদিত হইয়া কার্য্য করিয়াছেন—বিপ্লববাদ যেন তাঁহার মজ্জাগত! কিন্তু সশস্ত্র বিপ্লববাদ ছাড়াও তাঁহার যে মহান্ আদর্শ এই পত্রে তাহা ব্যক্ত হইয়াছে : "আমি জানি এই পতিত জাতিকে উদ্ধার করিবার বল আমার গায়ে আছে, শারীরিক বল নয়, তরবারি বা বন্দুক নিয়া আমি যুদ্ধ করিতে যাইতেছি না, জ্ঞানের বল। ক্ষত্রতেজ একমাত্র তেজ নহে, ব্রহ্মতেজও আছে, সেই তেজ জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত। এই ভাব নূতন নহে, আজকালকার নহে, এই ভাব নিয়া জন্মিয়াছিলাম, এই ভাব আমার মজ্জাগত, ভগবান এই মহাব্রত সাধন করিতে আমাকে পৃথিবীতে পাঠাইয়াছিলেন। চৌদ্দ বৎসর বয়সে বীজটা অঙ্কুরিত হইতে লাগিল, আঠার বৎসর বয়সে প্রতিষ্ঠা দৃঢ় ও অচল হইয়াছিল।"

শ্রীঅরবিন্দের জীবনের গতি কোন্‌দিকে তাহাও তাঁহার নিজের মধুর ভাষায় পত্নীর নিকট ব্যক্ত হইয়াছে। প্রথম চিঠিখানিতে তিনি লিখিয়াছিলেন : "তুমি বোধ হয় টের পেয়েছ যাহার ভাগ্যের সঙ্গে তোমার ভাগ্য জড়িত সে বড় বিচিত্র ধরণের লোক। এই দেশে আজ-কালকার লোকের যেমন মনের ভাব, জীবনের উদ্দেশ্য, কর্ম্মের ক্ষেত্র, আমার কিন্তু তেমন নয়। সব বিষয়েই ভিন্ন, অসাধারণ।...পাঁচ-জনের মতের আশ্রয় লইয়া তুমিও কি ওকে পাগল বলিয়া উড়াইয়া দিবে?

পাগল ত পাগ্‌লামীর পথে ছুটিবেই ছুটিবে, তুমি ওকে ধরিয়া রাখিতে পারিবে না, তোমার চেয়ে ওর স্বভাবই বলবান। তবে তুমি কি কোণে বসিয়া কাঁদিবে মাত্র, না তার সঙ্গেই ছুটিবে, পাগলের উপযুক্ত পাগ্‌লী হইবার চেষ্টা করিবে, যেমন অন্ধরাজার মহিষী চক্ষুদ্বয়ে বস্ত্র বাঁধিয়া নিজেই অন্ধ সাজিলেন ?

"আমার তিনটি পাগ্‌লামী আছে। প্রথম পাগ্‌লামী এই, আমার দৃঢ় বিশ্বাস ভগবান যে গুণ, যে প্রতিভা, যে উচ্চশিক্ষা ও বিদ্যা, যে ধন দিয়াছেন, সবই ভগবানের ; যাহা পরিবারের ভরণপোষণে লাগে আর যাহা নিতান্ত আবশ্যকীয়, তাহাই নিজের জন্য খরচ করিবার অধিকার, যাহা বাকি রহিল, ভগবানকে ফেরত দেওয়া উচিত। আমি যদি সবই নিজের জন্য, সুখের জন্য, বিলাসের জন্য খরচ করি, তাহা হইলে আমি চোর।...এই দুর্দ্দিনে, সমস্ত দেশ আমার দ্বারে আশ্রিত, আমার ত্রিশকোটি ভাইবোন এই দেশে আছে, তাহাদের মধ্যে অনেকে অনাহারে মরিতেছে, অধিকাংশই কষ্টে ও দুঃখে জর্জরিত হইয়া কোন মতে বাঁচিয়া থাকে, তাহাদের হিত করিতে হয়। কি বল, এই বিষয়ে আমার সহধর্ম্মিণী হইবে ?......"

যিনি বরোদায় থাকিতে যথেষ্ট উপার্জন করিয়াও কোনদিন এক পয়সা বিলাসে ব্যয় করেন নাই, যিনি সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া দেশের সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন, তিনি এত ত্যাগেও তৃপ্ত নহেন! তাঁহার সহধর্ম্মিণী তাঁহারই মতন অম্লান বদনে অভাব ও দুঃখ ভোগ করিতেন, তিনি কোনদিন তাঁহাদের ধনী আত্মীয়দিগকে অভাবের কথা জানিতে দেন নাই। পরে একেবারে রিক্ত অবস্থায় শ্রীঅরবিন্দ পণ্ডিচারী গমন করেন ; সেখানে প্রথমে কি অভাবের মধ্যে তাঁহাদের দিন কাটাইতে হইয়াছে তাহার কিছু পরিচয় মতিবাবু ও বারীন্দ্রকুমারের লেখায় পাওয়া যায়। আজ পণ্ডিচারী আশ্রমে শ্রী ও সমৃদ্ধি পরিস্ফুট—কিন্তু সে-সমৃদ্ধির মধ্যে আজও শ্রীঅরবিন্দ নির্লিপ্ত। কোনদিন তাঁহার কিছু চাহিদা ছিল না, আজও নাই।

পণ্ডিচারীতে দারুণ রিক্ততার ভিতরও তিনি সর্ব্বদাই তাঁহার সঙ্গী-দিগের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে লক্ষ্য রাখিতেন। তাঁহার হৃদয়ের অপরিসীম মহত্ত্ব ও ঔদার্য্যের পরিচয় আমরা "কারাকাহিনীতে" পাই-য়াছি। দেশপূজ্য নেতারূপে যখন তিনি কারাগারে তখন সঙ্গীদের সহিত একত্র বাসকালে কোনদিন কাহাকেও কোনরূপ ব্যবধান বুঝিতে দেন নাই বরং সকলের সহিত ঠাট্টা তামাসায় যোগদান করিয়া আনন্দ-বর্দ্ধন করিতেন।

তাঁহার জনৈক সঙ্গী কারাগারের এই কাহিনীটি লিখিয়াছেন: কানাইলাল দত্ত রাত্রে নানারূপ উপদ্রব করিয়া সঙ্গীদের নিদ্রার ব্যাঘাত জন্মাইতেন। একদা তিনি কাহারও এক টিন বিস্কুট গোপনে হস্তগত করিয়া তাহা উদরসাৎ করিতেছিলেন এবং মহা আনন্দে টিনটি বাজাই-তেছিলেন। এই উৎপাতে শ্রীঅরবিন্দের নিদ্রাভঙ্গ হইল। তাঁহাকে জাগ্রত দেখিয়া কানাইলাল তাড়াতাড়ি কয়েকখানি বিস্কুট তাঁহার হাতে গুঁজিয়া দিলেন—শ্রীঅরবিন্দও রহস্যভরে তাহা লইয়া তাড়াতাড়ি চাদরের মধ্যে লুকাইলেন!

অনেকে দুঃখ করেন, এমন লোক কেন সব ছাড়িয়া অত দূরে গেলেন? সত্যই তিনি অতি সাধারণভাবে সকলের সহিত মিশিয়াছিলেন, কিন্তু গতানুগতিক জীবনযাপন করা শুধু মানবীয় মহত্ত্ব দেখান ত তাঁহার জীবনের লক্ষ্য ছিল না? যে-প্রেরণা তাঁহাকে সুদূর পণ্ডিচারী লইয়া গিয়াছিল তাহার আভাস তিনি তাঁহার সহধর্ম্মিণীকে বহু পূর্ব্বেই দিয়া-ছিলেন। উপরোক্ত পত্রখানিতে তিনি লিখিয়াছিলেন: "দ্বিতীয় পাগ্‌লামিটা সম্প্রতি ঘাড়ে চেপেছে। পাগ্‌লামিটা এই, যে, কোন-মতে ভগবানের সাক্ষাদ্দর্শন করিতে হইবে। আজকালকার ধর্ম্ম ভগ-বানের নাম কথায় কথায় মুখে নেওয়া, সকলের সমক্ষে প্রার্থনা করা, লোককে দেখান আমি কি ধার্ম্মিক!—তাহা আমি চাই না। ঈশ্বর যদি থাকেন তাহা হইলে তাঁহার অস্তিত্ব অনুভব করিবার তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার কোন না কোন পথ থাকিবে। সেপথ যতই দুর্গম

হোক আমি সে পথে যাইবার দৃঢ় সঙ্কল্প করিয়া বসিয়াছি। হিন্দু-ধর্ম্ম বলে, নিজের শরীরের নিজের মনের মধ্যে সেই পথ আছে। যাইবার নিয়ম দেখাইয়া দিয়াছে, সেই সকল পালন করিতে আরম্ভ করিয়াছি। এক মাসের মধ্যে অনুভব করিতে পারিলাম, হিন্দুধর্ম্মের কথা মিথ্যা নয়, যে যে চিহ্নের কথা বলিয়াছে, সেই সব উপলব্ধি করিতেছি। এখন আমার ইচ্ছা তোমাকে সেই পথে নিয়ে যাই।...... ”

পূর্ণভাবে ঈশ্বরের অস্তিত্ব অনুভব করিবার পথ তিনি কারাগারে পাইলেন—ভগবান স্বয়ং তাঁহার সহায়ক হইলেন। কিন্তু শুধু ব্যক্তিগতভাবে ঈশ্বরোপলব্ধি করিয়া তিনি তৃপ্ত হইলেন না—তিনি জগতে ভাগবত-জীবনের অভিব্যক্তি করিবার সাধনায় এই সুদীর্ঘকাল মগ্ন রহিয়াছেন। স্বদেশ-প্রেমও তাঁহাকে লোকচক্ষে একান্ত গৌরবজনক রাজনৈতিক কর্ম্মক্ষেত্রে আবদ্ধ রাখিতে পারিল না। তাঁহার স্বদেশ-প্রেমকে লৌকিক বলা অন্যায়—তাহা ঐশ্বরিক প্রেমেরই রূপান্তর মাত্র। এ সম্বন্ধে তিনি তাঁহার সহধর্ম্মিণীকে লিখিয়াছিলেন: “তৃতীয় পাগ্‌লামি এই যে, অন্য লোকে স্বদেশকে একটা জড় পদার্থ, কতকগুলা মাঠ, ক্ষেত্র, বন, পর্ব্বত, নদী বলিয়া জানে; আমি স্বদেশকে মা বলিয়া জানি, ভক্তি করি, পূজা করি।......”

স্বদেশকে যে তিনি ভগবানের বিগ্রহরূপে দেখিতেন তাহা “ধর্ম্মে” ‘সাধনার পথ’ নামক প্রবন্ধেও প্রকাশ পাইয়াছে। তিনি লিখিতেছেন, “এমন যুগও আসে যখন মানুষ ভগবানকে না চাহিলেও ভগবান মানুষকে না চাহিয়া থাকিতে পারেন না। তখন তিনি তাঁহার পরম প্রেম-স্বরূপ প্রকট করিয়া আপনা হইতে সম্পূর্ণরূপে মানুষের নিকট আসিয়া ধরা দেন। আজ সেই শুভদিন আসিয়াছে,—হে ক্ষুদ্র, হে ক্লান্ত, হে বিমুখ, তুমি বোধ হয় ভগবানকে চাওনা, কিন্তু আজ তিনি যে তোমার দ্বারে ভিখারীরূপে দণ্ডায়মান—স্বদেশমূর্ত্তি ধরিয়া সেবামাত্র চাহিতেছেন।”

সত্যই কী অগ্নিগর্ভ মন্ত্র তিনি জাতিকে শুনাইয়াছিলেন যে, তাঁহার বাংলা ত্যাগের পর দুই যুগ ধরিয়া সহস্র সহস্র নরনারী আত্মত্যাগ

করিয়াছে, দুঃখকষ্ট, মৃত্যুকে পর্য্যন্ত বরণ করিয়াছে ; ভারত শত শত ত্যাগী নেতার আবির্ভাব দেখিয়াছে ; আব্রহ্মহিমাচল জাগ্রত হইয়াছে, ভারতের গণদেবতা জাগ্রত হইয়াছে।

কিন্তু তিনি নিজে উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে, স্বাধীনতালাভেই ভারতের চরম সার্থকতা হইবে না, ভারতের সত্তা বিকশিত হইবে আরও গভীরতর সাধনায়। তাই তিনি ভারতের নেতৃবর্গের আহ্বান বারংবার উপেক্ষা করিয়া সাধনা পূর্ণ করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। প্রাচীন ভারতের মানবসত্তার শ্রেষ্ঠতম বিকাশ হইয়াছিল—ভাবী ভারতে মানবসত্তার দিব্যবিকাশ সম্ভবপর হইবে, ইহাই হইল শ্রীঅরবিন্দের সাধনা।

যাঁহার নিকট শ্রীঅরবিন্দ সর্ব্বপ্রথমে এই মহান্ আদর্শ ব্যক্ত করিয়াছিলেন, তিনি ইহজীবনে দীর্ঘকাল শ্রীঅরবিন্দের সাথী হইতে পারেন নাই। শ্রীঅরবিন্দ বাংলা ত্যাগ করিবার নয় বৎসর পরে—১৩২৫ সালের ২রা পৌষ মৃণালিনী কলিকাতায় লোয়ার সার্কুলার রোডে পরলোকগত অধ্যক্ষ গিরিশ চন্দ্র বসুর বাটিতে দেহত্যাগ করেন। শ্রীঅরবিন্দ তাহার সাত বৎসর পূর্ব্বে পণ্ডিচারী চলিয়া গিয়াছেন।

দ্বাদশ অধ্যায়

শ্রীঅরবিন্দের রাজনীতি

পণ্ডিচারী প্রয়াণে শ্রীঅরবিন্দের জীবনে, আপাতদৃষ্টিতে, যেন একটা পটপরিবর্ত্তন ঘটিল। আন্তরদৃষ্টিতে অবশ্য কোন গভীর পরিবর্ত্তন ঘটে নাই, তাঁহার জীবনের মূল লক্ষ্য স্থির রহিয়াছে, যদিও অভিজ্ঞতার গভীরতা ও ব্যাপ্তির জন্য জীবন বহুমুখী হইয়াছে—যেন বহু ধারা সৃষ্টি করিয়াছে। এই কারণে তাঁহার মেধার বিকাশ দেখি ছাত্রজীবনে, কাব্যপ্রতিভা দেখি কৈশোরে, জ্ঞান-তপস্যা দেখি অধ্যাপক-জীবনে, নেতারূপে দেখি রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এবং গুরুরূপে দেখি অধ্যাত্ম-জীবনে। কিন্তু এই বিকাশের মধ্যে ছেদ আছে মনে করা ভুল। এখনও শ্রীঅরবিন্দ যোগাসনেও অধ্যাপনা করেন, শিষ্যদের শিক্ষা দেন; আবার তিনি রাজনীতিক নেতাও বটে, কারণ দেশের সন্ধিক্ষণে দেশকে কয়েকবার ঠিক পথ দেখাইয়াছেন (যদিও দেশ তাহার মর্ম্ম গ্রহণ না করিয়া একবার বিপথে গিয়াছে)। এমন কি তিনি জগৎ-নেতাও, কারণ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে তিনি জন-স্বাধীনতার পক্ষ গ্রহণ করিয়াছিলেন। অপরপক্ষে তিনি এখনও কবি, সাহিত্য-স্রষ্টা; তবে এক্ষণে হইয়াছেন যোগী-কবি, অধ্যাত্ম-সাহিত্যস্রষ্টা। আর মুখ্যত তিনি গুরু, শুধু শিষ্যমণ্ডলীর গুরু নহে—লোক-গুরু। সর্ব্ব-ক্ষেত্রেই তিনি নূতনের প্রবর্ত্তক, মর্ত্তে মন্দাকিনী অবতরণ করাইবার নব-ভগীরথ।

এখনও মর্ত্তে রাজনীতির যুগের অবসান হয় নাই, তাই শ্রীঅরবিন্দের রাজনীতির সবিশেষ আলোচনা দেশের পক্ষে প্রয়োজনীয়। এক হিসাবে রাজনীতিক বলিতে যাহা বুঝা যায় শ্রীঅরবিন্দ তাহা নহেন।

তাঁহার রাজনীতিতে দ'লো-বুদ্ধি নাই। অবশ্য জাতীয়দল গঠনে তিনি অগ্রণী ছিলেন, কিন্তু দলাদলি করা তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল না। তিনি উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে, কংগ্রেসই দেশকে স্বাধীন করিতে পারিবে, তাই তিনি কংগ্রেসকে পূর্ণ স্বাধীনতার আদর্শ গ্রহণ করাইবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছিলেন। যখন তিনি অনুভব করিলেন যে কালক্রমে কংগ্রেস এই আদর্শ গ্রহণ করিবে, তখন তিনি রাজনীতি ক্ষেত্রের পুরোভাগে রহিলেন না। নিরভিমান একান্ত সত্যনিষ্ঠ ব্যক্তিই এইরূপে যশোলিপ্সা ত্যাগ করিতে পারেন, সাধারণ—এমন কি অতি-বুদ্ধিমান ব্যক্তিরও পক্ষে এরূপ করা সম্ভব নহে।

শ্রীঅরবিন্দ ছিলেন যুব-সমাজের নেতা। তিনি বাংলার যুবককে দুঃসাহসী করিয়া তুলিয়াছিলেন ; তাঁহারই মহান্ আদর্শে তাহারা আত্ম-ত্যাগের ঐহিক ভোগত্যাগের ব্রত গ্রহণ করিয়াছিল। কিন্তু শুধু তিনি তাহাদের শুধু মানুষীভাবে বড় করেন নাই, তাহাদের মধ্যে দিয়া-ছিলেন উর্দ্ধের প্রেরণা। তাই আমরা স্বদেশীযুগে অতগুলি অসাধারণ চরিত্র-বিশিষ্ট তরুণের পরিচয় পাই। তাঁহাদের সংস্পর্শে যাঁহারা আসিয়া-ছেন তাঁহারাই অনুভব করিয়াছেন যে, ঐরূপ মহাপ্রাণ ব্যক্তি সচরাচর দেখা যায় না। অপরপক্ষে আত্মত্যাগ তাঁহাদের বেপরোয়া বা উচছৃঙ্খল করে নাই—যে উচছৃঙ্খলতা পরবর্তী যুগে সমাজ-জীবনকে বিপর্য্যস্ত করিয়া তুলিয়াছে। এই সকল যুবক যেমন একদিকে শ্রীঅরবিন্দের জাতীয়দলের সমর্থক ছিল, অপরদিকে তাহারাই ইংরাজের সহিত সশস্ত্র সংগ্রামের ন্যায় একান্ত দুঃসাহসিক অভিযানের জন্য প্রস্তুত হইতেছিল। তাহারা শুধু নৈতিক সাহসের বশে এইরূপ কার্য্য করিতে উদ্যত হয় নাই, তাহারা পাইয়াছিল এক অভিনব দৈবী প্রেরণা। এই প্রেরণার উৎস ছিলেন শ্রীঅরবিন্দ।

মানিকতলার বাগানের বোমার কারখানা আবিষ্কৃত হওয়ায় এই সশস্ত্র বিপ্লবের আয়োজন সাময়িকভাবে ব্যর্থ হইল বটে, কিন্তু ইহার ব্যাপকতর আয়োজন হইয়াছিল ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে—প্রথম মহাযুদ্ধের

দ্বাদশ অধ্যায়

শ্রীঅরবিন্দের রাজনীতি

পণ্ডিচারী প্রয়াণে শ্রীঅরবিন্দের জীবনে, আপাতদৃষ্টিতে, যেন একটা পটপরিবর্ত্তন ঘটিল। আন্তরদৃষ্টিতে অবশ্য কোন গভীর পরিবর্ত্তন ঘটে নাই, তাঁহার জীবনের মূল লক্ষ্য স্থির রহিয়াছে, যদিও অভিজ্ঞতার গভীরতা ও ব্যাপ্তির জন্য জীবন বহুমুখী হইয়াছে—যেন বহু ধারা সৃষ্টি করিয়াছে। এই কারণে তাঁহার লেখার বিকাশ দেখি ছাত্রজীবনে, কাব্যপ্রতিভা দেখি কৈশোরে, জ্ঞান-তপস্যা দেখি অধ্যাপক-জীবনে, নেতারূপে দেখি রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এবং গুরুরূপে দেখি অধ্যাত্ম-জীবনে। কিন্তু এই বিকাশের মধ্যে ছেদ আছে মনে করা ভুল। এখনও শ্রীঅরবিন্দ যোগাসনেও অধ্যাপনা করেন, শিষ্যদের শিক্ষা দেন ; আবার তিনি রাজনীতিক নেতাও বটে, কারণ দেশের সন্ধিক্ষণে দেশকে কয়েকবার ঠিক পথ দেখাইয়াছেন (যদিও দেশ তাহার মর্ম্ম গ্রহণ না করিয়া একবার বিপথে গিয়াছে)। এমন কি তিনি জগৎ-নেতাও, কারণ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে তিনি জন-স্বাধীনতার পক্ষ গ্রহণ করিয়াছিলেন। অপরপক্ষে তিনি এখনও কবি, সাহিত্য-স্রষ্টা ; তবে এক্ষণে হইয়াছেন যোগী-কবি, অধ্যাত্ম-সাহিত্যস্রষ্টা। আর মুখ্যত তিনি গুরু, শুধু শিষ্যমণ্ডলীর গুরু নহে—লোক-গুরু। সর্ব্ব-ক্ষেত্রেই তিনি নূতনের প্রবর্ত্তক, মর্ত্তে মন্দাকিনী অবতরণ করাইবার নব-ভগীরথ।

এখনও মর্ত্তে রাজনীতির যুগের অবসান হয় নাই, তাই শ্রীঅরবিন্দের রাজনীতির সবিশেষ আলোচনা দেশের পক্ষে প্রয়োজনীয়। এক হিসাবে রাজনীতিক বলিতে যাহা বুঝা যায় শ্রীঅরবিন্দ তাহা নহেন।

সময়ে। পাঞ্জাবী ও বাঙ্গালীদের সহযোগিতায় এই বিপ্লবের ব্যবস্থা হইয়াছিল। আমেরিকা হইতে প্রবাসী পাঞ্জাবীগণ জার্ম্মাণ জাহাজে সুন্দরবনে অস্ত্রশস্ত্র পাঠাইবেন ঠিক হইয়াছিল, কিন্তু ভাগ্যচক্রে অস্ত্র পৌঁছায় নাই। বীর যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (বাঘা যতীন) অস্ত্র লইবার জন্য উড়িষ্যার উপকূলে গমন করেন এবং ট্রেঞ্চ যুদ্ধে মুষ্টিমেয় সঙ্গীদের সহিত আত্মবলি দেন। বীর রাসবিহারী বসু সশস্ত্র বিপ্লবের উদ্দেশ্যেই, ভারতে বহু কীর্ত্তি করিবার পর, জাপানে চলিয়া যান। ভাগ্যের কি অপূর্ব্ব বিধান!—কার্য্যত এই বিরাট সশস্ত্র অভিযান করিলেন সুভাষচন্দ্র, আজাদ ফৌজ লইয়া। অবশ্য এই অভিযান ব্যর্থ হইল কয়েকটি গূঢ় কারণে, কিন্তু স্বীকার করিতে হইবে সিপাহী যুদ্ধের পর ভারতমুক্তির জন্য এত বিরাট সশস্ত্র প্রচেষ্টা আর হয় নাই। ভারতের প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দীব্যাপী স্বাধীনতা সংগ্রামে, সশস্ত্র বিপ্লব প্রচেষ্টার কার্য্যকারিতা দেখাইবার জন্য এতগুলি কথা বলা হইল।

অবশ্য গান্ধী-আন্দোলনের ফলে দেশের রাজনৈতিক-চক্র ঘুরিয়া গেল বটে, কিন্তু সশস্ত্র বিপ্লবের আকর্ষণ যুবক শ্রেণীর একাংশ ত্যাগ করিতে পারে নাই। বিপ্লব প্রচেষ্টায় খানিকটা সন্ত্রাসবাদ আসিয়াছিল বটে, কিন্তু তাহার জন্য দায়ী গবর্ণমেন্টের দমননীতি এবং ইংরাজের অদূরদর্শিতা। পণ্ডিচারী যাইবার পর শ্রীঅরবিন্দ সশস্ত্র বিপ্লবের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন নাই; ফলে তাঁহার আগমনে বাংলায় মহাকালী যে নৃত্য সুরু করিয়াছিলেন তাহা কালক্রমে সংবরণ করিলেন। শ্রীঅরবিন্দ বহুপূর্ব্বেই অনুভব করিয়াছিলেন যে ইংলণ্ডের, তথা জগতের, এমন অবস্থা হইবে যে ইংরাজ ভারতের স্বাধীনতা স্বীকার করিতে বাধ্য হইবে।*

---

* ১৯৪৯-এর ৬ই মে আলিপুরের জজ আদালতে শ্রীঅরবিন্দের প্রতিকৃতি উন্মোচন উপলক্ষ্যে, শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় খোলাখুলিভাবে একথা বলিয়াছেন। ১৯২০ খৃষ্টাব্দে আন্দামান হইতে ফিরিয়া উপেন্দ্রনাথ যখন পণ্ডিচারীতে শ্রীঅরবিন্দের সহিত সাক্ষাৎ করেন তখন শ্রীঅরবিন্দ এই কথাই বলিয়াছিলেন।

রাজনীতি-ক্ষেত্রে শ্রীঅরবিন্দ যে বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়াছিলেন তাহার তুলনা লোকমান্য তিলক ও দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের মধ্যে পাওয়া যায়। প্রয়োজন হইলে শ্রীঅরবিন্দ দারুণ রাজনৈতিক সংঘর্ষে অগ্রসর হইতে পশ্চাৎপদ হইতেন না, কিন্তু তাহাতে ক্ষণেকের জন্যও কোন প্রকার অবিমৃষ্যকারিতার পরিচয় পাওয়া যায় নাই। মেদিনীপুরে ও হুগ্‌লীতে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনের অধিবেশনে এবং সুরাটে কংগ্রেসের অধিবেশনে তাঁহার কুশলী রাজনৈতিক বুদ্ধির সম্যক পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি মধ্যপন্থীদলের নীতির তীব্র সমালোচনা করিতেন, কিন্তু কাহারও প্রতি কোনদিন এতটুকু ব্যক্তিগত আক্রমণ করেন নাই। বস্তুত শ্রীঅরবিন্দের প্রভাবেই সেইযুগে রাজনীতি ও সাংবাদিকতা এক উচচ পর্য্যায়ে উন্নীত হইয়াছিল।

কিন্তু বিচক্ষণতা অপেক্ষা তাঁহার অপূর্ব্ব রাজনৈতিক দূরদৃষ্টিই একান্ত অভিনব। ইহার সম্যক পরিচয় দিতে হইলে একখানি পৃথক পুস্তকের প্রয়োজন হয়। তাঁহার রাজনৈতিক পটভূমি শুধু ভারত নহে, সমগ্র জগৎ। সুতরাং তাঁহার মত, আদর্শ ও দূরদৃষ্টির পরিচয় পাইতে হইলে সাত বৎসরের "আর্য্য" পত্রিকার বিভিন্ন লেখাগুলি পাঠ করা প্রয়োজন। ভারত সম্পর্কে গভীর জ্ঞান লাভ করিতে হইলে আমরা দুইখানি পুস্তকের সহায়তা পাই*—যাহা "আর্য্যের" প্রবন্ধরাজি হইতে সঙ্কলিত। এ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আভাস দিবার চেষ্টা করা হইতেছে।

প্রথমতঃ, ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতালাভ লক্ষ্য হইলেও, শ্রীঅরবিন্দ অবস্থানুসারে বিভিন্ন পন্থায় কাজ করিবার পক্ষপাতী ছিলেন। যদি ভবিষ্যতে প্রয়োজন হয় এই লক্ষ্য রাখিয়া তিনি সশস্ত্র বিদ্রোহের জন্য দেশবাসীকে সুকৌশলে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু রাজনীতিক আন্দোলনে জনশক্তি প্রয়োগ করিবারও ব্যবস্থা দিয়াছিলেন। নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ এবং জাতির আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা এই দুইটি ছিল জন-আন্দোলনের মুখ্য নীতি। এই নীতি অনুসারে ঠিক হইয়াছিল যে,

* The Renaissance of India, The Indian Polity

জনসাধারণ সরকারের অন্যায় নীতির বিরুদ্ধে দৃঢ়ভাবে দণ্ডায়মান হইবে এবং নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ করিবে। দমন-নীতির প্রাবল্যে অবশ্য নিষ্ক্রিয়-প্রতিরোধ তখনকার দিনে সম্ভব হয় নাই, কিন্তু জাতির আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য সংগঠনমূলক কর্ম্মপদ্ধতি সুরু হইয়াছিল। ইহার মুখ্য বিষয় ছিল স্বদেশী। ভারত উত্তরকালে যে শিল্পসমৃদ্ধি লাভ করিয়াছে তাহার মূল প্রেরণা দিয়াছে বাংলার স্বদেশী আন্দোলন। জাতীয় শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান গঠন করা, আদালত বর্জন করিয়া সালিশী দ্বারা আপোষে বিবাদ মীমাংসা করা, গ্রামে গ্রামে সংগঠনমূলক কাজ করা প্রভৃতি রাজনৈতিক কর্ম্মপদ্ধতি স্বদেশীযুগে প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। প্রায় দশ-এগার বৎসর পরে গান্ধীজী-প্রবর্ত্তিত অসহযোগ আন্দোলনে এই কর্ম্ম-পদ্ধতি পুরাপুরি ও ব্যাপকতরভাবে সারা ভারতে গৃহীত হয়।

দ্বিতীয়তঃ, তখনকার দিনের জাতীয় আন্দোলনে শুধু সংগঠনমূলক কর্ম্মপদ্ধতির উপর জোর দেওয়া হয় নাই, ইংরাজ কর্ত্তৃক স্থাপিত প্রতিষ্ঠান-গুলিতে জাতীয় কর্ত্তৃত্ব স্থাপন করাও জাতীয়দলের উদ্দেশ্য ছিল। অবশ্য প্রথম শাসন সংস্কারের সূচনা হয় (মর্লি-মিন্টো শাসন সংস্কার) ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে। শ্রীঅরবিন্দ এই সংস্কার অকিঞ্চিৎ বলিয়া তীব্র সমালোচনা করেন বটে, কিন্তু তিনি কর্ম্মক্ষেত্র হইতে চলিয়া যাইবার পূর্ব্বে দেশ-বাসীর নিকট জাতি-সংগঠনের জন্য যে আবেদন করেন, তাহাতে এই শাসন-সংস্কার অনুযায়ী গঠিত কাউন্সিলগুলিতে জাতীয়দলের প্রভাব বিস্তার করা সম্বন্ধে ইঙ্গিত দেন। দেশের অবস্থা বিপর্য্যয়ে জাতীয় দল এই ইঙ্গিত অনুযায়ী কাজ করিতে পারেন নাই বটে, কিন্তু উত্তরকালে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন এই নীতি গ্রহণ করিয়াই কংগ্রেসীদের শাসন পরিষদে প্রবেশ করার পথ দেখান। অবশ্য দেশবন্ধুকে বহু সহযোগীর ও সহকর্ম্মীর বিরুদ্ধতা আয়ত্ত করিতে হইয়াছিল, কিন্তু তাঁহার নীতি যে জাতিকে বিশেষ মূল্যবান রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা দিয়াছিল এ বিষয়ে দ্বিমত নাই। লোকমান্য তিলকেরও এই নীতি ছিল। চরমপন্থীদলের নেতা হিসাবে তিনি মন্টেগু-চেমসফোর্ড

শাসন-সংস্কারের (১৯১৯) অসারত্বে অতৃপ্ত হইয়াছিলেন বটে, তথাপি তিনি কংগ্রেসকে ইহার সহায়ে যতদূর সম্ভব শাসনযন্ত্র আয়ত্ত করিবার পরামর্শ দিয়াছিলেন। লোকমান্য জীবিত থাকিলে জাতীয় সংগ্রাম ভিন্ন রূপ ধারণ করিত বোধ হয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, শ্রীঅরবিন্দ স্বয়ং রাজনীতি-ক্ষেত্রের পুরোভাগে না থাকিলেও, তিনি যে সব নীতি সমর্থন করিতেন কালক্রমে তাহার সার্থকতা প্রমাণিত হইয়াছে এবং এই বিভিন্ন নীতির সমবেত ফলেই জাতি স্বাধীনতা লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছে—যদিও স্বাধীনতায় খানিকটা হরিষে বিষাদ হইয়াছে, কারণ ভারত দ্বিখণ্ডিত হইয়াছে। ইহার কারণ এখানে আলোচ্য নহে।

শ্রীঅরবিন্দ উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে, ভারতীয় জাতির আধুনিক রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা বিশেষ নাই, অথচ তাহাকে পূর্ণ স্বাধীনতার জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে। এই জন্য তিনি নানা উপায়ে জাতিকে মহান্ অধিকার লাভ করিতে উদ্বুদ্ধ করিতেছিলেন। স্বাধীনতা লাভ করিতেই হইবে—রাজনৈতিক উপায়ে হউক, সশস্ত্র বিপ্লব দ্বারাই হউক, কিংবা অসহযোগ নীতি প্রয়োগদ্বারাই হউক, ইহাই ছিল তাঁহার একমাত্র লক্ষ্য। আপোষ দ্বারা যদি তাড়াতাড়ি কার্য্যসিদ্ধি করা যায় তাহাতেই বা আপত্তি কি ? এই কারণেই তিনি ১৯৪২ খৃষ্টাব্দে এক সন্ধিক্ষণে ক্রীপস্ প্রস্তাবকে সমর্থন করিয়া দেশবাসীকে চমকিত করিলেন। কি আশ্চর্য্য, বত্রিশ বৎসর পরে শ্রীঅরবিন্দ রাজনীতি বিষয়ে মৌন ভঙ্গ করিলেন! এমন কি ভিতরে ভিতরে তিনি কংগ্রেসকে এই নবনীতি গ্রহণ করাইবার চেষ্টা করিলেন ; কিন্তু হায়! ভাগ্যের বিধানে তাঁহার চেষ্টা ফল-প্রসূ হইল না। দেশবাসী ও নেতৃবর্গ শ্রীঅরবিন্দের বাণীর মর্ম্মগ্রহণ করিতে পারিল না, তাঁহার গভীর উদ্দেশ্য উপলব্ধি করিতে পারিল না। তখন ইংরাজের সহিত আপোষ হইলে—(১) বাংলার দুর্ভিক্ষে পনের ষোল লক্ষ লোক মারা পড়িত না। (২) ভারতের সামরিক শক্তি অতি-মাত্রায় বৃদ্ধি পাইত এবং কংগ্রেসের হাতে তখনই সামরিক শক্তি আসিত।

(৩) ১৯৪২ খৃষ্টাব্দের আন্দোলন ও অহেতুক ধ্বংসের প্রয়োজন হইত না। (৪) পাকিস্থান অস্তিত্ব লাভ করিতে পারিত না।

কিন্তু দেশের ভ্রান্তনীতি সত্বেও স্বাধীনতা লাভ ঠেকাইবে কে? শ্রীঅরবিন্দ ১৯২০ খৃষ্টাব্দেই যাহা বলিয়াছিলেন তাহা ঘটিল। ১৯৪৫ খৃষ্টাব্দের নির্ব্বাচনে বিলাতের শ্রমিকদল গবর্ণমেণ্ট গঠন করিল, পর বৎসরই মন্ত্রীমণ্ডলীর দূতত্রয় স্বাধীনতার প্রস্তাব লইয়া ভারতে আসিলেন। শ্রীঅরবিন্দ কৈশোর হইতেই ইংরাজ-চরিত্র ভালো করিয়া জানিতেন। তিনি ইংরাজের অনেক কাজের নিন্দা ও তীব্র সমালোচনা করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তিনি বুঝিয়াছিলেন, ইংরাজ দমন-নীতির ব্যর্থতা একদিন বুঝিবে এবং ভারতের অসন্তোষে উত্যক্ত হইয়া এবং জগতের নব-গতি বুঝিয়া ভারতের স্বাধীনতা স্বীকার করিবে। কার্য্যকালে তাহাই ঘটিল, কিন্তু জাতির মুখ্যজনের অব্যবস্থচিত্ততা, আদর্শে অবিশ্বাস, ভারতধর্ম্মে অনাস্থা, শৌর্য্য বীর্য্যের অনাদরের জন্য পাপের সহিত আপোষ করিবার ঝোঁকের জন্য হরিষে বিষাদ ঘটিল—মহা সর্ব্বনাশ হইল, যাহা ভারতে কেহ কোনদিন কল্পনাও করে নাই তাহাই হইল—ভারত দ্বিখণ্ডিত হইল—জননীর অঙ্গচ্ছেদ হইল! আর শ্রীঅরবিন্দ যে ভীষণতার, রক্তস্রোতের ইঙ্গিত বহুকাল পূর্ব্বে পাইয়াছিলেন তাহার বাস্তব বিভীষিকা দেখিয়া জগৎ স্তম্ভিত হইল। কোন এক দানব ক্ষণিকের মধ্যে সহস্র সহস্র বৎসরের ভারত-ধর্ম্ম মন্থন করিয়া চলিয়া গেল!

শ্রীঅরবিন্দের দেশাত্মবোধ অপূর্ব্ব, তাঁহার দেশপ্রেম শুধু দেশহিতৈষণা-প্রসূত নহে, দেশের মধ্যে তিনি ভগবৎসত্তা উপলব্ধি করিয়াছেন কিশোর বয়সেই। এ বিষয়ে তাঁহার পত্নীকে যে অপূর্ব্ব পত্র লিখিয়াছিলেন তাহার উল্লেখ পূর্ব্বেই করা হইয়াছে। ভারতকে তিনি জগন্মাতার মূর্ত্তিরূপে দেখিয়াছেন; জগন্মাতার শক্তিরাজির মধ্যে ভারত-শক্তি অন্যতম, ইহা তাঁহার যৌগিক উপলব্ধি। তাই তিনি স্বদেশী যুগে জাতীয় নেতৃত্ব করিবার সময়ে বলিয়াছিলেন যে, জাতীয় আন্দোলনের নেতা স্বয়ং ভগবান। এই গভীর দৃষ্টি ও নিগূঢ় উপলব্ধির জন্য ভারতের

সবকিছুই শ্রীঅরবিন্দের অতীব প্রিয়। তিনি ভারতের ঐতিহ্য, ভারত-প্রতিভা সম্বন্ধে যে বিচক্ষণ আলোচনা করিয়াছেন তাহা এরূপ মর্ম্মস্পর্শী যে, তাহা পাঠ করিয়া আমাদের স্বদেশ সম্বন্ধে আমরা যেন এক অলৌকিক দৃষ্টি পাই। অপরপক্ষে জাতির যাহা দুর্ব্বলতার কারণ হইয়াছে তাহাও নিরপেক্ষভাবে দেখাইতে তিনি কোনদিন পশ্চাৎপদ হ'ন নাই; তাঁহার দৃষ্টি ত দেশ ও কালের মধ্যে আবদ্ধ নয়।

জাতি বুঝিতে আমরা জনসাধারণই বুঝি; শ্রীঅরবিন্দ কিশোর বয়স হইতেই ভারতের জনসাধারণের সহিত একাত্ম হইয়াছেন। ভারতে আসিয়াই তিনি যে কংগ্রেসী নীতির সমালোচনা করেন তাহার কারণ যে, তখনকার দিনের কংগ্রেসের পুরোভাগে ছিলেন, অভিজাত সম্প্রদায়, ধনিক সম্প্রদায় এবং শিক্ষাগর্ব্বিত সম্প্রদায়। তখনকার দিনেই তিনি চাহিয়াছিলেন কংগ্রেসকে জন-প্রতিষ্ঠানে পরিণত করিতে। তিনি যতকাল রাজনীতি-ক্ষেত্রে ছিলেন তাহার মধ্যেই জন-জাগরণ সুরু হইয়াছিল, কিন্তু ইহাও সত্য যে নব-প্রাণ-স্পন্দন অনেকাংশে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যেই অনুভূত হইত। অপরপক্ষে ইহাও সুবিদিত যে স্বদেশী আন্দোলনে বাংলার জনগণ উদ্বুদ্ধ হইয়াছিল। বিপ্লবের প্রারম্ভে ইহার বেশী আর কি আশা করা যাইতে পারে? কালক্রমে বিপ্লবের বিস্তৃতির সঙ্গে জনজাগরণও ব্যাপকতর হইয়াছে। শ্রীঅরবিন্দ স্বয়ং যে সাধারণ লোকের সহিত কিরূপ একাত্ম তাহার পরিচয় পাইয়াছি জেলে তাঁহার সেই গোয়ালা সঙ্গীটির অপূর্ব্ব বিবরণে। তিনি তাঁহার দেশখ্যাত সহকর্ম্মীদের কাহারও, এমন কি তাঁহার অতিপ্রিয় কানাইলাল দত্তের বিষয় তিনি কিছু লিখেন নাই; তিনি লিখিয়াছেন সেই নাম-ধামহীন অশিক্ষিত গোয়ালার কথা! আর তাহার কি অপরূপ প্রশস্তিই করিয়াছেন! আজ যোগী শ্রীঅরবিন্দও সকলের সহিত একাত্ম—তিনি সত্যই বিশ্ববন্ধু। তিনি গুণগ্রাহী বটে, কিন্তু তাঁহার নিকট উচচ-নীচ শ্রেণী-অশ্রেণী নাই। শ্রীঅরবিন্দের ভগবান যোগৈশ্বর্য্যবান নিশ্চয়ই, কিন্তু তিনি বিশেষ জগতের, বিশেষ জাতির, বিশেষ ব্যক্তির ভগবান

নহেন। বিশ্বহৃদয় তাঁহার হৃদয়, বিশ্বপ্রাণ তাঁহার প্রাণ, বিশ্বরূপ তাঁহার রূপ। ব্যক্তিও তিনি, জাতিও তিনি, মহাজাতিও তিনি। এই উদার দৃষ্টি, এই বিরাট অনুভূতি কাব্যকাহিনী নহে, ইহা পরম সত্য।

শ্রীঅরবিন্দ জানেন যে, 'স্বর্গ নামিয়া আসিবে মর্ত্তে', কিন্তু মানবীয় অধৈর্য্য, অসহিষ্ণুতা তাঁহার নাই। মানুষের ব্যক্তিগত, সমষ্টিগত সমস্ত প্রগতি সেই মহান্ লক্ষ্যের দিকেই সঞ্চালিত হইতেছে। মানব ইতিহাসকে তাই শ্রীঅরবিন্দ ভিন্ন চোখে দেখেন। আমরা যে বিষয় বা ঘটনাবলী উড়াইয়া দিই বা নিরঙ্কুশ নিন্দা করিয়া উপেক্ষা করি, শ্রীঅরবিন্দ তাহা ভিন্ন চোখে গভীর দৃষ্টিতে দেখেন। একটা উদাহরণ দেওয়া যাক। শ্রীঅরবিন্দ ইংরাজের বহু সমালোচনা করিয়াছেন। ইংরাজ তাঁহার সহিত যে ব্যবহার করিয়াছে, যে পরম শত্রুতা করিয়াছে, অন্য যে-কোন লোকের পক্ষে তাহা ঘটিলে, তাঁহাকে আজীবন ইংরাজবিদ্বেষী করিয়া তুলিত। তিনি পণ্ডিচারী প্রয়াণ করিলেও যখন ইংরাজের গুপ্তচর তাঁহাকে ও তাঁহার সঙ্গীদিগকে ছায়ার মত অনুসরণ করিতেছে, তাঁহার বাসস্থানের সামনে থানা বসাইয়াছে, তখন তিনি "আর্য্যে" ইংরাজ-সাম্রাজ্য সম্বন্ধে এক অপূর্ব্ব ভবিষ্যদ্বাণী করিতেছেন। তখন Statute of Westminster—যে আইনে ইংরাজ-সাম্রাজ্যের রূপ বদলাইয়া সাম্রাজ্যভুক্ত দেশগুলি স্বাতন্ত্র্য লাভ করিল—ইংরাজের স্বপ্নেও ছিল না নিশ্চয়ই—কারণ সেটা ছিল ১৯১৭ খৃষ্টাব্দ। কিন্তু শ্রীঅরবিন্দ সেই সুদূর অতীতেই লিখিয়াছিলেন যে ইংরাজ সাম্রাজ্যের রূপ একেবারে বদলাইয়া যাইবে। আর তখনই তিনি ইংরাজকে উপদেশ দিয়াছিলেন ভারত ও আয়ার্ল্যাণ্ডের সহিত আপোষ করিতে। অধিকাংশ বিষয়ে ইংরাজের চৈতন্যোদয় বিলম্বে ঘটে, ভারতের ও আয়ার্ল্যাণ্ডের সম্বন্ধে তাহাই ঘটিল; কিন্তু এ কথা স্বীকার করিতে হইবে যে গণতান্ত্রিক ভারত জাতি-মণ্ডলীতে (Commonwealth) বিশেষ স্থান লাভ করায় (ইহাও সাম্রাজ্যের অচিন্তনীয় পরিবর্ত্তন) শ্রীঅরবিন্দের সেই সুদর অতীতের ইঙ্গিত সার্থক হইয়াছে। ইহার

ফল ভারত ও বৃটেনের পক্ষে মঙ্গলজনক—মানব-মিলনের সহায়ক। অন্য কোন সংকীর্ণ দৃষ্টি দিয়া দেখিলে আমরা ইহার স্বরূপ বুঝিতে পারিব না।

শুধু ভারত কেন, মানব-প্রগতি সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দ যে সকল ইঙ্গিত করিয়াছিলেন "আর্য্যের" প্রবন্ধরাজিতে, আজ তাহার ঘাতপ্রতিঘাত আমরা চক্ষের সম্মুখে দেখিতেছি। ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে "গীতার ভূমিকায়" তিনি সোস্যালিজম সম্বন্ধে ইঙ্গিত করেন। "আর্য্যে" The Ideal of Human-Unity নিবন্ধরাজিতে তিনি রাজনীতির রূপ এবং রাজনৈতিক মতবাদগুলির প্রগতি সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা করিয়া দেখান যে, কোন রাজনৈতিক মতবাদ বা মতবাদ অনুযায়ী গঠিত রাষ্ট্র ও সমাজ মানুষের জীবনকে চরম সার্থকতা দিতে পারে না। প্রথম মহাযুদ্ধের অবসানে "আর্য্যে" কয়েকটি প্রবন্ধে তিনি ইঙ্গিত দেন যে, যুদ্ধ অবলুপ্ত হওয়া বা মানব-মৈত্রী সত্যভাবে স্থাপিত হইবার ক্ষণ তখনও আসে নাই। বর্ত্তমানে জগতে যে বিশৃঙ্খলা ও মানব-চরিত্রের যে অধোগতি দেখা যাইতেছে তাহারও ইঙ্গিত তিনি বছর দুয়েক আগে দিয়াছেন, কিন্তু তিনি নৈরাশ্যের বাণী শুনান নাই—দিব্যজ্যোতি-বিকাশের অবশ্যম্ভাবিতার আশার বার্ত্তাই দিয়াছেন।

জগতের বিবর্ত্তন, ভারতের বিবর্ত্তন তিনি সাক্ষীরূপে, নিষ্ক্রিয়ভাবে দেখেন নাই বা সমালোচনা করেন নাই। তিনি জগতের সঙ্গে নিত্য-যুক্ত, তিনি মানব-প্রকৃতির রূপান্তর সম্বন্ধে নিঃসন্দিহান। তাই তিনি প্রয়োজনমত মানব-ইতিহাসের সন্ধিক্ষণে নিগূঢ় আধ্যাত্মিক শক্তির প্রয়োগ করিয়াছেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মহাসঙ্কটকালে একমাত্র তিনিই অকুণ্ঠকণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছিলেন ফ্যাসিবাদের চরম পরাজয় অনিবার্য্য। যুদ্ধের এক মহাসন্ধিক্ষণে তিনি প্রকাশ্যভাবে মিত্রশক্তি-বর্গের পক্ষ অবলম্বন করেন। এ কারণে তাঁহার দেশবাসী অনেকে কিঞ্চিৎ ক্ষুব্ধ হইয়াছিলেন, কারণ তখন ভারতে নবভাবে বৃটিশ-বিদ্বেষের প্লাবন চলিতেছে, এবং সাধারণ লোকের ধারণা ইংরাজের যে শত্রু,

ভারতের সে মিত্র। সে মিত্রের চরিত্র আর কটা লোকই বা তলাইয়া দেখে! যাহা হউক, ইংলণ্ড যখন একান্ত অসহায় তখনই তিনি ইংরাজ-জাতির অন্তরে এক অপূর্ব্ব প্রেরণার সঞ্চার করেন, যে নিগূঢ় রহস্যের কথা ইংরাজ উপলব্ধি করিতে পারে নাই, হয়ত কোনদিনও পারিবে না। ইহা আধ্যাত্মিক ইতিহাসে এক অপূর্ব্ব ঘটনা, আবার লৌকিক দৃষ্টিতে পূর্ব্ব শত্রুর মহদুপকার সাধন করিবার এক মহৎ নিদর্শন। অবশ্য তাঁহার আর শত্রু কে? ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে জেল হইতে বাহির হইয়াই তিনি লিখিয়াছিলেন, "শত্রু কাহাকে বলিব, শত্রু আমার আর নাই।"

ত্রয়োদশ অধ্যায়

পণ্ডিচারী যোগাশ্রমে

১৯১০ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা এপ্রিল সন্ধ্যার প্রাক্কালে শ্রীঅরবিন্দ "দুপ্লে" নামক ফরাসী জাহাজ হইতে পণ্ডিচারীর জেটিতে পদার্পণ করিলেন। তিনি আত্মগোপন করিয়াছিলেন বলিয়া কলিকাতা হইতে রেলপথে না আসিয়া জাহাজে আসিলেন। তাঁহার সঙ্গে ছিলেন ৺বিজয় কুমার নাগ। শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় পূর্ব্বেই পণ্ডিচারী আসিয়া শ্রীঅরবিন্দের জন্য বাসা ঠিক করিয়াছিলেন। কয়েকমাস পরে আসেন শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত গুপ্ত মহাশয়। পরে ক্রমে ক্রমে আসিলেন কতিপয় ভিন্ন জাতীয় যুবক; তাঁহারা সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া শ্রীঅরবিন্দের আশ্রয় লইলেন কি এক অপূর্ব্ব টানে।

তাঁহাদের লইয়াই যেন শ্রীঅরবিন্দ এক নূতন জগৎ রচনা করিতে লাগিলেন। তিনি তাঁহাদের শিষ্যদের ন্যায় পড়াইতেন, তাঁহাদের সহিত অবসর সময়ে আলাপ-আলোচনা হাস্য-পরিহাস করিতেন, আর স্বয়ং অধ্যয়ন ও সাধনায় নিমগ্ন থাকিতেন। পূর্ব্বজীবনের সহিত যে যোগসূত্র বিচ্ছিন্ন হইল তাহা বলা ভুল, কিন্তু রাজনীতিতে তিনি আর লিপ্ত রহিলেন না। তিনি এক নূতন জীবনের—দিব্যজীবনের—ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করিলেন। পণ্ডিচারীর নির্জনতা ও নিস্তব্ধতা ইহার অনুকূল ক্ষেত্র বলিয়াই তিনি অন্তর্য্যামীর নিকট হইতে এখানে আসিবার নির্দ্দেশ পাইয়াছিলেন। তখনকার দিনের পণ্ডিচারীতে যেন এক অপার্থিব আবেশ ছিল। কবি সুরেশচন্দ্রের ভাষায়

"দূর—দূর—বহুদূর
উন্মাদ এ পৃথিবীর মত্ত জন-কলরোল হ'তে
দূর—দূর—যেন বহুদূরে তার স্থিতি—
... ...
নাহি ওঠে কলরোল হেথা
সঞ্চারিয়া বিষ যত আকাশে বাতাসে
হৃদয়ের বহ্নি-দাহে দহি,
মানুষের লোভ মোহ মদ
অন্তরের তার যত অদম্য ও অজস্র লালসা
কোন্ মন্ত্রবলে যেন হেথা সব পড়েছে ঘুমায়ে।"

পণ্ডিচারীর নির্জনতায় শ্রীঅরবিন্দের নীরব সাধনা সুরু হইল। কর্ম্ম-ক্ষেত্রের পূর্ণ কোলাহল হইতে পূর্ণ নিস্তব্ধতা! কিন্তু ইহা সেই বরোদার জ্ঞান-তপস্যার নিস্তব্ধতা নহে—জীবনকল্লোলের বহু উর্দ্ধে, পৃথিবীর দ্বন্দ্ব সংঘর্ষের ঘূর্ণির বাহিরে শান্ত সনাতন বিশ্বাত্মিকা সত্তার সহিত নিবিড় পরিচয়,—যেন নির্ঝরিণী ধরার লীলাবৈচিত্র্য উপভোগ করিয়া, ধরাকে সরস করিয়া মহার্ণবের অসীমতায় আত্মহারা হইল! পণ্ডিচারীর সাগরতীরেই শ্রীঅরবিন্দের যোগাশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইল।

সহায়সম্পদহীনতা, দারুণ অর্থকৃচ্ছ্রতা, রাজরোষের ক্ষুব্ধ আস্ফালন, কিছুই শ্রীঅরবিন্দকে বিচলিত করিতে পারিল না। দক্ষিণ ভারতের জাতীয়দলের কয়েকজন নেতা তখন পণ্ডিচারীতে স্বেচ্ছানির্ব্বাসনে ছিলেন; তাঁহারা শ্রীঅরবিন্দকে পাইয়া হৃষ্ট হইলেন এবং মনে করিলেন যে, ওখান হইতেই তিনি রাজনৈতিক আন্দোলনে প্রাণসঞ্চার করিবেন—হয়ত বৃহত্তর বিপ্লবের আয়োজন করিবেন (দেশবাসীরও অনেকদিন যাবৎ এই ধারণাই ছিল)। কিন্তু শ্রীঅরবিন্দ পাইয়াছেন এক মহত্তর আহ্বান। রাজনৈতিক কর্ম্ম, এমন কি দেশের মুক্তিসাধনা অপেক্ষাও তাহা মহৎ—তাহা সনাতন ভারতের আহ্বান—ঈশ্বরের আহ্বান। সুতরাং তিনি নেতাদের আহ্বানে সাড়া দিতে পারিলেন না।

অচিরেই জাতীয় প্রতিষ্ঠান কংগ্রেস হইতে বারবার আহ্বান আসিতে লাগিল। বহু নেতা পণ্ডিচারী গিয়া তাঁহাকে রাজনীতিক্ষেত্রে ফিরাইয়া আনিবার চেষ্টা করিলেন, কংগ্রেস তাঁহাকে সভাপতি নির্ব্বাচিত করিয়া শ্রেষ্ঠ সম্মান দান করিল, কিন্তু কিছুই তাঁহাকে মহৎ সঙ্কল্পচ্যুত করিতে পারিল না। কালক্রমে তাঁহার রাজনীতিক জীবনের সঙ্গীদিগের কারাজীবন শেষ হইল; তাঁহারা আকুল আগ্রহে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলেন, কিন্তু বুঝিলেন যে পূর্ব্বজীবনের পুনরাবর্ত্তন সম্ভব নহে। যাঁহারা তাঁহার মহান্ আদর্শের মর্ম্ম উপলব্ধি করিলেন তাঁহারা সেখানেই রহিয়া গেলেন, অপর সকলে ফিরিয়া আসিলেন।*

কিন্তু তাঁহার সম্বন্ধে গবর্ণমেন্টের উৎকণ্ঠা রহিয়া গেল—বুঝি বা তিনি কি অঘটন ঘটান, কোন্ মন্ত্রবলে আবার বিপ্লববাদের নব অধ্যায় সুরু করেন! কাজেই তাঁহার আশ্রমের চারিদিকে দিবারাত্র পুলিশের গুপ্তচরদিগের সজাগ দৃষ্টি রহিল—কখন তিনি কি করিয়া বসেন, যেন তিনি লেনিন বা ডি-ভ্যালেরার মত আচম্বিতে কি একটা রাজনীতিক কাণ্ডকারখানা করিবেন! অন্তর্জগতে, মানবহৃদয়কন্দরে তিনি কিসের বিপ্লব সাধন-ব্রতে ব্রতী তাহার হদিস গুপ্তচরেরা পাইবে কি করিয়া? গবর্ণমেণ্ট তাঁহার উপর প্রখর দৃষ্টি রাখিয়া ক্ষান্ত হইল না, প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিল যে তিনি রাজনৈতিক কারণেই ফরাসী রাজ্য পণ্ডিচারীতে আশ্রয় লইয়াছেন। তিনি বাংলা ত্যাগ করিবার পরই ইংরাজী "কর্ম্মযোগিন্"-এ লিখিত এক প্রবন্ধের জন্য তাঁহার বিরুদ্ধে রাজদ্রোহের মামলা রুজু হইল; তাঁহার অবর্ত্তমানে মুদ্রাকর মনোমোহন

* যাঁহারা শ্রীঅরবিন্দকে রাজনীতি-ক্ষেত্রে ফিরাইয়া আনিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের নাম অগ্রগণ্য। ১৯২২ খৃষ্টাব্দের গয়া কংগ্রেসের পূর্ব্বে দেশবন্ধু স্বয়ং পণ্ডিচারী যান এবং শ্রীঅরবিন্দকে পুনর্ব্বার রাজনীতিতে যোগদান করিতে বলেন। শ্রীঅরবিন্দ তাঁহাকে যে উত্তর দেন তাহা দিলীপকুমারের "অনামী" পুস্তকে আছে। তাহাতে শ্রীঅরবিন্দ তাঁহার আদর্শ-অনুসন্ধিৎসা ব্যক্ত করেন।

ঘোষ ছয় মাস কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইলেন। কিন্তু মুদ্রাকরের আপীলে আইন-অনুযায়ী বিচারে হাইকোর্ট রায় দিলেন যে প্রবন্ধটি রাজদ্রোহ-মূলক নহে। মুদ্রাকর মুক্তিলাভ করিলেন। এ সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দ "মাদ্রাজ মেল" কাগজে এক পত্রে প্রমাণ করিলেন যে, তিনি বাংলায় থাকিতে গবর্ণমেন্টের এরূপ মামলা করিবার মতলব ছিল না, তিনি পণ্ডিচারী চলিয়া আসিলেন বলিয়াই এই বিচার-প্রহসন হইল!

পণ্ডিচারীতে প্রথম অবস্থায় শ্রীঅরবিন্দ ও তাঁহার সঙ্গীদিগকে অনেকদিন আর্থিক অভাবের মধ্যে কাটাইতে হইয়াছে, কিন্তু এই কষ্ট-সাধ্য জীবন তিনি স্বেচ্ছায় বরণ করেন নাই, অবস্থা-বিপর্য্যয়ে এইরূপ ঘটিয়াছিল। তিনি বহির্জীবনে অহৈতুক কৃচ্ছ্রসাধনে কোন দিনই বিশেষ জোর দেন নাই, তবে ঘটনাচক্রে যে অবস্থায় পড়িয়াছেন তাহাতেও ক্ষণিকের তরে কিছুমাত্র বিচলিত হন নাই। নতুবা কারাজীবনের অসীম ক্লেশেও শান্ত হৃদয়ে ছিলেন কি করিয়া? একদিকে যেমন যোগীদের ন্যায় তিনি শীতোষ্ণাদি প্রাকৃতিক বৈষম্যের উর্দ্ধে উঠিয়া-ছিলেন, অপরদিকে তিনি জীবনের সকল স্তরে, এমন কি দেহেও, সৌন্দর্য্য ও স্বাচ্ছন্দ্য বিকাশে বিমুখ ছিলেন না। সত্যং শিবং সুন্দরমের উপলব্ধি জীবনের সকল স্তরে না হইলে জীবনের ছন্দোময় বিকাশ হইবে কি করিয়া?

অচিরে পণ্ডিচারীতে বাহিরের দৈন্য দূর হইয়া শ্রী ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। আশ্রমের অর্থকৃচ্ছ্রতা দূর হইল—অবশ্য তখনও আশ্রম রীতিমতভাবে গড়িয়া উঠে নাই। বোধ হয় প্রথমে শ্রীঅরবিন্দের আশ্রম গড়িবার উদ্দেশ্য ছিল না—ভাগবত প্রেরণায়ই আশ্রম গড়িয়া উঠিতে লাগিল। আপনা হইতে অনেক লোক আশ্রমে আশ্রয় লইতে লাগিলেন। (শ্রীঅরবিন্দ কখনও কাহাকেও আহ্বান করেন নাই, প্রত্যেকেই স্বেচ্ছায় গিয়াছেন)। তখনও শ্রীঅরবিন্দ তাঁহার সঙ্গীদের অন্তরঙ্গ সখা, শিক্ষক ও গুরু ছিলেন, সকলের সহিত মেলামেশা করিয়া তাঁহাদের জীবন মধময় করিতেন। আর তাঁহাদের জ্ঞানসাধনায় সহায়তা করিতেন।

বাহির হইতে পূর্ব্বসঙ্গীরা মাঝে মাঝে পণ্ডিচারী যাতায়াত করিতেন এবং শ্রীঅরবিন্দের প্রেরণা লাভ করিয়া তৃপ্ত হইতেন।

এই সময়ে শ্রীঅরবিন্দ সাধারণের মধ্যে তাঁহার অপূর্ব্ব জ্ঞানভাণ্ডার খুলিয়া দিলেন। "আর্য্য" প্রকাশিত হইল ১৯১৪ খৃষ্টাব্দের ১৫ই আগষ্ট—শ্রীঅরবিন্দের ৪২তম জন্মদিনে। জগতের তখন এক সন্ধিক্ষণ। ইউরোপে মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে। ভারতে কুরুক্ষেত্রের প্রারম্ভে যেমন শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার পরম সখা অর্জুনকে শিক্ষা দিবার উপলক্ষ্যে মানবজাতির জন্য অপূর্ব্ব জ্ঞানালোক বিকীর্ণ করিয়াছিলেন, যাহা সহস্রাধিক বৎসর ভারতের জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে, তেমনি শ্রীঅরবিন্দ জগতের মহাকুরুক্ষেত্রের প্রারম্ভে মানবজাতির ভাবী বিবর্ত্তন সম্বন্ধে অব্যর্থ ইঙ্গিত করিলেন। তিনি অকুণ্ঠকণ্ঠে ঘোষণা করিলেন যে, মানবজাতিকে হয় দিব্যজীবনের আদর্শ গ্রহণ করিতে হইবে, নতুবা তাহার পাশবিকতায় পুনরাবর্ত্তন অনিবার্য্য। তিনি দুই চারি কথায় একটা বিশেষ বাণী দিলেন না, আধুনিক মানবমনের উপযোগী ভাষায় প্রবন্ধের পর প্রবন্ধ লিখিয়া, ধর্ম্ম, দর্শন, রাজনীতি, সমাজনীতি, কাব্য ও সাহিত্যের সমৃদ্ধি করিলেন এবং মানব-ইতিহাসের ধারা আলোচনা করিয়া দিব্য আদর্শের ভিত্তি স্থাপনা করিলেন। কি বিচিত্র সে প্রবন্ধগুলি! শুধু বিপুল জ্ঞান নহে, গভীর অন্তর্দৃষ্টির পরিচায়ক—মানব-মনের, মানব-জীবনের, মানব-সমাজের, মানব-জাতির নিগূঢ় বিশ্লেষণ। সাধারণ লোক এই লেখাগুলির উপযুক্ত মূল্য নিরূপণ করিতে সমর্থ হয় নাই; কিন্তু একদিন দেশবিদেশে যে ইহা পরম সমাদর লাভ করিবে, সকল দেশের সুধীবৃন্দ আকুল আগ্রহে ইহা পাঠ করিবেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। শ্রীঅরবিন্দ কোনদিন প্রচারে ব্যগ্র নহেন, তাই বহু বৎসরের মধ্যে এই লেখাগুলির মধ্যে শুধু গীতা সম্বন্ধে প্রবন্ধগুলি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছিল। অধুনা যতগুলি পুস্তক দেখা যায় তাহার অধিকাংশই গত দশ বৎসরের মধ্যে প্রকাশিত হইয়াছে। ইতিমধ্যে তাহার অনেকগুলির বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় অনুবাদও হইয়াছে।

পূর্ণ সাত বৎসর ধরিয়া মাসের পর মাস শ্রীঅরবিন্দ "আর্য্য" লিখিয়াছেন ; বলিতে গেলে একাই ইহার পাতাগুলি পূর্ণ করিয়াছেন। আর কত বিষয়েই না কত প্রবন্ধ!—বেদ-রহস্য, উপনিষদের ব্যাখ্যা, দিব্য-জীবনের আদর্শ, যোগ-সমন্বয়ের প্রণালী, ভারত-সংস্কৃতির পরিচয়, মানবের মহামিলনের আদর্শ, মানব-সমাজের বিবর্ত্তনের মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ—ইহা ছাড়া সাহিত্য ও দর্শন সম্বন্ধে কত হৃদয়গ্রাহী আলোচনা। "আর্য্য" শুধু আধ্যাত্মিক জ্ঞানের মহাগ্রন্থ নহে, যোগ-জীবনের রহস্য-জ্ঞাপক নহে, ধর্ম্মালোচনা নহে—ইহা মানব-ইতিহাস অনুধাবন করিবার পরম সহায়। সাধারণ রাজনৈতিক আলোচনা "আর্য্যে" স্থান পায় নাই, কিন্তু তাহাতে আন্তর্জাতিক সমস্যার যে অপূর্ব্ব বিশ্লেষণ আছে তাহার তুলনা নাই। ত্রিংশ-অধিক বৎসর পূর্ব্বের সেই ইঙ্গিতগুলি আজকালকার বাস্তব ঘটনা।

শ্রীঅরবিন্দের পণ্ডিচারী গমনের পর উল্লেখযোগ্য ঘটনা শ্রীমা মীরা ও মঁসিয়ে পল্ রিশারের পণ্ডিচারীতে আগমন। ইঁহারা পূর্ণ আধ্যাত্মিক জ্ঞানসম্পন্ন কোন ব্যক্তির অনুসন্ধানে প্রাচ্যে ভ্রমণ করিতেছিলেন, সেই উপলক্ষে পণ্ডিচারী আসিয়া তাঁহারা শ্রীঅরবিন্দকে দেখিয়া মুগ্ধ হন। পল্ রিশার নিজে পণ্ডিত ; শ্রীঅরবিন্দের উপর তাঁহার কি গভীর শ্রদ্ধা ছিল, তাহার পরিচয় পাওয়া যায় দিলীপকুমারের লেখায়। ফ্রান্সের নীস সহরে দিলীপকুমারের সহিত কথাপ্রসঙ্গে তিনি শ্রীঅরবিন্দকে বর্ত্তমান যুগের মহামানব বলিয়াছিলেন। (ঐ আলাপ-কাহিনীটি ১৩৩৬ সালের "ভারতবর্ষে" প্রকাশিত হইয়াছিল এবং পরে দিলীপকুমারের "এদেশে ওদেশে" পুস্তকে স্থান পাইয়াছে।)

শ্রীমা মীরার কথা বাহিরের অল্পলোকেই জানেন। তাঁহার ভাগবত-উপলব্ধির পরিচয় পাওয়া যায় ফরাসী ভাষায় লিখিত তাঁহার প্রার্থনাস্তবকে। এইগুলি তিনি ইউরোপে থাকিবার সময়ে লিখিয়াছিলেন ; ইহার ইংরাজী অনুবাদ হইয়াছে, কতকগুলি বাংলায়ও প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীমার সাধনা কি গভীর ও বিচিত্র তাহার পরিচয় তিনিই

Photo: Henri Cartier Bresson

দিতে পারেন, তবে বাল্যকাল হইতে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য নানাদেশে ভ্রমণ করিয়া তিনি বিচিত্র অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন বলিয়া জানা যায়। তাঁহার ব্যক্তিত্বের মাধুর্য্য ও মহিমা উপলব্ধি করিয়াছেন তাঁহারাই যাঁহারা তাঁহার সংস্পর্শে আসিবার সুযোগ পাইয়াছেন। তিনি কোনদিন তিলমাত্র আত্মপ্রচার করেন নাই, সাধারণ লোকের সহিত মিশেন নাই, কাজেই বাহিরের লোক তাঁহাকে জানিবে কি করিয়া ? তাঁহার আধ্যাত্মিক জ্ঞান ও গভীর পাণ্ডিত্যের পরিচায়ক লেখাগুলির আংশিক পরিচয় মাত্র পাওয়া যায়। শ্রীমা ফরাসীদুহিতা হইলেও কি সুন্দর ইংরাজী লিখেন তাহার পরিচয়ও বাহিরের লোক পান নাই। এমন কি "আর্য্যে' কোন্ লেখাগুলি তাঁহার তাহাও জানিবার উপায় নাই—তিনি এমনই আত্মগোপন করিয়াছেন! তিনি ভারতের সাধনায় সিদ্ধি লাভ করিয়া ভারত-শক্তির মূর্ত্তরূপ হইয়াছেন—তিনিই যেন ভারতমাতারই জীবন্ত বিগ্রহ!

শ্রীমা ও পল্ রিশার পণ্ডিচারী আসার পর "আর্য্য" সম্পাদনে শ্রীঅরবিন্দের সহিত সহযোগিতা করিতে লাগিলেন। "আর্য্য"র প্রথম কয়েক সংখ্যায় প্রচ্ছদপটে লেখা থাকিত: Editor—Aurobindo Ghose—Paul and Mira Richard। যুদ্ধের হিড়িকে শীঘ্রই তাঁহাদের ফ্রান্সে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হইল এবং বাধ্যতা-মূলক নিয়মানুসারে পল্ রিশার সৈন্যদলে যোগদান করিলেন। উঁহারা পণ্ডিচারী থাকিতে "আর্য্য"র একটি ফরাসী সংস্করণ বাহির হইত, উহারা চলিয়া যাইবার পর তাহা বন্ধ হইল। "আর্য্য"র সমস্ত ভার একা শ্রীঅরবিন্দের উপর পড়িল।

যুদ্ধ অবসানের দুই বৎসর পরে, ১৯২০ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে, তাঁহারা আবার পণ্ডিচারীতে আসিলেন এবং তখন হইতে শ্রীমা আশ্রমে রহিলেন। পল্ রিসারও কিছুদিন ছিলেন, পরে তিনি এদেশ ত্যাগ করিয়া চলিয়া যান। তিনি প্রাচ্যের সংস্কৃতি সম্বন্ধে ইংরাজীতে কয়েকখানি পুস্তক লিখিয়াছিলেন এবং এককালে এদেশে সেগুলি সমাদৃত হইয়াছিল।

শ্রীমার আগমনের পর হইতেই ধীরে ধীরে আশ্রম গড়িয়া উঠিতে লাগিল। দেশ দেশান্তর হইতে সাধক সাধিকাগণ আসিতে লাগিলেন। অতগুলি সাধনার্থীর ভরণপোষণের ব্যাপার ও দৈনন্দিন জীবন-নিয়ন্ত্রণ ত সহজ ব্যাপার নহে। একা শ্রীমা সমস্ত পরিচালনার ভার গ্রহণ করিলেন। শুধু বহির্জীবন নয়, সাধকদিগের অন্তর্জীবন নিয়ন্ত্রণ ও সাধনার সহায়তায় শ্রীমা ব্রতী হইলেন। পণ্ডিচারীর সাধনার সে এক বিচিত্র কাহিনী। শ্রীঅরবিন্দের গভীরতর সাধনার জন্য আশ্রমের বহির্জীবনের সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধ রহিল না—দর্শনপ্রার্থী ও সাধক-সাধিকাগণ বৎসরের মধ্যে মাত্র চারিদিন তাঁহার দর্শন লাভ করিয়া থাকেন। কিন্তু শ্রীমার প্রত্যক্ষ প্রেরণা পাওয়া যায়, তাঁহার অমল হাস্যে হৃদয় মুগ্ধ হয় সকাল সন্ধ্যায়, তাঁহার সহিত ধ্যানের গভীরতায় নিমগ্ন হওয়া যায়, নিস্তব্ধ নিশীথে দৃষ্টিপাত করিলে অন্তরে তাঁহার মূর্ত্তি জাগিয়া উঠে সুস্পষ্টরূপে।

আশ্রমের প্রসার ও পরিচালনার জন্য কি বিপুল অর্থের প্রয়োজন তাহা সহজেই বুঝা যায় (আজ আশ্রমে সাধক সাধিকা, বালক বালিকার সংখ্যা প্রায় ৭০০), অথচ শ্রীঅরবিন্দ বা আশ্রমের অপর কেহ কোনদিন কাহারও নিকট অর্থসাহায্য চাহেন নাই। আশ্চর্য্যের বিষয় আশ্রম গড়িয়া উঠিবার সহিত অযাচিতভাবে অর্থ আসিতে লাগিল। যেখানে এককালে ছিল দারুণ অর্থকৃচ্ছ্রতা সেখানে আসিল সচ্ছলতা। কেহ কেহ আশ্রমে আসিলেন স্বেচ্ছায় সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিয়া, অনেকে আসিলেন নিঃস্ব অবস্থায়। কিন্তু ভাগবত সাধনায় ধনবৈষম্যের স্থান নাই—বহির্জীবনের অর্থের যতটুকু প্রয়োজন নিরপেক্ষভাবে তাহা সাধিত হয়। যেখানে ভাগবত কার্য্য সুরু হইয়াছে, সেখানে যে এরূপভাবে ভাগবত শক্তির ঐশ্বর্য্য বিকশিত হইবে তাহাতে হয়ত বৈষয়িক লোক বিস্মিত হইতে পারে, কিন্তু ভাগবত মহিমার মর্ম্ম যাঁহারা উপলব্ধি করিয়াছেন তাঁহারা ইহার রহস্য উত্তমরূপে বুঝিবেন।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়

ভাগবত জীবনের আদর্শ

শ্রীঅরবিন্দের আশ্রম সম্বন্ধে ইংরাজী, বাংলা ও হিন্দীতে লিখিত একখানি পুস্তিকা আছে। তাহাতে শ্রীঅরবিন্দের শিক্ষা কি সে সম্বন্ধে লেখা আছে:

"শ্রীঅরবিন্দের শিক্ষা প্রাচীন ঋষিদের এই শিক্ষা হইতে আরম্ভ যে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের আপাতদৃষ্ট রূপের অন্তরালে আছে একটি সত্য বস্তু—এক সত্তা ও এক চেতনা, সকল জিনিষের অদ্বিতীয় ও শাশ্বত আত্মা। সকল সত্তা সেই অদ্বিতীয় আত্মা বা স্বরূপের মধ্যে একীভূত—কিন্তু মনে, প্রাণে, দেহে, তাহারা পৃথগ্‌ভূত, চেতনার এক বিচ্ছিন্নতার জন্য, তাহাদের সত্যস্বরূপ ও বস্তু সম্বন্ধে অজ্ঞানতার জন্য। আন্তঃকরণিক এক সাধনা-দ্বারা এই ভেদাত্মক চেতনার আবরণটি দূর করা যায়; সত্যকার স্বরূপকে, আমাদের ও সকলের ভিতরে রহিয়াছেন যে ভগবান তাঁহার সম্বন্ধে সজ্ঞান হওয়া যায়।"

কথাটা হয়ত অনেকের কাণে নূতন শুনাইবে না, কারণ আমরা অনেকেই সেই প্রাচীন উক্তির সহিত পরিচিত: 'সমস্তই ব্রহ্ম', 'এক তিনি বহুধা বিভক্ত হইয়াছেন।' কিন্তু উক্তি শুনা বা মনে ধারণা করা এক জিনিষ, আর তাহার সত্যতা হৃদয়ঙ্গম করা আর এক জিনিষ। যে কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তিকে যদি বলা যায় যে, 'সমস্তই ব্রহ্ম', তাহা হইলে তাঁহার কল্পনাচক্ষে পরিচিত বিশ্বের রূপ ফুটিয়া উঠিবে। কিন্তু বাস্তবপক্ষে আমরা বিশ্বের কতটুকু জানি? এমন কি বহুদর্শী, বহু-অভিজ্ঞ ব্যক্তি বিশ্বের কতটুকু সন্ধান রাখেন? জ্ঞান-সমুদ্রের এই অপরি-মেয়তা বুঝিয়াই নিউটনের ন্যায় বৈজ্ঞানিক বলিয়াছিলেন, 'আমি সমুদ্র-বেলায় উপলখণ্ড আহরণ করিতেছি মাত্র।' আশ্চর্য্যের বিষয়, আধুনিক

জড়বাদের গুরু ডারউইনের পর্য্যন্ত অবশেষে এই উপলব্ধি হইয়াছিল যে, শুধু জীবজন্তু, উদ্ভিদাদি ও তাহাদের কঙ্কালের তথ্য ঘাঁটাঘাঁটি করিয়া তিনি প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য উপভোগ করিবার প্রেরণা হারাইয়াছেন।

বাস্তবিক সাধারণ মানুষ, এমন কি অধিকাংশ বুদ্ধিজীবীর অবস্থা অনেকটা কূপমণ্ডূকের ন্যায়। আমাদের স্ব স্ব মনের কূপের উপর যতটুকু আকাশ তাহারই পরিচয় আমরা রাখি, বৃহদাকাশের খবর আমরা কতটুকু জানি? আমাদের মধ্যে যাঁহারা দার্শনিক তাঁহারা চিন্তা ও অভিজ্ঞতা দ্বারা বিশ্বরহস্য সম্বন্ধে একটা ধারণা করিতে পারেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ হয়ত আমাদের একটা যুক্তিযুক্ত ধারণা দিতে পারেন, কিন্তু সত্যোপলব্ধি ত শুধু ধারণায় হয় না। পর্ব্বত না দেখিয়া, তাহার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ পাঠ করিয়া যেমন তাহার বিষয়ে সত্য জ্ঞান জন্মে না, তেমনি বিশ্বের অন্তরাত্মার নিবিড় পরিচয় না পাইলে আমরা কিছুতেই বিশ্বরহস্য উপলব্ধি করিতে পারি না—বড় জোর Pantheist বা ব্যাপকভাবী দার্শনিকের মত একটা ধারণা করিতে পারি মাত্র।

বিশ্ব সম্বন্ধে এই অস্পষ্ট ধারণার জন্য আমাদের মনে হয়ত প্রায়ই এই প্রশ্ন জাগে—এই বিশ্বের স্বষ্টিকর্ত্তা কে? এ সকল আসিল কোথা হইতে? তুমি কে, কোথা হইতে আসিলে—কস্ত্বং কুত আয়াতঃ? আমরা অনেকেই বলি ভগবান বিশ্বের মধ্যে ওতপ্রোতভাবে বিজড়িত রহিয়াছেন, সমস্তই তাঁহারই বিকাশ—যেমন মাকড়সা নিজের দেহনিঃসৃত রস হইতে জাল বুনে, তেমনি ভগবান স্বষ্টি-জাল বুনিয়াছেন। আবার আমরা কেহ কেহ বলি, তিনি স্বষ্টিকার্য্য শেষ করিয়া (ছয় দিনে হউক, ছয় বৎসরে হউক বা যে কোন সংখ্যক দিনে বা বৎসরে হউক), অন্তরালে আত্মগোপন করিয়াছেন, এবং স্বষ্টির প্রারম্ভ হইতে এতাবৎকাল স্বষ্ট জীবগণ, বিশেষতঃ মানুষ, অন্ধভাবে জীবন-সমুদ্রে ভাসিয়া বেড়াইতেছে তাহা দেখিয়া মজা উপভোগ করিতেছেন—যেমন আমরা হাস্যরসাত্মক নাটক উপভোগ করি। আবার কেহ কেহ বলেন তিনি মঙ্গলময়, তিনিই আমাদের মাতা, পিতা ইত্যাদি, তিনি সকলই মঙ্গলের জন্য করিতেছেন।

এই প্রকারে মানুষ ভগবান সম্বন্ধে কতরূপ ধারণা করিয়াছে, তাঁহার সহিত কতরূপ সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছে, কতভাবে তাঁহাকে পূজা করিয়াছে। আবার কেহ কেহ তাঁহাকে নিরাকার, 'অবাঙ্মনসোগোচরম্' ধারণা করিয়া বলিয়াছে যে, তিনি প্রাকৃতিক জগতের, মানুষের হাসিকান্না ভোগ দুঃখের জগতের বাহিরে—মানুষ কোন এক গূঢ় উপায়ে তাঁহার পরিচয় পাইতে পারে।

এ সম্বন্ধে বহুকাল পূর্ব্বে শ্রীঅরবিন্দ "Who"?—"কে?" নামে একটি সুন্দর কবিতা লিখিয়াছিলেন, তাহা "কর্ম্মযোগিন্"-এ প্রকাশিত হইয়াছিল। উক্ত প্রশ্নটি ঐ কবিতায় তিনি অনুপমভাবে ব্যক্ত করিয়াছিলেন:

"এ সব লীলা তাঁহার, আড়াল ছায়া—
তাও সে তাঁহারি;
শুধু কোথায় বা তাঁর ধাম? কী নামে
জান্‌বে তাঁরে নর?
তিনি স্বয়ম্ভূ—না বিষ্ণু? তিনি
পুরুষ—বা নারী?
তিনি দেহী—না বিদেহী? যুগ্ম—
কিম্বা একেশ্বর?*

এই চিরন্তন প্রশ্নগুলির উত্তরও শ্রীঅরবিন্দ ঐ কবিতায়ই দিয়াছেন: "সকল মাধুরী—তাঁর আনন্দেরি স্মিত সম্ভাষণ"; "ধরার চরম কল্পলোকের তরে ঘোষেন তিনি রণ"; "নাহি সৌরজগৎ মাঝে মিলে অন্ত আদি তাঁর"; "ছিল অমা যেদিন অন্ধ—অতল গহ্বরে অমার, আসীন ছিলেন তিনি তাহার মাঝে একক মহাকায়"; আবার, "তিনি প্রভু মোদের অসীম চিরপ্রেমিক সুমহান্"; কিন্তু—

"প্রাণের এতই কাছে,—শুধু মোদের
নেই সে দিঠি হায়!

* দিলীপ কুমারের কাব্যানুবাদ—"অনামী" (৪৯—৫২)

মোদের মস্ত গরব—আড়ম্বরে
মুগ্ধ দুনয়ান
বাঁধি চিন্তা সসীম দিয়ে মোরা
মুক্ত আপনায়।"

চিন্তা দ্বারা বুদ্ধি দ্বারা আমরা ব্রহ্মের সর্ব্বব্যাপকত্ব বুঝিতে পারি, কিন্তু তাঁহাকে উপলব্ধি করিতে হয় হৃদয়ে। হৃদয়েই তাঁহাকে আমরা চিরপ্রেমিক বলিয়া বুঝিতে পারি, অথচ শুধু হৃদয়ে তাঁহাকে উপলব্ধি করিলে আমরা বৈষ্ণবসুলভ প্রেমমাধুর্য্য উপভোগ করিতে পারিব, কিন্তু জ্ঞানচক্ষু না মেলিলে তাঁহার বিশ্বরহস্য বুঝিব কি করিয়া, বিশ্বলীলায় যোগ দিব কি করিয়া? আবার আমরা ব্যক্তিগতভাবে হয়ত তাঁহার প্রেমে বিভোর রহিলাম, হয়ত জ্ঞানে তাঁহার সার্ব্বভৌমত্ব উপলব্ধি করিলাম, কিন্তু পূর্ণভাবে তাঁহার সহিত যুক্ত না হইলে, কিরূপে অকপট হৃদয়ে, স্বচ্ছন্দ মনে সৃষ্টিলীলায় তাঁহার সাথী হইব? আর কি বিচিত্র সৃষ্টিই না তাঁহার! কী ভীষণ মধুরের সমাবেশ! তাঁহার রহস্য কি দুর্জ্ঞেয়! যিনি সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্, পরম মঙ্গলময়, তিনি কি করিয়া অমঙ্গলের মধ্যে বিকাশ পাইলেন? যিনি আনন্দময়, তিনি সৃষ্টিতে কেন দুঃখকে বরণ করিলেন? যিনি পরম চেতনা, তিনি কেন এবং কি করিয়া অচেতনের মধ্যে আত্মগোপন করিলেন? ইহা কি মায়াবীর মায়া? মায়াবী কেন মায়া সৃষ্টি করিয়া নিজের সৃষ্ট জীবকে বিড়ম্বিত করিবেন? তাহাতে তাঁহার কি লাভ? অবশ্য যোগিগণ এমন চেতনা উপলব্ধি করিতে পারেন যাহাতে দুঃখও তাঁহাদের নিকট আনন্দময় বলিয়া বোধ হয়—যেমন জেলের ভিতরে লাল পিপড়ার কামড়ে শ্রীঅরবিন্দ যন্ত্রণা বোধ না করিয়া অপূর্ব্ব আনন্দ অনুভব করিয়াছিলেন। কিন্তু সাধারণ লোকের ত ঐরূপ উপলব্ধি হয় না।

জগতে এই দুরপনেয় দুঃখকষ্ট, ভেদদ্বন্দ্ব দেখিয়া শঙ্করাচার্য্য প্রমুখ বৈদান্তিকগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন 'ব্রহ্মই সত্য, জগৎ মিথ্যা'। বুদ্ধদেব উপদেশ দিয়াছিলেন 'তন্‌হা' (তৃষ্ণা) নিবারণ করিতে—আদর্শ

দিয়াছিলেন নির্ব্বাণের। সত্য, এই উপায়ে ব্যক্তিগত সমস্যার অনেকটা সমাধান হইতে পারে—কিন্তু বিরাট জগতের সমস্যা? আমার নিজের সমস্যার না হয় সমাধান হইল, আমি তুরীয় সমাধিতে মগ্ন হইলাম, আমি জগৎকে মিথ্যা জ্ঞান করিলাম, মায়ার বাঁধন কাটিলাম, নির্লিপ্ত হইলাম—আমার পরিত্রাণ হইল, আমি মুক্তি পাইলাম; কিন্তু জগৎ ত সেই হাসিকান্না, দ্বন্দ্বকোলাহলের মধ্য দিয়া চলিল। ইহা সম্ভবপর নহে যে কোটি কোটি লোক এইভাবে ভবসাগর পার হইবে।

আর সত্যই ভগবান সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বব্যাপী, প্রভু, বিভু, ষড়ৈশ্বর্য্যশালী—কিন্তু সত্য ভগবান কেন অহেতুক মিথ্যা জগৎ সৃষ্টি করিলেন? ইহার কি কোন উদ্দেশ্য আছে? আধুনিক মানুষ এই হেঁয়ালিতে বিভ্রান্ত হইয়া ধরিয়া লইয়াছে যে, এই সকল তথ্য লইয়া মাথা ঘামাইয়া লাভ কি? জগৎটা যেমন দেখিতেছ তেমনি উপভোগ কর—উপভোগের জন্য তাহাকে যতটুকু বুঝিবার দরকার ততটুকু বুঝিবার চেষ্টা কর। কেহ কেহ ধারণা করিলেন জগৎ যন্ত্রবৎ, কোন অজ্ঞেয় কারণে, অজ্ঞেয়-ভাবে ইহা সৃষ্ট হইয়াছে। অন্ধপ্রকৃতিই ইহার নিয়ন্তা। জড়ই মূল সত্তা—চেতনা জড়েরই অভিব্যক্তি। কেহ কেহ বলিলেন, ভগবান হয়ত আছেন, হয়ত নাই; কিন্তু তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধ নাই, প্রয়োজনই বা কি!—জীবনই আমাদের পরিচালিত করিবে।

জীবনের নিদর্শন কি?—আত্মপ্রতিষ্ঠা, প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম। বলং বলং বাহুবলম্। বীরভোগ্যা বসুন্ধরা। নিম্নস্তরের জীবগণ যেমন হানাহানি করিয়া জীবনের পরিচয় দেয়, মানুষকেও তেমনি সংগ্রাম করিয়া জীবনপথে অগ্রসর হইতে হইবে। কিন্তু এই চিরন্তন সংঘর্ষের ফল?—শ্রীঅরবিন্দ বেদের ভাষায় বলিয়াছেন, "the eater eating being eaten"—খাদক খাদ্যে পরিণত হইতেছে। সংগ্রাম সংঘর্ষই কি মানব-ধর্ম্ম? মানুষের মধ্যে কি প্রেম করুণা প্রভৃতি কোমল বৃত্তি নাই? অবশ্য আদিম মানুষ সংঘর্ষেই জীবন কাটাইত। প্রথমতঃ ব্যক্তিগত সংঘর্ষ, সবলের দুর্ব্বলকে নিধন; তাহার পর গোষ্ঠী

ও সমাজগত সংঘর্ষ ; এখন তাহার পরিণতি হইয়াছে জাতিগত আন্ত-র্জাতিক সংঘর্ষে। কিন্তু সংঘর্ষের ব্যাপকতার সহিত মানব-প্রেমের উদ্ভব হইতেছে ইহাও সুস্পষ্ট। এমন কি, অপর জাতির সহিত সংঘর্ষ করিতে হইলে নিজ জাতিকে প্রেমের ঐক্যসূত্রে বাঁধিতে হইবে। কাজেই দেখা যাইতেছে শুধু দ্বন্দ্ব নয়, প্রেমের মধ্য দিয়াও এতকাল মানুষ, তাহার সমাজ, জাতি, দেশ, সাম্রাজ্য ও ধর্ম্ম এসবের উত্থানপতন হইয়াছে।

প্রেমের উপলব্ধি করাই কি মানুষের মনুষ্যত্ব বিকাশ নহে ? মানব-ইতিহাসে আমরা দেখি যে দারুণ সংঘর্ষ ও বিপ্লবের মধ্যেও এক শ্রেণীর লোকের উদ্ভব হইয়াছে যাঁহারা প্রেম ও মৈত্রীর বাণী প্রচার করিয়াছেন, প্রেমের জীবন যাপন করিয়াছেন ;—মানুষের নিছক জীবধর্ম্মের জীবনের উপর যে আনন্দময় জীবন আছে তাহার পরিচয় দিয়াছেন, প্রেমের আদর্শ স্থাপন করিয়া মানুষকে নূতন আলোকের সন্ধান দিয়া-ছেন—এমন কি মানুষের আদিম হিংস্র অজ্ঞানের আদর্শের জন্য আত্মাহুতি দিয়াছেন। তাঁহারাই যুগে যুগে মানুষকে ঐক্যের পথ দেখাইয়াছেন —মানুষের এই পৃথিবীতে মনুষ্যত্বের পূর্ণোপলব্ধির সম্ভাবনা দেখাই-য়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে অনেকে (বিশেষ করিয়া ভারতের বুদ্ধ) পূর্ণ অহিংসার আদর্শ দিয়াছেন এবং তাঁহাদের প্রেরণায় বহু জাতির অনেকাংশে প্রাণশুদ্ধি হইয়াছে, মনোধর্ম্ম পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। সুতরাং দেখা গেল যে নিম্ন জীবজগতের ধর্ম্ম পুরাপুরিভাবে মানব-ধর্ম্ম নহে—মানুষ একেবারে জীবজগতের নিয়মাধীন—'যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া' নহে।

কিন্তু প্রশ্ন হইতে পারে জীবজগতে কি ব্রহ্ম নাই ? জড়জগৎ কি ব্রহ্মের বিকাশ ক্ষেত্র নহে ? নিম্ন প্রকৃতি কি ব্রহ্ম হইতে উদ্ভূত নহে ? কোন কোন প্রাচীন ধর্ম্মধ্বজী, নীতিবিৎ এসম্বন্ধে বেপরোয়া ছিলেন ; তাঁহারা নিম্নজীবের দূরের কথা, নারীর আত্মা আছে ইহা স্বীকার করিতেন না। কিন্তু আধুনিক মানুষ এইরূপ 'সাফ জবাবে'

তুষ্ট নহে। ইহা আধুনিক বৈজ্ঞানিক মনোভাবের ফল। বিজ্ঞান কোন মনগড়া, ছেঁদো কথায় তৃপ্ত নহে। সে জিনিষকে বুদ্ধির কষ্টি-পাথরে যাচাই না করিয়া, পুরাপুরিভাবে পরখ না করিয়া গ্রহণ করিতে চাহে না। তাই বিজ্ঞানের আলোকবর্ত্তিকা জড়জগৎ ও জীবজগতের গভীর স্তর পর্য্যন্ত বুদ্ধির আলোকপাত করিয়াছে, আমাদের চক্ষের সাম্নে অণুপরমাণুর পর্য্যন্ত রহস্য বিকাশ করিতেছে।

কিন্তু বিজ্ঞানের আলোকবর্ত্তিকা হইতেছে ইন্দ্রিয়-জীবী বুদ্ধি। দৃশ্যজগৎ ছাড়া সে সাধারণত কিছুই আমল দিতে চাহে না ; মাত্র ইদানীং সে চেতনা সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসু হইয়াছে। বিজ্ঞান দৃশ্যজগতের ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য সমস্তই পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিশ্লেষণ করিয়াছে, কিন্তু ইহারা 'কি ও কেন' এ সম্বন্ধে কোন খোজ করিতে চায় নাই। ব্যবহারিক জগতে হয়ত এ প্রশ্নের কোন মূল্য নাই, কিন্তু জ্ঞানজগতে যে আছে তাহার প্রমাণ এই যে, বিজ্ঞানেরই অনুসন্ধিৎসার ক্ষেত্র শুধু ব্যবহারিক জগৎ নহে। তবু শুধু বুদ্ধির উপর নির্ভর করিয়া বিজ্ঞান জড়জগতের গভীর খাতে নামিয়া তত্ত্ব সম্বন্ধে তাহার নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি হারাইয়াছে। জড়ের বিশ্লেষণ করিতে করিতে বিজ্ঞান এমন অবস্থায় আসিয়াছে, যেখানে 'ততঃ কিম্ ?'—এই প্রশ্নের আর যুক্তিযুক্ত উত্তর পাওয়া যায় না—অবস্থাটা, শ্রীঅরবিন্দের ভাষায়, যেন 'জড়ের মায়া', অঘটনঘটন-পটীয়সীর লীলা'!

এই অবস্থায়, বিশেষতঃ বাস্তব জগতের যখন এত উন্নতি হইয়াছে, এত ভোগসুখের উপায় হইয়াছে, তখন সাধারণ মানুষের মনে হইতে পারে অত তত্ত্ব লইয়া মাথা ঘামাইয়া লাভ কি, স্বষ্টির ব্যবহারিক স্তর (শ্রীঅরবিন্দের ভাষায় utilisable crust) লইয়া থাকিলেই হইল! খাও দাও, স্ফূর্ত্তি কর, সমাজের নূতন রূপ দিতে চেষ্টা কর, দেশসেবা কর, জনসেবা কর, নয়া সাম্রাজ্য গঠনের চেষ্টা কর কিংবা সাম্রাজ্য ধ্বংস করিয়া এক মহাজাতি স্বষ্টির চেষ্টা কর, বিশ্বপ্রেমে মানব-হৃদয়কে সরস কর—যদি কিছুতেই কিছু না হয় আর একবার বিজ্ঞানের

চরম বিকাশ দেখাইয়া মহামারণ যজ্ঞ কর। ইহাই হইল বর্ত্তমান জগতের অবস্থা। কিন্তু মানব-হৃদয়ের অবস্থা কি? মানসিক গ্লানির অন্ত নাই, সুখ নাই, শান্তি নাই, চিরস্থায়ীভাবে আরাম উপভোগ করিব তাহার উপায় দেখা যাইতেছে না, সর্ব্বদাই শঙ্কা হারাই, হারাই! ও-দিকে বুদ্ধি-বিকাশের, যুক্তিতর্কের যুগেও হিংসাদ্বেষের হলাহলে জগৎ ছাইয়া গিয়াছে। যুক্তি মানুষকে সর্ব্বনাশা বুদ্ধি হইতে রক্ষা করিতে পারিতেছে না। দু'বার প্রলয় হইয়াছে—আর এক মহাপ্রলয়ের আশঙ্কায় বুক দুরু দুরু!

কোথায় সেই বিজ্ঞানের আশা-মরীচিকা—ধরায় স্বর্গ নামিয়া আসিবে, বিজ্ঞান-প্রসূত সভ্যতা ধরাকে স্বর্গে পরিণত করিবে, ব্যাধি-জরা-মুক্ত হইয়া মানুষ বিজ্ঞানালোকে জীবন কাটাইবে, বিজ্ঞানোচিতভাবে শিক্ষিত হইয়া বৈজ্ঞানিক 'রাজ্যম্ সমৃদ্ধম্' ভোগ করিবে—ভগবানের প্রয়োজন হইবে না, সম্পূর্ণ কুসংস্কার-মুক্ত হইয়া মানুষ বিজ্ঞানকে রাজসিংহাসনে বসাইয়া মুক্ত, জ্ঞানী-জীবন যাপন করিবে! ব্যক্তিত্ব প্রভৃতি ছেঁদো কথার ধার বিজ্ঞান ধারে না, বিজ্ঞানই ছাঁচে ফেলিয়া ব্যক্তি গঠন করিবে! অবশ্য তাহা বিজ্ঞানময় পুরুষ নহে—খানিকটা মানুষী মানুষ, খানিকটা যান্ত্রিক মানুষ, যাহা আবার আসুরিক প্রকৃতিতে পরিণত হইতে পারে।

কিন্তু এই বৈজ্ঞানিক উপায়ে যে মানবজাতি গঠিত হইবে তাহার আশা বর্ত্তমান অবস্থায় সুদূরপরাহত বলিলেই হয়। তাহার কারণ মানুষের মানুষী বুদ্ধি। বিজ্ঞানালোক-প্রাপ্ত মানুষের মধ্যেও সেই সনাতন আদিম প্রবৃত্তিগুলি জাগ্রত হইয়া,—অধুনা ব্যাপকভাবে জাগ্রত হইয়া, —মানুষের সৃষ্টিকে যেন মহাপ্রলয়ের দিকেই টানিয়া লইয়া যাইতেছে। যে আধুনিক মানুষ শিক্ষাদীক্ষায় সভ্য বলিয়া গর্ব্ব করিত, সেই মানুষ আজ যেন নৃশংসতায় বর্ব্বর যুগের মানুষকে হারাইয়া দিবার উপক্রম করিয়াছে। পরন্তু বিজ্ঞানের সহায়তায় বর্ব্বরতাও হইয়া উঠিয়াছে ব্যাপক, যান্ত্রিক ও ভয়াবহ। ন্যায়ধর্ম্ম, আইন-শৃঙ্খলা প্রভৃতি সভ্যযুগের রীতিনীতি লুপ্ত হইবার উপক্রম হইয়াছে।

ইহাই হইল মানবজাতির ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসার ক্ষণ ! এইরূপ এক অবস্থায়—১৯১৪ খৃষ্টাব্দে ইয়ুরোপে মহাযুদ্ধের প্রারম্ভে—শ্রীঅরবিন্দ ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা ও তাহার মীমাংসা সুরু করিয়াছিলেন ;* মানবজাতিকে অভ্রান্ত ইঙ্গিত দিয়াছিলেন দিব্যজীবনের—হয় মানুষকে এই জীবনের সন্ধান করিতে হইবে, নতুবা মানুষের এ পর্য্যন্ত যে বিবর্ত্তন হইয়াছে তাহাই চরম এবং তাহার পরে হয়ত মহানির্ব্বাণ ! কিন্তু মানুষ যদি সৃষ্টির চরম প্রেরণা অনুসারে চলিতে চায় ক্রমোন্নতিবাদ যদি ব্যর্থতায় পরিণত না হয়, তাহা হইলে তাহাকে দিব্যজীবন লাভ করিতেই হইবে।

এই ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা প্রসঙ্গে শ্রীঅরবিন্দ বৈজ্ঞানিকের ন্যায় পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে সৃষ্টির বিবর্ত্তন নিরূপণ করিয়াছেন এবং তাহার গূঢ় রহস্য উদ্ঘাটন করিয়া ব্রহ্মজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে ইঙ্গিত করিয়াছেন। তাই আমরা দেখি যে, "Life Divine" বা দিব্য-জীবন শীর্ষক প্রবন্ধগুলিতে তিনি 'অথাতো ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা'—ব্রহ্ম কি ?—সেই সনাতন প্রশ্ন হইতে সুরু করেন নাই ; সুরু করিয়াছেন দৃশ্যমান জগৎ কি তাহা হইতে—বৈজ্ঞানিকের মতন প্রশ্ন করিয়াছেন জড় প্রকৃতি কি, বিকশিত করিয়াছেন তাহার পিছনের রহস্য, প্রকট করিয়াছেন জড়ের মৌন চেতনা। শ্রীঅরবিন্দ যখন বিলাতে ছিলেন তখন দারুণ জড়বাদের যুগ, কাজেই জড়বাদের সহিত তাঁহার নিবিড় পরিচয় হইয়াছিল এবং তাহার অপূর্ণতা সম্বন্ধে প্রতীতি জন্মিয়াছিল—ইহার ফলেই উত্তরকালে তিনি ব্রহ্মবাদের সহিত জড়বাদের অপূর্ব্ব সমন্বয়সাধন করিয়াছেন, যাহা পূর্ব্বে কেহই এভাবে চেষ্টা করেন নাই। এ সমন্বয় মানসিক (দার্শনিক) সমন্বয় নহে—ইহা জড়কেও ব্রহ্মের স্বরূপরূপে উপলব্ধি এবং ব্রহ্মভূত জড়ের দিব্যরূপান্তরের ইঙ্গিত।

---

* ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে "আর্য্য" প্রকাশিত হয়, ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রাক্কালে "আর্য্যের" শ্রেষ্ঠ অবদান The Life Divine পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় ; জগতের আর এক সন্ধিক্ষণে ১৯৪৮ খৃষ্টাব্দে ব্রহ্ম-প্রতিষ্ঠার সোপান "The Synthesis of Yoga" গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইয়াছে।

পণ্ডিচারী আসিবার পূর্ব্বেই শ্রীঅরবিন্দের পূর্ণ ব্রহ্মজ্ঞান হইয়াছিল। তিনি "কর্ম্মযোগিন্" ও 'ধর্ম্মে' যে সকল প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন তাহাতেই বুঝা যায় যে, অধ্যাত্মজ্ঞান তাঁহার মধ্যে পূর্ণভাবে বিকশিত হইয়াছিল। উপনিষদ, গীতা, পুরাণ প্রভৃতি সম্বন্ধে তিনি ইংরাজী ও বাংলায় যে হৃদয়গ্রাহী প্রবন্ধগুলি লিখিয়াছিলেন তাহা সেই জ্ঞানের পরিচায়ক। জেলে থাকিতে তাঁহার যে অভিজ্ঞতা হইয়াছিল তাহা ব্রহ্মোপলব্ধি। কিন্তু এই উপলব্ধিতে তিনি তৃপ্ত রহিলেন না, এই উপলব্ধি হইল মানবের দিব্যরূপান্তরের সাধনার, পূর্ণযোগের ভিত্তি। তিনি পরম জ্ঞান, পরম প্রেম, পরম শান্তির আধারের পূর্ণ সত্তাকে মানব-আধারে বিকাশ করিবার ব্রতে ব্রতী হইলেন এবং তাঁহার সংকল্প হইল দিব্যের তুরীয় আলোকে মানবজীবনকে আলোকিত করিয়া দিব্যশক্তির সহায়তায় তাহার রূপান্তর করা। মানব যুগে যুগে যে মহান্ স্বপ্ন দেখিয়াছে তাহা জীবন-সত্যে পরিণত করা হইল তাঁহার উদ্দেশ্য। ইহাই তাঁহার পণ্ডিচারীর নিভৃত সাধনার রহস্য।

পঞ্চদশ অধ্যায়

সৃষ্টিক্রম রহস্য

জন্মিয়াই আমাদের প্রথম পরিচয় হয় পৃথিবীর সহিত। জড়ই আমাদের প্রথম অবলম্বন। জড়ের ভিত্তির উপরই আমাদের জীবন বিকশিত হইতে থাকে। জড়দেহের সেবাই আমাদের প্রথম কার্য্য। জড়ের আধারে যে প্রাণশক্তি আছে তাহাই আমাদের জীবনকে পরিচালিত করে, কিন্তু সে বিষয়ে আমরা প্রথমে থাকি অনবহিত, তাহার স্বরূপ কি তাহা আমরা জানি না। ক্রমশঃ বয়োবৃদ্ধির সহিত আমাদের মনঃশক্তির বিকাশ হয়, কিন্তু মন কিরূপে কার্য্য করে সে বিষয়েও আমাদের অনেকদিন হুঁস হয় না ; বুদ্ধির বিকাশের সহিত আমাদের মনের ক্রিয়ার উপর লক্ষ্য পড়ে।

সৃষ্টির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেও আমরা জড়, প্রাণ ও মনের লীলা-বৈচিত্র্য বুঝিতে পারি। পৃথিবীই জড়সৃষ্টির প্রতীক। পৃথিবীর বৈচিত্র্যই জড়শক্তির লীলা। কিন্তু এই লীলার আরও বৈচিত্র্য ঘটিল প্রাণশক্তির বিকাশে। জড়-পৃথিবীতে বিকাশ পাইল উদ্ভিদাদি প্রাণধর্ম্মী জড়ের বিভিন্নরূপ ; তাহার পরে উদ্ভূত হইল জড়দেহধারী পূর্ণ প্রাণধর্ম্মী প্রাণিগণ। কত লক্ষ বৎসর ধরিয়া পৃথিবীর নিছক জড়ত্ব ছিল এবং কত যুগে প্রাণ বিকশিত হইয়াছে কে তাহা নির্ণয় করিবে ? প্রাণশক্তির বিকাশেই পৃথিবীর মোহনরূপ ফুটিয়া উঠিতে লাগিল, সৃষ্টির স্তরে স্তরে বিকশিত হইল কত বৈচিত্র্য, কত না সুষমা—যাহা মানুষের নয়নকে মুগ্ধ করে, হৃদয়কে পূর্ণ করে। পৃথিবীর দেহে কতই না রহস্য—আরও কত গভীর রহস্য নভে, যেখানে পৃথিবীর গোষ্ঠিভুক্ত গ্রহাদি বিচরণ করিতেছে। আমরা যাহাকে জড় বলি তাহাও

কত সুন্দর, কত মহিমামণ্ডিত—তাহা কবির দৃষ্টিতে ধরা পড়িয়াছে, আর বৈজ্ঞানিকের বিশ্লেষণে তাহার রহস্য কিছু কিছু জানা গিয়াছে।

কিন্তু আরও বিস্ময়কর কি নহে জড়ে প্রাণশক্তির লীলা? কি অদ্ভুত এই প্রাণশক্তি এবং কতই বিচিত্র ইহার অজস্র আধার—তাহাদের গঠন, রূপ, প্রকাশভঙ্গিমা, প্রকৃতি। এমিবা হইতে মানুষ পর্য্যন্ত কতপ্রকারের জীব ধরাপৃষ্ঠে বিচরণ করিতেছে, সমুদ্রের তলদেশ পর্য্যন্ত ছাইয়া আছে—কত কোটি বৎসর ধরিয়া তাহাদের বিবর্ত্তন হইয়াছে, তাহাদের কত সহস্র অবলুপ্ত হইয়াছে, এই অভিনব ইতিহাস আলোচনা করিলে বিস্ময়ে বিমুগ্ধ হইতে হয়।

এই জড় ও প্রাণী-রাজ্যের প্রতিটি স্তরের, অসংখ্য শ্রেণীর, তাহাদের অনন্ত বৈচিত্র্যের বিষয় গবেষণা করিয়া কত বৈজ্ঞানিক জীবন কাটাইয়াছেন! তাঁহারাই জড়জগৎ ও জীবজগতের রহস্যের সন্ধান দিয়াছেন। কিছুকাল পূর্ব্বে আমেরিকার একজন বৈজ্ঞানিক পিপীলিকা ও কীট-পতঙ্গের জীবন-বেদ যে ভাবে আলোচনা করিয়াছেন তাহা পাঠ করিলে বিস্মিত হইতে হয়—এই একটি শ্রেণীর মধ্যে জীবনলীলার কি অভিনব বৈচিত্র্য, সৃষ্টিতে তাহাদের কত রকমের গতিভঙ্গী, এমন কি মানুষের জীবনযাত্রার সহিত, তাহার ভালমন্দের সহিত কি নিগূঢ় সম্বন্ধ! আবার ভূতত্ত্ব, সমুদ্রতত্ত্ব, নভস্তত্ত্ব প্রভৃতি লইয়া বৈজ্ঞানিকগণ কত গবেষণা করিয়াছেন। ইহার যে-কোন একটি বিষয় লইয়াই এক জীবন কাটান যায়।

প্রকৃতির এই লীলা জীবজগতে প্রথমে কাহার চেতনায় প্রকটিত হইল, কে ইহার রহস্য সন্ধান করিল, রস গ্রহণ করিল? সহজ উত্তর—মানুষের। মনোধর্ম্মবিশিষ্ট মানুষ সৃষ্টি করিবার পূর্ব্বে প্রকৃতি বোধ হয় আপন সৃষ্টিতে আপনি যেন অন্ধভাবে বিভোর ছিলেন—মানুষের মনোমুকুরে নিজের সত্তা দেখিলেন। মানসিক চেতনা বিকাশের ফলেই প্রকৃতির স্বীয় সৃষ্টি উপভোগ করিবার ক্ষমতা জন্মিল। মন বিকাশের পূর্ব্বে প্রকৃতি ছিলেন যেন যন্ত্রবৎ—মানুষের মধ্যে হইলেন

সজ্ঞান। এইজন্যই শ্রীঅরবিন্দ মানুষকে বলিয়াছেন "মনোময় পুরুষ"। পুরুষ শুধু সচেতন, সজ্ঞান নহে, কর্ত্তা, ভোক্তা, আবার দ্রষ্টাও। মনঃশক্তিরই জড়শক্তি ও প্রাণশক্তি নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা হইল। মানুষ প্রকৃতিকে বহুল পরিমাণে নিয়ন্ত্রণ ও উপভোগ করিবার ক্ষমতা পাইল। আত্মা যেন খানিকটা স্বাধিকার পাইয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করিল এবং অহংরূপে সৃষ্টি উপভোগ ও বৈচিত্র্য ঘটাইবার শক্তি পাইল।

সৃষ্টির ক্রমবিকাশে আর একটি ব্যাপার প্রতীয়মান হয় যে, যে-ধর্ম্মের বিবর্ত্তন হইল, সে-ধর্ম্ম নিম্নধর্ম্ম হইতে উদ্ভূত হইলেও নিম্নধর্ম্মের উপর তাহার কর্ত্তৃত্ব জন্মিল। জড় হইতে প্রাণ বিকশিত হইল, কিন্তু প্রাণশক্তি খানিকটা কর্ত্তৃত্ব পাইল জড়শক্তির উপর—প্রাণশক্তিই জড়শক্তিকে লীলায়িত করিল। তাই বিবর্ত্তনের স্তরে স্তরে ঊর্দ্ধায়নের গতি অনুসারে ছন্দোবিকাশেরও তারতম্য দেখা যায়। যেমন নিম্নস্তরের প্রাণী অনেকটা জড়ধর্ম্মী। জড়ের যেখানে প্রাণে প্রথম বিকাশ, সেখানে উভয়ের ধর্ম্ম ওতপ্রোতভাবে বিজড়িত। প্রাণাজগতেও বিবর্ত্তনের তারতম্য অনুসারে শক্তির তারতম্য ঘটে। উচ্চশ্রেণীর প্রাণী নিম্নশ্রেণীর প্রাণীর উপর কর্ত্তৃত্ব করে—অনেকস্থলে তাহাদের ভক্ষক-ভোজ্যের সম্বন্ধ। ইহাকেই ডারউইন জীবনসংগ্রাম এবং সবলের জীবন-যুদ্ধে টিকিয়া থাকা বলিয়াছেন। জড়জগৎ ও প্রাণজগৎ সংঘর্ষের ক্ষেত্র। জড়জগতে যে শক্তি অন্ধভাবে নিয়ন্ত্রিত প্রাণজগতে তাহা স্ফূর্ত্ত, কিন্তু অন্ধ আবেগ তখনও তাহার গতি নির্ণয় করে।

প্রাণশক্তির এই অন্ধ আবেগ আমরা মানবজীবনেও কম অনুভব করি না। আমরা আগ্নেয়গিরির বিস্ফোরণ, ভূমিকম্প, পর্ব্বতশিখর হইতে তুষারস্তূপের স্খলন, মহাসাগরে প্রলয়-বাত্যা দেখিয়া বিস্মিত হই, কিন্তু তাহা অপেক্ষা কি কম বিস্ময়কর ব্যক্তিবিশেষের বা জাতিবিশেষের প্রাণশক্তির অন্ধ আবেগ? একটা তাইমুরলঙ্গ, একটা জঙ্গীস খাঁ, একটা নীরোর প্রলয়-তাণ্ডব কি প্রাকৃতিক দুর্যোগ অপেক্ষা কম ভীষণ? আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত ভয়াবহ সন্দেহ নাই, কিন্তু

রণক্ষেত্রের উন্মাদনা, হত্যাতাণ্ডব কি কম ভীষণ? বজ্রনির্ঘোষ চমকপ্রদ সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহা অপেক্ষা কি কম চমকপ্রদ অসুরের অট্টহাস্য?

শুধু মানুষের জগতে কেন, মানুষের নিম্নস্তরে যে প্রাণীজগৎ সেখানেও প্রাণশক্তির লীলা দেখিয়া আমরা বিস্ময়ে বিমুগ্ধ হই। মানুষ জড়শক্তির বৈচিত্র্য উপভোগ করিবার জন্য যেমন এভারেষ্ট-শীর্ষ পর্য্যন্ত ধাওয়া করে, সমুদ্রের অতলে ডুব দেয়, তেমনি আফ্রিকার গভীর জঙ্গলে অভিযান করে প্রাণীজগতে প্রাণশক্তির ভীষণ লীলামাধুর্য্য উপভোগ করিবার জন্য।

প্রাণীজগতে আর একটি জিনিষ আমাদের বিস্ময়োদ্রেক করে, তাহা হইতেছে মনঃশক্তির বিকাশ। মানুষ মনঃশক্তিবিশিষ্ট ও বুদ্ধি-জীবী বলিয়া গর্ব্ব করে, কিন্তু পশুজগতে আমরা যে বুদ্ধির পরিচয় পাই তাহাও কি কম বিস্ময়কর? বরং কোন কোন স্থলে ইন্দ্রিয়শক্তিতে পশু মানুষ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। এ সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দ বহুকাল পূর্ব্বে "ধর্ম্মে" প্রাকাম্য-শীর্ষক এক প্রবন্ধে লিখিয়াছিলেন, "স্থূল শরীরের ইন্দ্রিয় সকল, বিশেষতঃ সীমাবদ্ধ মানুষ যতদিন স্থূল দেহের শক্তিদ্বারা আবদ্ধ থাকে, ততদিন বুদ্ধির বিকাশে সে পশুর অপেক্ষা উৎকৃষ্ট, নচেৎ ইন্দ্রি-য়ের প্রাখর্য্যে এবং মনের অভ্রান্ত ক্রিয়াতে—এক কথায় প্রাকাম্যসিদ্ধিতে —পশু উৎকৃষ্ট। বিজ্ঞানবিদগণ যাহাকে instinct বলেন, তাহা এই প্রাকাম্য।"

কাজেই মানুষকে যে "মনোময় পুরুষ" বলা হয় তাহা শুধু তাহার মনন-ক্রিয়ার জন্য নহে। মন ছাড়া মানুষের আরও কতকগুলি বৃত্তি আছে যাহার জন্যই সে মানুষ, এবং এই বৃত্তিগুলির তারতম্যের জন্য মানুষের মধ্যে তারতম্য ঘটে। উক্ত প্রবন্ধে শ্রীঅরবিন্দ লিখিয়াছেন, "পশুর মধ্যে বুদ্ধির অত্যল্প বিকাশ হইয়াছে, অথচ এই জগতে যদি বাঁচিয়া থাকিতে হয় তাহা হইলে এমন কোনও বৃত্তির দরকার যে পথ-প্রদর্শক হইয়া সর্ব্বকার্য্যে কি অনুষ্ঠেয়, কি বর্জনীয় তাহা দেখাইয়া দিবে।

পশুর মনই এই কার্য্য করে। মানুষের মন কিছুই নির্ণয় করে না, বুদ্ধিই নিশ্চয়াত্মক। বুদ্ধিই নির্ণয় করে, মন কেবল সংস্কারসৃষ্টির যন্ত্র।"

অতএব বুঝা যায় যে, প্রাণশক্তি হইতেই মনঃশক্তি বিকশিত এবং মানুষের মধ্যে এই শক্তি পূর্ণভাবে প্রকটিত হওয়ায় উচ্চতর মানসিক বৃত্তিগুলি—চিত্ত, বুদ্ধি, বিজ্ঞান প্রভৃতি—বিকশিত হইয়াছে। অনেক প্রাণীর মধ্যে বুদ্ধির বিকাশ দেখা যায়, এমন কি চিত্তের আভাস, স্মৃতি-শক্তি, ভাবাবেগ প্রভৃতি লক্ষ্য করা যায়, তথাপি পশুকে প্রাণধর্ম্মী ছাড়া কিছু বলা যায় না। মানুষের জীবন-ইতিহাসে দেখা যায় যে, আদিম মানুষ বিশেষভাবে প্রাণধর্ম্মী ছিল। প্রাণের আবেগেই সে সকল কার্য্য করিত, তাহার মধ্যে ন্যায়-অন্যায় বোধ ছিল না। এই কারণেই এবং খানিকটা দেহগত সাদৃশ্যের জন্য ডারউইন প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক-গণ অনুমান করিয়াছিলেন যে, মর্কটজাতীয় প্রাণীর বিবর্ত্তনে মানুষ উদ্ভূত হইয়াছে। এই তথ্য নিঃসন্দেহে এখনও প্রমাণিত হয় নাই—এখনও প্রমাণ সংগ্রহ চলিতেছে;—প্রকৃতির সৃষ্টির লীলায় কবে, কি ভাবে মানুষ উদ্ভূত হইল তাহা নির্ণয় করা সহজ কথা নহে। তবে ইহা সুস্পষ্ট যে, বহু বৃত্তিতে এখনও পশুর সহিত মানুষের সাদৃশ্য রহিয়াছে। পশুর বৃত্তিগুলি কালক্রমে মানুষের মধ্যে সংস্কৃত হইয়াছে—ইহাই সভ্যতার ফল।

কিন্তু এখনও কি মানবজাতির পূর্ণ রূপান্তর হইয়াছে বলা চলে? মানুষের মনঃশক্তির অদ্ভুত বিকাশ হইয়াছে সত্য, কিন্তু এখনও যে আমা-দের মন বহুল পরিমাণে জড় ও প্রাণধর্ম্মী তাহা আমরা একটু আত্ম-বিশ্লেষণ করিলেই বুঝিতে পারি। প্রণের আবেগে যখন আমাদের রিপুগুলি গর্জিয়া উঠে তখনই দেখি আমাদের ভিতর পশুস্বভাব জাগিয়া উঠিয়াছে। মানুষ সভ্য হইয়াছে বলিয়া খুব বড়াই করে, কিন্তু যখন কোন ব্যক্তি, দল বা জাতি প্রাণের অন্ধ আবেগে মাতিয়া উঠে তখন তাহাতে পশুর ন্যায় হিংস্রস্বভাব ফুটিয়া উঠে। এ দৃশ্য আজও বিরল নয়—আমরা তথাকথিত বহু সভ্যদেশে এই দৃশ্যই দেখিতেছি। বরং

পশুর মানুষের মত বুদ্ধির উৎকর্ষ না হওয়ায় তাহার প্রাণবৃত্তির বিকাশ সীমাবদ্ধ, কিন্তু মানুষ বুদ্ধির সহায়তায় বিজ্ঞানালোক পাইয়া প্রাণের অন্ধ আবেগ চরিতার্থ করিবার নানারূপ চমকপ্রদ উপায় উদ্ভাবন করিয়াছে—যাহার ভীষণতা আমরা বিংশ শতাব্দীতেই বিশেষভাবে অনুভব করিতেছি।

এখনও রহিয়া রহিয়া প্রাণের আবেগে মানবজাতি আলোড়িত হইলেও যুগে যুগে মনঃশক্তির ক্রমবিকাশে যে পার্থিব জীবনের রূপান্তর হইতেছে—মানুষের রসবোধ ও সৃষ্টিশক্তির যে অভিনব বিকাশ হইয়াছে, এমন কি সে দেবত্বলাভের স্বপ্ন দেখিয়াছে—ইহা কে অস্বীকার করিবে ? এই মানুষই ধরায় স্বর্গস্থাপনের কল্পনা করিয়াছে। কত সহস্র বৎসর পূর্ব্বে বৈদিক ঋষিদের ধ্যাননেত্রে দেবতাদিগের মূর্ত্তি প্রতিভাত হইয়াছে! কতকাল পূর্ব্বে উপনিষদের স্রষ্টাগণ আত্মার মহিমা উপলব্ধি করিয়াছিলেন! এ পর্য্যন্ত পৃথিবীতে কত দেশে কত ঈশ্বর-বেত্তা, মানব-প্রেমিক, ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক, দার্শনিক, কবি ও শিল্পীর আবির্ভাব হইয়াছে! যুগে যুগে কত লোকের ধ্যান, সাধনা, চিন্তা, কর্ম্মের ফলে আজ জ্ঞান, বিজ্ঞান, দর্শন, শিল্প, সাহিত্য, রাজনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি প্রভৃতির উন্নতি হইয়া মানব-সভ্যতা সমৃদ্ধ করিয়াছে। জাতির উন্নতির জন্য, মানবের মঙ্গলের জন্য যুগে যুগে কত নরনারী আত্মত্যাগ করিয়াছে—আদর্শের জন্য দুঃখকে বরণ করিয়া লইয়াছে। এই সৃষ্টিশক্তি ও ত্যাগধর্ম্ম মানুষকে মানুষ করিয়াছে। বহিঃপ্রকৃতির কর্ত্তৃত্বলাভ মানুষের প্রধান কীর্ত্তি নয়, প্রধান কীর্ত্তি আত্মোপলব্ধি ও আত্মশক্তির বিকাশ।

তাই মানুষ শুধু বাহিরের পরিচয়, বিশ্বের বহিঃরূপের পরিচয় পাইয়া তৃপ্ত হয় নাই, সে অন্তর্লোকের দিকে দৃষ্টি ফিরাইয়াছে। সে যদি অন্তর-সন্ধানী না হইত তাহা হইলে সে সাধারণ জীবন লইয়া সন্তুষ্ট থাকিত ; তাহার জীবনের বৈচিত্র্য ঘটিত না। সৃষ্টি হইত অনেকটা একঘেয়ে, যন্ত্রবৎ। তাহাতে প্রাণের পরিচয় পাওয়া যাইত, বুদ্ধির

কৌশল দেখা যাইত, কিন্তু আত্মার আনন্দের সন্ধান মিলিত না—মানুষের হৃদয়ক্ষেত্র থাকিত উষর। মানুষ অন্তর্লোকের দিকে দৃষ্টি ফিরাইয়া সন্ধান পাইয়াছে "রসো বৈ সঃ"। সে সৃষ্টিতে আনন্দের আস্বাদন করিয়াছে। এ আনন্দ প্রাণের উচ্ছ্বাস, ইন্দ্রিয়ের উল্লাস, মানসিক বৃত্তিগুলির তৃপ্তি অপেক্ষা আরও নিবিড়। সে উপলব্ধি করিয়াছে পার্থিব আনন্দ, সেই উর্দ্ধের আনন্দেরই রূপান্তর, সেই আনন্দই হইতেছে সকল আনন্দের উৎস। মানুষের চেতনা গভীরে ও উর্দ্ধে প্রসারিত হইয়া সেই আনন্দের সন্ধান পাইয়াছে।

এই রসভোগের, আনন্দ-উপভোগের ক্ষমতাই মানুষের জীবনকে রূপান্তরিত করিয়াছে। তাই মানুষ নিছক ব্যবহারিক বুদ্ধিতে তৃপ্ত থাকিতে চায় না। এমন কি যাহারা একান্তভাবে ব্যবহারিক বুদ্ধির বশবর্ত্তী হইয়া গতানুগতিক জীবন ছাড়া আর কোন দিকে দৃষ্টি ফিরাইতে চাহে না, তাহাদের জীবনেও এমন ক্ষণ আসে যখন তাহারা অজানার হাতছানিতে সাড়া দেয়, কি এক অজানার সন্ধানে তাহাদের মন আকুল হইয়া উঠে—আপনাকে ভোগ করিয়া তাহারা আর তৃপ্ত থাকিতে পারে না, চায় আপনাকে বিলাইয়া দিতে, কোন এক নিবিড়তার মধ্যে ডুব দিতে। তখন মানুষের চিত্তে জাগে ধ্যান, হৃদয়ে গুঞ্জরিত হয় প্রার্থনা। মানুষ বুঝে দেহ, প্রাণ, মনই সব কিছু নয়—তাহাদের সার্থকতা পূর্ণভাবে উপলব্ধি হয় না যতক্ষণ পর্য্যন্ত না সেই অজ্ঞেয় আনন্দের উৎস খুলিয়া যায়।

মানুষের দৃষ্টিতে তখন ফুটিয়া উঠে বহিঃপ্রকৃতির পিছনে এক সূক্ষ্ম প্রকৃতি। মানুষ উপলব্ধি করে যে স্থূলের পিছনে রহিয়াছে সূক্ষ্ম—স্থূল সূক্ষ্মের রূপান্তর, স্থূলের কারণ সূক্ষ্ম—সূক্ষ্মের বহিঃপ্রকাশ স্থূল। এই অন্তর্দৃষ্টির ফলে বৈদিক ঋষিগণ দেখিয়াছিলেন প্রাকৃতিক শক্তির পিছনে সূক্ষ্ম দেবশক্তি, তাঁহাদের ধ্যাননেত্রে ফুটিয়া উঠিয়াছিল দেবতাদিগের রূপ। তাঁহারা সূর্য্যে, চন্দ্রে, নভে, সমুদ্রে, পৃথ্বীতে সর্ব্বত্রই অনুভব করিয়াছিলেন দেবশক্তির লীলা। তাঁহারা উপলব্ধি

করিয়াছিলেন যে, মানুষ হইতেছে দেবতার লীলাসাথী। ইহা শুধু ভারতের কল্পনা নহে, অল্পবিস্তর সকল প্রাচীন জাতিরই কল্পনা।

বৈজ্ঞানিক ইহাকে নিছক কল্পনা বলিয়া উড়াইয়া দিবেন—কিন্তু এমন মানুষ খুব কম যিনি কল্পনার আশ্রয় না লইয়া চলিতে পারেন। আজও কি এই বৈজ্ঞানিক যুগে কল্পনা-পসারী কবির আদর কম? আজও কি তত্ত্বানুসন্ধিৎসু দার্শনিক একেবারে অনাদৃত? মানুষ নিশ্চয়ই বিজ্ঞানের সুখসুবিধায় জীবনকে পূর্ণ করিতে চাহে, কিন্তু অবসর সময়ে অন্তরের নিরালায় নিছক ব্যবহারিক বুদ্ধি কি তাহার প্রাণ মন ভরাইতে পারে? যদি মানুষ নিছক ব্যবহারিক বুদ্ধিপরায়ণ হইত, তাহা হইলে গুহাবাসের বা বন্যজীবনের স্তরকে সে অতিক্রম করিয়া জীবনের বিচিত্র বিকাশ করিতে পারিত না। প্রকৃতিই তাহাকে সেইরূপে স্তরীভূত থাকিতে দেয় নাই—তাহার হৃদয়ে প্রেরণা জাগাইয়াছে উর্দ্ধ বিবর্ত্তনের।

প্রকৃতির প্রেরণায় যেমন জড় হইতে উদ্ভূত হইয়াছে প্রাণ, প্রাণ বিকশিত হইয়াছে মনে, তেমনি মনে ছায়া পড়িয়াছে, আবেশ আসিয়াছে উর্দ্ধ মানসের। এই আবেশ যদি না আসিত তাহা হইলে মানুষ হয়ত পশুর স্তর হইতে একটু উন্নত হইত, মানুষের জীবন পশুজীবনের উন্নত সংস্করণ হইত, কিন্তু মানুষের কি বিশ্বের রসাস্বাদনের, বিশ্বজ্ঞান লাভ করিবার ক্ষমতা হইত? মানুষ কি ভূমার সন্ধান করিত? আত্ম-প্রসার করিয়া কি মহান্ আত্মার সন্ধান পাইত? এমন কি মানুষ দয়া, মায়া, প্রেম প্রভৃতি কোমল মানবীয় বৃত্তিগুলি বিকাশ করিতে পারিত? মানুষের ইতিহাসে কি শৌর্য্য, বীর্য্য, স্বার্থত্যাগের নিদর্শন পাওয়া যাইত? মানুষ থাকিত নিম্ন প্রকৃতির দাস, স্বল্পেতুষ্ট প্রাকৃতিক জীবমাত্র, এবং মানবজীবন হইত অন্ধ প্রকৃতির ক্রীড়াপুত্তলি।

মানসিক শক্তির বিকাশেই ত মানুষের প্রকৃতি নিয়ন্ত্রণে অদ্ভুত ক্ষমতা জন্মিয়াছে। প্রাণের ত পূর্ণভাবে জড়-নিয়ন্ত্রণ করিবার ক্ষমতা নাই—প্রাণ হইতেছে জড়ের সুপ্ত চেতনার বিকাশ। জড়কে ও প্রাণকে নিয়ন্ত্রিত করিবার পূর্ণ ক্ষমতা আছে মনের। সেই কারণেই

জীবনলীলায় মনের আধিপত্য—"মনোময় পুরুষ" মানুষই জীবজগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। কিন্তু মনের শক্তিও পূর্ণ নয়—মন অনেক সময় প্রাণের আবেগে অন্ধশক্তিতে পরিণত হয়, বিচারবুদ্ধি হারাইয়া ফেলে; আবার জড়ের টানে স্বাধীনতা হারাইতে পারে। তাই দেখা যায় যে, মানসিক বৃত্তির অদ্ভুত বিকাশ সত্ত্বেও প্রাণের আবেগে মন দিশাহারা হইয়া পড়ে—বিচারবুদ্ধিদ্বারা গঠিত মানুষের ধর্ম্ম, সমাজ, রাজনীতি, অর্থনীতি সমস্তই প্রাণের প্লাবনে ভাসিয়া যাইতে পারে। মানুষের ইতিহাস কি সভ্যতা ও বর্ব্বরতার দ্বন্দ্ব নহে? যখন বর্ব্বরতা জাগিয়া উঠে তখন মানুষের মনগড়া রীতিনীতি আচার সব যায় ভাসিয়া। এই অতিসভ্য যুগে, বিজ্ঞানগর্ব্বী কয়েকটি দেশে বিগত কয়েক বৎসরের মধ্যে বর্ব্বরতার যে পুনরাবর্ত্তন দেখা গিয়াছে তাহা কি বিস্ময়কর নহে?

মানসিক শক্তির অপূর্ণতাকে পূর্ণ করিতে হইলে আশ্রয় লইতে হইবে অতিমানসের—শ্রীঅরবিন্দ যাহাকে বলিয়াছেন Supermind, Supramental। অতিমানসের সন্ধান মানুষের ইতিহাসে নূতন নহে। ব্যক্তিগত ভাবে যাঁহারা অতিমানসের সন্ধান করিয়াছেন, তাঁহারাই মানবজাতিকে নূতন আলোক দেখাইয়াছেন, ভবিষ্যৎ বিবর্ত্তনের ইঙ্গিত দিয়াছেন। কিন্তু সমগ্র মানবজাতিকেই আশ্রয় লইতে হইবে অতিমানসের, যেমন এক্ষণে সে বুদ্ধিবৃত্তির আশ্রয় লইয়া জীবন নিয়ন্ত্রণ করিতেছে। অতিমানসই বুদ্ধির খণ্ডতা দূর করিয়া সমগ্রের, ভূমার সন্ধান দিতে পারে—খণ্ডশক্তিকে পূর্ণ, অভ্রান্ত শক্তিতে পরিণত করিতে পারে, মানবজীবনের সত্য রূপান্তর-সাধন করিতে পারে।

অতিমানসের সাধক হইতেছেন যোগী। তিনি শুধু দ্রষ্টা ও কবি নহেন, নিগূঢ়ভাবে জীবন নিয়ন্ত্রণ করিবার অপূর্ব্ব শক্তি তাঁহার আয়ত্ত। সাধারণ মানুষের মত যোগীর দৃষ্টি শুধু বাহিরে নয়, তিনি বহির্বিশ্বপ্রকৃতির রস গ্রহণ করিয়া তৃপ্ত নহেন, তাঁহার দৃষ্টি ঊর্দ্ধে, অন্তরে, জীবনের উৎসের দিকে। তিনি সাধারণের মত স্থূলে আবদ্ধ নহেন, তাঁহার গতি সূক্ষ্মে, কারণ-জগতে। এই কারণেই বিশ্বের

গূঢ় রহস্য যোগীর আয়ত্ত। তিনি বিশ্বলীলার রহস্য জানেন, আরও জানেন কোন্ প্রেরণায় লীলার গতিভঙ্গী নিয়ন্ত্রিত হয়, রূপান্তরিত হয়। যোগীই ভাবী মানবজীবনের পথ-প্রদর্শক, তিনিই পৃথিবীতে অতিমানব স্বষ্টির অগ্রণী। যোগী অন্ধশক্তির, অজ্ঞানের ক্রীড়নক নহেন, তিনি পরাপ্রকৃতির যন্ত্র—পৃথ্বীতে পরাশক্তি-বিকাশের আধার। এই কারণেই শ্রীভগবান গীতায় বলিয়াছেন, সকল ভক্তের মধ্যে যোগীই আমার প্রিয়।

ষোড়শ অধ্যায়

কয়েকটি চিরন্তন সমস্যা

কি হৃদয়গ্রাহীভাবে শ্রীঅরবিন্দ সৃষ্টির বিবর্তন আলোচনা করিয়াছেন! "আর্য্যে" তিনি মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর দিব্যজীবন সম্বন্ধে যে প্রবন্ধগুলি লিখিয়াছিলেন, তত্ত্বানুসন্ধিৎসু মাত্রেই তাহা পাঠে তন্ময় হইয়া যান—পাঠকের অন্তর্দৃষ্টিতে জ্ঞানের নূতন রাজ্য খুলিয়া যায়, সৃষ্টির সমস্ত রহস্যই যেন উদঘাটিত হয়। অপর কোন দার্শনিক এরূপ বিশদ ও মনোরমভাবে সৃষ্টি-সমস্যা আলোচনা করেন নাই। কি গভীর তাঁহার দৃষ্টি, কি অগাধ তাঁহার পাণ্ডিত্য, কি অদ্ভুত তাঁহার মনীষা—ভাবিলে অবাক হইতে হয়।

তিনি দুরূহ দার্শনিক তত্ত্বগুলির যে বিশদ আলোচনা করিয়াছেন, তাহা যেমন সরল তেমনি আধুনিক কালের উপযোগী। তাঁহার আলোচনার যুক্তিমত্তায় বিমুগ্ধ হইতে হয়। তিনি বিশেষভাবে জড়-বাদের আলোচনা করিয়াছেন, কারণ আধুনিক যুগে জড়বাদের আকর্ষণ বিশ্বব্যাপী বলিলেও চলে। আদর্শবাদী দার্শনিকের মত তিনি জড়-বাদকে উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করেন নাই, তাহার স্বরূপ নির্ণয় করিয়াছেন—বুঝাইয়াছেন যে, জড়ও ব্রহ্মের রূপ—জড়ের মধ্যেও ব্রহ্মচৈতন্য প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। তিনি অকাট্য যুক্তি দ্বারা দেখাইয়াছেন যে, জগৎকে স্বপ্ন, মায়া বলিয়া উড়াইয়া দিলেই বিশ্ব-সমস্যার সমাধান হয় না—আমাদের চোখে যেরূপ জগৎ প্রতীয়মান হয় তাহাও ব্রহ্ম-সত্তার অন্তর্ভুক্ত; আমরা যে চেতনায় উহা দেখি তাহা খণ্ড ও অপূর্ণ বটে, কিন্তু মিথ্যা নয়। ব্রহ্মের সর্ব্বব্যাপীত্ব মানিলে, দার্শনিক যুক্তিতেও দৃশ্যজগতের সহিত তাঁহার প্রকৃত সম্বন্ধ নির্ণয় করা ছাড়া উপায় নাই।

জড়বাদী বৈজ্ঞানিকও উপলব্ধি করিয়াছেন যে, যাহাকে আমরা জড় বলি তাহা শক্তিরই রূপ। কিন্তু বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টি সাধারণতঃ জড়শক্তিতেই আবদ্ধ; তিনি উহার গতিভঙ্গী নির্ণয়ে আগ্রহান্বিত। তিনি এই শক্তির সহিত প্রাণশক্তির ও মনঃশক্তির সম্বন্ধ নির্ণয়ে কুতূহলী নহেন। এই কারণেই বৈজ্ঞানিকের জগৎ বিচ্ছিন্ন জগৎ—তিনি জগৎকে নানা ভাগে বিভক্ত করিয়া প্রত্যেকটি বিশ্লেষণ করিতে উন্মুখ; তাহাদের পারস্পরিক সম্বন্ধ নির্ণয়ে খুব কম বৈজ্ঞানিকই আগ্রহান্বিত। বিশ্লেষণ দ্বারা জ্ঞানলাভই তাঁহার লক্ষ্য। মায়াবাদী দার্শনিকের জগৎও বিচ্ছিন্ন জগৎ, কারণ তিনি দৃশ্যজগৎকে আমল দেন না, ইহা তাঁহার নিকট মায়া, স্বপ্ন, অবাস্তব; তাঁহার নিকট একমাত্র সত্য 'অবাঙ্মনসো-গোচরম্' ব্রহ্ম।

জ্ঞানের বিকাশেই ক্রমশঃ প্রতিপন্ন হইতেছে যে, জড়শক্তিই এক-মাত্র শক্তি নহে। অবশ্য আমরা যাহাকে জড়শক্তি বলি তাহা আদৌ উপেক্ষণীয় নহে, তাহা প্রকৃতির একটা খামখেয়াল নহে। তাহাতেও যে চৈতন্যের স্ফুরণ হইয়াছে বিজ্ঞানই তাহা প্রমাণ করে। ধীরে ধীরে, স্তরে স্তরে এই চৈতন্যের উর্দ্ধ্বগতি হইয়াছে, রূপান্তর হইয়াছে। আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু দেখাইয়াছেন যে, যাহাকে আমরা জড় ধাতু বলি তাহাতেও আছে কেমন প্রাণের স্পন্দন, শীততাপের অনুভূতি, আকর্ষণ-প্রত্যাখ্যানের শক্তি। কিন্তু তাহা এত সূক্ষ্ম যে অতি সূক্ষ্ম যন্ত্রেই সে অনুভূতি ধরা পড়ে। আচার্য্য বসু আরও দেখাইয়াছেন যে, এই জড়-চেতনা উদ্ভিদে আরও সম্বিৎ লাভ করিয়াছে—উদ্ভিদের মধ্যে আরও প্রাণের লীলাছন্দ; এমন কি তাহাতে মানসিক বৃত্তির স্ফুরণের আভাস আচার্য্যের আশ্চর্য্য যন্ত্রে ধরা পড়িয়াছে। আচার্য্য বসুর আবিষ্কার যখন প্রথম প্রকাশিত হইল, শ্রীঅরবিন্দ "আর্য্যে"-একটি বিশেষ প্রবন্ধে তাহার মনোরম আলোচনা করিয়াছিলেন, এবং 'দিব্য-জীবনে''ও চৈতন্যের বিবর্ত্তন বুঝাইতে তিনি এই আবিষ্কারের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করিয়াছেন।

এই চৈতন্যই ক্রমশঃ প্রাণীর মধ্যে প্রাণশক্তিরূপে বিকশিত হইয়াছে—জড়ের সুপ্তি কাটাইয়া প্রাণময় অজস্ররূপে বিকাশ পাইয়াছে। ক্রমশঃ ইহা মানসিক শক্তিরূপে সচেতন হইয়াছে—চৈতন্য মানুষের মধ্যে জাগ্রত, সজ্ঞান অবস্থায় আসিয়াছে। মানুষে স্ফুট হইয়াছে আত্মা, ব্যক্তিত্ব। জীবজগতে মানুষই হইতেছে আত্মস্থ, আর নিম্নস্তরের জীব প্রকৃতির ক্রীড়নক। কিন্তু মানুষও কি পূর্ণভাবে আত্মস্থ, প্রভু, বিভু ?—সেও কি খানিকটা প্রকৃতির ক্রীড়নক নহে ? মানুষ যতদিন পূর্ণভাবে আত্মবিকাশ না করিবে, ততদিন বলা চলিবে না যে সে প্রকৃতির দাস নহে। প্রকৃতি মানুষকে যে বৃত্তিগুলি দিয়াছেন, তাহাকে যে অবস্থার মধ্যে সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা দ্বারাই তাহার জীবনের গতি নিয়ন্ত্রিত হয়। এই কারণেই গীতা বলিয়াছেন, 'প্রকৃতিং যান্তি ভূতানি নিগ্রহং কিম করিষ্যসি ?' কিন্তু এমন মানুষও দেখা গিয়াছে যিনি এমন এক স্তরে পৌছিয়াছেন যেখানে প্রকৃতির আর অজ্ঞান আবিলতা অপূর্ণতা নাই—সে স্তরে আছে পূর্ণ জ্ঞান, পূর্ণ আলোক, পূর্ণ শক্তি। চৈতন্যের বিবর্তনেই এই অবস্থা মানুষ পাইতে পারে, এবং যে শক্তি এই বিবর্তন ঘটায় তাহা হইতেছে যোগশক্তি। নিম্নে যে শক্তি অজ্ঞান, উর্দ্ধে তাহাই পূর্ণভাবে আত্মপ্রতিষ্ঠ। প্রকৃতির এই দ্বিত্বের উল্লেখ করিয়া শ্রীভগবান গীতায় বলিয়াছেন, 'দ্বে মে প্রকৃতি'—সাধক উর্দ্ধের প্রকৃতিকে বলিয়াছেন পরা প্রকৃতি।

ব্যবহারিক জীবনে, আপাতদৃষ্টিতে আমরা যেমন সত্তার অখণ্ডতা উপলব্ধি করিতে পারি না, তেমনি চৈতন্যশক্তির লীলাবৈচিত্র্যও আমরা বুঝিতে পারি না। সৃষ্টিতে বিভিন্নরূপের মধ্যে যে অবিচ্ছিন্ন চৈতন্যলীলা চলিয়াছে তাহা আমরা ভুলিয়া যাই। আমরা যদি উর্দ্ধের জ্ঞান লাভ করি, তাহা হইলে আমাদের মনে হয় নিম্নের জ্ঞান অসার, অলীক। আমরা সহজে মানিতে চাহিনা যে, উর্দ্ধে যে শক্তি পূর্ণভাবে সজ্ঞান এবং সক্রিয়, তাহাই নিম্নে, বহির্বিকাশে অজ্ঞান, এবং অবশেষে যেন নিষ্ক্রিয়ভাব ধারণ করিয়াছে। ইহা যে সচ্চিদানন্দের অবতরণ,

বিচিত্রভাবে আত্মবিকাশ তাহা উপলব্ধি করা কি সহজ কথা ? যদি আমরা জ্ঞানীর দৃষ্টি লইয়া বিশ্বরহস্য বুঝিবার চেষ্টা করি তাহা হইলে উপলব্ধি করিতে পারি যে, পূর্ণ চৈতন্যই যেন রূপবিকাশের জন্য, লীলাবৈচিত্র্যের জন্য আপনাকে অজ্ঞানের মধ্যে হারাইয়া ফেলিয়াছেন। কিন্তু বিশ্বের প্রতি অণুতে নিগূঢ়ভাবে রহিয়াছেন সেই সচ্চিদানন্দ—তিনি ত একেবারে আত্মভোলা হইতে পারেন না, ব্যাপক হইলেও ত আত্মার বিচ্যুতি ঘটেনা। তাই আমরা অনুভব করিতে পারি খণ্ডতার পশ্চাতে ভূমা, সীমার মধ্যে অসীমের লীলা—যাহা রবীন্দ্রনাথ সুপরিচিত একটি গানে ব্যক্ত করিয়াছেন, "সীমার মাঝে অসীম তুমি বাজাও আপন সুর।" যোগী, ঋষি, সাধক যখন আনন্দলোকে উত্তীর্ণ হন তখন উপলব্ধি করেন আনন্দময় এই বিশ্ব, আনন্দেই সব কিছু সৃষ্ট হইতেছে, সকলই আনন্দের তরঙ্গ। শুধু আনন্দ কেন, তিনি সমগ্র বিশ্বে অখণ্ড চৈতন্যের বিকাশও দেখেন—কোথাও প্রচ্ছন্ন, কোথাও অর্দ্ধ-বিকশিত, কোথাও পূর্ণবিকশিত।

মানুষ সাধারণতঃ সমস্ত খণ্ডদৃষ্টিতে দেখে বলিয়া বিরোধের সৃষ্টি করে। মানুষ যদি জড়কে আশ্রয় করে তাহা হইলে জড়শক্তি ছাড়া আর কোন শক্তির দিকে তাহার খেয়াল থাকে না। আবার যদি সে পূণ চৈতন্যলাভের আকাঙক্ষা করে তাহা হইলে জড়কে দিতে চাহে উড়াইয়া। কিন্তু মানুষের জীবনই কি শক্তিসমন্বয়ের সাক্ষ্য নয় ? মানুষের মধ্যে রহিয়াছে জড়, প্রাণ ও মনের বিচিত্র বিকাশ। প্রাণ বিকাশ পায় জড়ের বক্ষে, মন বিকশিত হয় জড়ের ক্রোড়ে। প্রাণ বিকাশ পাইয়া জড়ের আধারকে বিনষ্ট করে না ; মন পূর্ণতা পাইতে চাহে জড়ের ক্ষেত্রে, যাহাতে সে জড় ও প্রাণের রস পূর্ণভাবে উপভোগ করিতে পারে। অতিমানসের বিকাশও এই কারণে জড়দেহেই হওয়া সম্ভব।

জড়ের মধ্যে যেমন প্রাণ ও মন প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে, তেমনি অতি-মানসও যে রহিয়াছে, ইহা শ্রীঅরবিন্দ বড় সুন্দরভাবে বুঝাইয়াছেন।

প্রতি অণুতেই আছে অতিমানসের আভাস। ব্রহ্ম শুধু জড়ের আবরণ গ্রহণ করেন নাই, সেই আবরণেই তাঁহার চৈতন্য ও আনন্দ প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। ইহাই ব্রহ্মের বিকাশ-বৈচিত্র্য। কিন্তু এই আবরণ গ্রহণে তাঁহার সত্তার বিকৃতি ঘটে না। তাহা যদি হইত তাহা হইলে বিবর্ত্তন সম্ভব হইত না—মানুষ তাহা হইলে চিরকালই খণ্ড থাকিয়া যাইত ; অখণ্ডতার কল্পনাও করিতে পারিত না। আমরা খণ্ডদৃষ্টির জন্য এই তথ্য ভুলিয়া যাই বলিয়া বাহিরের রূপকে, বিকাশকে সর্ব্বস্ব মনে করি। জড়বাদী হইয়া আমরা প্রাকৃতিক স্থষ্টিতে বুদ্ধির পরিচয় পাই না। পূর্ব্বে জড়বাদী দার্শনিকগণ কি বলিতেন না—যেমন যকৃৎ হইতে পিত্ত নিঃস্থত হয় তেমনি মস্তিষ্ক হইতে নিঃস্থত হয় চিন্তাধারা ?

উর্দ্ধ সত্তা নিম্নসত্তায় আত্মগোপন করিয়াছে—খানিকটা আত্মবিস্মৃত হইয়াছে, কিন্তু চিরতরে আপনাকে হারাইয়া ফেলে নাই। তাই লীলা-বৈচিত্র্যে আবার উর্দ্ধায়ন হয়। শ্রীঅরবিন্দের কথায়, প্রাণস্তর হইতে প্রাণশক্তি বিকশিত হইয়া জড়ে প্রাণের বিকাশ হইল, মনস্তর হইতে মনঃশক্তি বিকশিত হইয়া প্রাণে মনের বিকাশ হইল—এইরূপে স্থষ্টির ক্রমে অতিমানসস্তর হইতে অতিমানস-শক্তি বিকশিত হইয়া মানুষের মনে অতিমানস স্থষ্ট হইবে। ইহাই ব্রহ্মের কর্ত্তৃত্ব-রহস্য। ব্রহ্মের যদি এই কর্ত্তৃত্ব না থাকিত তাহা হইলে বিশ্বেই তিনি নিঃশেষ হইতেন—তাঁহার বিশ্বাতীত সত্তা বা চেতনার হদিস্ পাওয়া যাইত না। সেই সত্তা ও চেতনা না থাকিলে বিশ্ব হইত যন্ত্রবৎ। ব্রহ্মের কর্ত্তৃত্ব না থাকিলে হয়ত তিনি অজ্ঞানতার তমসা হইতে নিজেকে মুক্ত করিতে পারিতেন না। স্থষ্টির পূর্ব্বে তিনি যেমন ছিলেন—

> "ছিল অমা যেদিন অন্ধ—অতল
> গহ্বরে অমার,
> আসীন ছিলেন তিনি তাহার মাঝে
> একক—মহাকায়।"—*

* "Who ?"—দিলীপকুমারের কাব্যানুবাদ।—"অনামী"

তেমনি থাকিতেন। জড়ের মধ্যে, কিংবা শূন্যে, থাকিতেন বিলীন ; বিশ্ববৈচিত্র্য সৃষ্টি হইত না, প্রাণের লীলাভঙ্গী দেখা যাইত না, "মনোময় পুরুষ" মানুষ সৃষ্ট হইত না, মানুষের কল্পলোক সৃষ্ট হইত না, মানুষ পূর্ণতার স্বপ্ন দেখিতে পারিত না। ভগবান সৃষ্টিতে শুধু আত্মবিকাশ করেন নাই, শুধু সৃষ্টিকে ধারণ করিয়া নাই, নিজেই তাহাতে অজস্ররূপে ঐশ্বর্য্য বিকাশ করিতেছেন, বিভূতিলীলা দেখাইতেছেন।

কিন্তু সকল সৃষ্টির উপর যে তাঁহার 'অবাঙ্‌মনসোগোচরম্' সত্তা রহিয়াছে, তাহা উপলব্ধি না করিলেও জ্ঞানের পূর্ণতা হয় না। সব কিছু না থাকিলেও যিনি থাকিবেন, তাঁহার উদ্দেশ্যে শ্রীঅরবিন্দ "The Vedantin Prayer"—বৈদান্তিকের প্রার্থনা—কবিতা লিখিয়াছিলেন :—

"আত্মা মহীয়ান,
হৃদয়ের নীরবতার মাঝে যার স্তব্ধ ধ্যানভূমি,
জ্যোতিঃ অনির্ব্বাণ,
আছ শুধু তুমি !
হায়, তবে অন্ধকার কেন ছায় আমার নয়নে,
মেঘ উঠে ধূমি'
আলোর গগনে ?......
এ রোল বিষম
স্তব্ধ কর—চাহি তব চিরন্তন স্বর শুনিবারে
পিপাসার্ত্তসম।
এ দীপ্ত মায়ায়
দূর কর—অনন্তের তটপ্রান্ত ভারাক্রান্ত করে
যাহা নিজ ভারে।*

* শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র সেনের (ইনি বম্বে হাইকোর্টের জজ)
কাব্যানুবাদ—"অনামী" ৩৮৩-৮৪

সত্যই সেই পরমধাম প্রাপ্ত হইলে মানব-আত্মা আর দ্বন্দ্ব কোলাহল-পূর্ণ, ভেদবুদ্ধিতে বিচ্ছিন্ন পৃথ্বীতে ফিরিয়া আসিতে চাহে না। এই কারণেই তুরীয় অবস্থাপ্রাপ্ত যোগী মানবসমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন থাকেন—তিনি নিজেরই আত্মানন্দে বিভোর! ভগবানের সর্ব্বব্যাপকত্ব এমনি যে, মানুষ (খণ্ড আত্মা) তাঁহাকে যে-ভাবে চায় সেই ভাবেই পায়—মানুষ দেবত্ব লাভ করে, আবার অসুরও আসুরিক শক্তিতে দুর্দ্ধর্ষ হইয়া উঠে। মহাদেবের বরেই না রাবণ বলীয়ান হইয়াছিল! বৃত্রাসুর সম্বন্ধেও স্বয়ং ব্রহ্মা আর্ত্ত দেবগণকে বলিয়াছিলেন, "বিষবৃক্ষোঽপি সম্বর্দ্ধ্য স্বয়মচেছত্তুমসাম্প্রতম্"। আবার সাধনায় মানুষ অক্ষর ব্রহ্মে লীন হইতে পারে—এমন কি মহাশূন্যে—nihilএ বিলীন হওয়া বিচিত্র নহে। সে এক এমন অবস্থা—স্বামী বিবেকানন্দের গানে—"নাহি সূর্য্য, নাহি জ্যোতিঃ, নাহি শশাঙ্ক সুন্দর"!

এই তুরীয় অবস্থার মহিমা উপলব্ধি করিয়াই মায়াবাদী উচ্চকণ্ঠে জগতের অসারত্ব ঘোষণা করিয়াছেন। মানুষের যখন একটা গভীর, নিবিড় অভিজ্ঞতা হয় তখন সে তাহার পূর্ব্ব সংস্কারের মূল্য দিতে চাহে না। তাহার প্রকৃতির আমূল পরিবর্ত্তন হয়। এভারেষ্ট অভিযান-কারী মিঃ স্মাইথ তুষারমণ্ডিত হিমালয়ের অব্যক্তব্য মহিমা ও মৌনতায় এমন অভিভূত হইয়াছিলেন যে, তিনি স্বদেশে ফিরিয়া সঙ্কল্প করেন যে আর লোকালয়ে থাকিবেন না—তিনি স্কটলণ্ডের উত্তরে হেব্রাইডিস দ্বীপের নির্জনতায় আত্মমগ্ন হন।

কিন্তু মানবপ্রেমিক শ্রীঅরবিন্দ কিছুতেই নিজকে জগৎ হইতে বিচ্ছিন্ন করিতে চাহেন নাই। তিনি কিছুতেই মানিতে পারেন নাই যে, জগৎ একটা মায়ামরীচিকা মাত্র। তাঁহার সাধনার, জ্ঞানের ভিত্তি হইল উপনিষদের ঋষির উপলব্ধি 'সর্ব্বম্ খল্বিদম্ ব্রহ্ম'। তাই তিনি সাত বৎসর নিরবচ্ছিন্ন ভাবে "আর্য্যে" পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে আলোচনা করিয়াছেন সৃষ্টি-রহস্য, মানব-রহস্য। তিনি 'অবাঙ্মনসোগোচরম্' সচ্চিদানন্দকে আশ্রয় করিয়া দেখাইয়াছেন যে, সমগ্র সৃষ্টি শুধু তাঁহাতেই

বিধৃত নয়, তিনিই ইহার প্রতি অণুপরমাণু। যুগ যুগ ধরিয়া অক্লান্ত অপরিসীম বিবর্ত্তন দ্বারা তিনিই তাঁহার পূর্ণ স্বরূপ বিকাশ করিতেছেন মানুষের মধ্যে। এই বিবর্ত্তনে মানুষের অহং একটা স্তর মাত্র—কর্তৃত্বের পূর্ব্বাভাস, পূর্ণ সত্তা, পূর্ণ চেতনা উপলব্ধি করিবার পূর্ব্বাবস্থা গূঢ়ভাবে জীব খণ্ড-আত্মা, 'মমৈবাংশঃ' ; যখন স্থষ্টিতে নিজেকে বিকাশ করিয়া, সমগ্রের, পূর্ণের, অখণ্ডের আশ্রয় পায় তখনই ঈশ্বরত্ব লাভ করে। সেই পরম চেতনার উদ্বোধন হইলে খণ্ডের শুধু অন্তরে নয়, বাহিরেও রূপান্তর ঘটে, কারণ তখন বাহির হয় ভিতরেরই পূর্ণ বিকাশ। মানুষ যতদিন মানসিক সংস্কারে আবদ্ধ থাকে ততদিন পূর্ণত্ব উপলব্ধি করিতে পারে না। যদি সে উচ্চাবস্থাও প্রাপ্ত হয়, কিন্তু তাহার সমগ্রের জ্ঞান না জন্মে, তাহা হইলেও সে সমগ্র স্থষ্টি-রহস্য উপলব্ধি করিতে পারে না, স্থষ্টির ক্রমে বিভ্রান্ত হয়। এই কারণেই শ্রীঅরবিন্দ লিখিয়াছেন :

"The incompetent pride of man's mind makes a sharp distinction and wants to call all else untruth and leap at once to the highest truth, whatever it may be—but that is an ambitious and arrogant error.*

(মানুষের অক্ষম মানসিক অহঙ্কার একটা সুতীব্র বিভেদের স্থষ্টি করে এবং যাহাকে সে চরম সত্য মনে করে তাহাতে চট্ করিয়া উঠিতে চায় এবং আর সব কিছুকে বলে অসত্য—কিন্তু ইহা উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও দম্ভপ্রসূত ভ্রম।)

এই কারণেই অনেক সন্ন্যাসী সংসারী জীবমাত্রকে উপেক্ষা করেন, তাচ্ছিল্য করেন ; এবং তাহার প্রতিক্রিয়ায় সংসারী মানুষ বলে, 'আমি অতি দীন, অতি তুচ্ছ, নরকের কীট, আমি কি করিয়া উদ্ধার পাইব? হে মধুসূদন, তোমার চরণে স্থান দাও'—ইত্যাদি। উদ্ধারকর্ত্তা সাজিতেও

* "Lights on Yoga."

লোকের অভাব হয় না। আমাদের দেশের এই মনোভাব দূর করিবার জন্যই স্বামী বিবেকানন্দ মন্ত্র দিয়াছিলেন 'সোঽহম্' এবং বলিয়াছিলেন, "Let the lion of Vedanta roar"—বেদান্তকেশরী আবার গর্জন করুক—যাহাতে প্রতি ব্যক্তি অনুভব করিতে পারে যে সে ঈশ্বরের সহিত একাত্ম।

মানব-সমাজের বিবর্ত্তনে পর্য্যায়ক্রমে প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি এই দুই গতি দেখা যায়। সকল জাতিতেই এই দুই গতির বিকাশ হইয়াছে। কিন্তু এই দুইটি গতির সমন্বয় না হইলে জীবনে সামঞ্জস্য আসে না। মানুষ একান্তভাবে প্রবৃত্তির বশ হইলে তাহার জীবন হয় নিম্নগামী। আবার মানুষ বা সমাজ একান্তভাবে নিবৃত্তিকে আশ্রয় করিলে হয় ইহবিমুখ—তাহাতে সমাজমনে আসে এমন খণ্ডতা যে মানুষ ঐহিক জীবন পূর্ণ করিতে পরাঙমুখ হয়। ফলে মানবজীবন হয় ছন্দহারা, আর ব্যক্তিগত জীবনে সে যতই মুক্তির আস্বাদ লাভ করুক না কেন, সে সৃষ্টির পূর্ণ রস আস্বাদনে বঞ্চিত হয়। এমন কি তাহার মনে হইতে পারে বিশ্বসৃষ্টি বোধ হয় ভগবানের একটা প্রকাণ্ড ভ্রম। অপরপক্ষে, মানুষ যদি সমস্তই ব্রহ্মময় বলিয়া ধারণা করিতে পারে তাহা হইলে তাহার বিশ্বাত্মিকা বুদ্ধির উদয় হয়। একদিকে সে ব্রহ্মের বিশ্বাতীত সত্তা উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইতে পারে, অপর দিকে সৃষ্টির ক্রমে ব্রহ্মের ব্যাপ্তি বুঝিতে পারে। তখন সে উপলব্ধি করে এক অখণ্ড চৈতন্য উর্দ্ধ্ব হইতে নিম্ন পর্য্যন্ত লীলায়িত—উর্দ্ধ্বের শক্তি শুধু নিম্নে প্রতিফলিত নয়, নিম্নে প্রচ্ছন্নভাবে সক্রিয়—নিম্নের রূপান্তরে সহায়ক।

তবু মানুষের মনে প্রশ্ন জাগে, কেন এই পৃথ্বীর এত দুঃখ, বেদনা এত অজ্ঞান, এত অশুভ? মানুষ আদর্শের ঔজ্জ্বল্যে বর্ত্তমানকে ভুলিতে পারে, সে স্বর্গের স্বপ্নে বিভোর থাকিতে পারে, কিন্তু রূঢ় বাস্তবকে সে এড়াইবে কি করিয়া? মানুষ ধৈর্য্য ও তিতিক্ষা দ্বারা কিংবা উদাসীনতা অবলম্বন করিয়া জগতের কঠোরতা সহ্য করে, তবু এই সমস্যার একটা সমাধান না বুঝিলে তাহার মন তৃপ্ত হইবে কেন? সে জিজ্ঞাসা করে,

কেন ও কিরূপে সচ্চিদানন্দ এই অজ্ঞান, নিরানন্দ, অস্থিতির আশ্রয় লইলেন? অখণ্ডতায় খণ্ডতা আসিল কি করিয়া, অসীম সসীম হইল কেন? শ্রীঅরবিন্দ "দিব্য জীবনে" নিজেই এই প্রশ্নগুলি উত্থাপন করিয়াছেন এবং অপূর্ব্ব যৌক্তিকতার সহিত তাহার উত্তর দিয়াছেন। পরে তাঁহার জনৈক মনীষী শিষ্যও এই চিরন্তন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। শ্রীঅরবিন্দ তাহার যে অপূর্ব্ব মীমাংসা করিয়াছেন তাহা "The Riddle of This World" নামক পুস্তকে প্রকাশিত হইয়াছে। জিজ্ঞাসুমাত্রেই তাহা পাঠ করিয়া চমৎকৃত হইবেন।

শ্রীঅরবিন্দ বলেন যে, ব্রহ্মের জগতে বিকাশের কারণ হইতেছে অভিজ্ঞতালাভের প্রেরণা—যেন অজানায় বিবর্ত্তনের অভিজ্ঞতা। যিনি স্বয়ম্ভূ, সনাতন, পূর্ণ, অখণ্ড, অসীম তিনিই খণ্ডতার রস আস্বাদন করিবার জন্য অজ্ঞানের আবরণ লইলেন। এই আবরণ না লইলে অসীম সসীম বলিয়া প্রতীয়মান হইবে কি করিয়া, দেশ, কাল, পাত্রের উদ্ভব হইবে কি করিয়া? কিন্তু আবরণ একটা নয়, চেতনার উপর স্তরে স্তরে আবরণ সৃষ্ট হইয়া চেতনার রূপান্তর ঘটিল; পূর্ণ-চেতনা খণ্ড-চেতনায়—কাল ও ক্ষেত্রের চেতনায় পরিণত হইল। এইরূপে ক্রমশঃ যাহা ছিল সূক্ষ্ম তাহা স্থূলে পরিণত হইল, ব্রহ্মের বহির্বিকাশ ঘটিল।

এইরূপে পরম চৈতন্য খণ্ড চৈতন্য বিকাশ করিয়া যেন তাহার রসাস্বাদনে মগ্ন রহিলেন। কিন্তু অবতরণ, বিকাশ যদি সুরু হইল তাহার সীমা কোথায় পাওয়া যাইবে, কে তাহার পূর্ণচ্ছেদ নিরূপণ করিবে? কে বলিবে 'thus far and no farther'? ব্রহ্ম অসীম, তাঁহার বিকাশও অসীম, অনন্ত। পূর্ণ-চেতনা রূপান্তরিত হইল আংশিক চেতনায়, অবচেতনায় এবং অবশেষে অচেতনে, অজ্ঞানে। কিন্তু অচেতনের মধ্যেও চেতনা সুপ্ত, প্রচ্ছন্ন। আধুনিক বৈজ্ঞানিক পরমাণুর বিশ্লেষণে সন্ধান পাইয়াছেন এক অদ্ভুত অবস্থার—যাহার স্থিতি, নিয়মকানুন নাই। সেখানে চলিয়াছে যেন অণুর অবিশ্রান্ত নৃত্য। ইহা হইতেছে যেন জড়ে অসীমতা, অন্তহীন গতি, অজস্র

রূপসৃষ্টি, অপরিমেয় শক্তি—যাহা প্রলয় ঘটাইতে পারে, যেমন আমরা আণবিক বোমায় দেখিয়াছি। বিশ্বাতীত অবস্থায় ব্রহ্মের অন্ত নাই—বিশ্ব-বিকাশেও অন্ত নাই!

আবার এই সুপ্ত, প্রচ্ছন্ন চেতনা উর্দ্ধ বিবর্ত্তনে কিরূপে প্রাণ-চেতনা ও মনঃ-চেতনায় বিকশিত হয় তাহার পরিচয়ও আমরা পাইয়াছি। আজও এই রূপান্তরের রহস্য সম্যক্ পরিস্ফুট হয় নাই, এখনও ইহা বৈজ্ঞানিকের গবেষণার বিষয়। তবে জড় হইতে কেমন করিয়া প্রাণের স্ফুরণ হয় তাহা বৈজ্ঞানিক প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। এই রূপান্তর-সন্ধিতেও রূপের কত বৈচিত্র্য! সুপ্ত জড়ে কিরূপ অলক্ষ্যে প্রাণের স্পন্দন ফুটিয়া উঠে, প্রাণের লীলায় কেমন করিয়া মনের আলোক পড়ে, ইহা আরও বিচিত্র ও বিস্ময়কর। অবশেষে বুদ্ধির পূর্ণোদয় হয়, জড়-জগতে জ্ঞানের আলোক ফুটিয়া উঠে, মানুষের আত্মা পরিস্ফুট হয়।

ব্রহ্মের এই অজানা অভিযানের প্রতীক মানুষ। একদিকে মানুষ প্রাকৃতিক প্রেরণায় জীবধর্ম্ম পালন করিতেছে, তাহার সংসার, পরিবার, সমাজ, জাতি গড়িয়াছে—অপরদিকে সে অজানার সন্ধানে, জ্ঞানের সন্ধানে, রসের সন্ধানে প্রাকৃতিক জীবনকে উপেক্ষা করিয়াছে। যদি ঐহিক সুখস্বাচ্ছন্দ্য মানুষের একমাত্র কাম্য হইত, তাহা হইলে জ্ঞান-পিপাসায়, অজানার অভিজ্ঞতার জন্য দুর্গম গিরিকান্তারের রহস্য সন্ধানে সে ধাবিত হইত না। এই সন্ধানের সীমা কোথায়? একদিকে জড়ের, প্রাণের, বহিঃপ্রকৃতির রহস্য সন্ধানে কত মনীষী, কত বৈজ্ঞানিক জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন; অপরদিকে মানবচেতনা, মানব সত্তার, বিশ্বাত্মার, ভগবানের সন্ধানে কত যোগী, ঋষি, সাধু, সন্ন্যাসী দার্শনিক, পণ্ডিত ব্যবহারিক জীবনকে উপেক্ষা করিয়াছেন। জীবন-রহস্য জানিবার জন্য মানুষের কি আকুল আগ্রহ! ব্যবহারিক বিজ্ঞানের যুগেও কত বৈজ্ঞানিক চেতনার বিশ্লেষণে—চেতনা, অবচেতন, অচেতন কি তাহার সন্ধানে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। মানুষের জ্ঞানপিপাসার তৃপ্তি নাই, রহস্য সন্ধানের অন্ত নাই।

এই সন্ধানীবুদ্ধিই মানব-সভ্যতার পরিচায়ক। এই বুদ্ধির ফলেই মানুষ প্রকৃতির গূঢ় রহস্যগুলি আয়ত্ত করিতেছে এবং জীবনকে সমৃদ্ধ ও শক্তিমান করিতে পারিয়াছে—জীবনের বৈচিত্র্য ঘটাইতে পারিয়াছে। কিন্তু মানুষ ইহাতেও তৃপ্ত থাকিতে পারে নাই, বিশ্বের রহস্য আয়ত্ত না করিলে তাহার জ্ঞান পূর্ণ হইবে কি করিয়া ? তাই সভ্যতার বিকাশ হইতেই মানুষ ঊর্দ্ধের সন্ধান করিয়াছে, খুঁজিয়াছে শক্তি, শান্তি, আনন্দ, পরিপূর্ণতার উৎস। সে পরম চেতনার সন্ধান পাইয়াছে, পরিচয় পাইয়াছে পরমাত্মার। সে এই চেতনার সহিত যুক্ত হইবার উপায় পাইয়াছে—তাহার হৃদয়ে জাগিয়াছে ভগবৎপ্রেম ও ভক্তি। ইহা তাহাকে জ্ঞান দিয়াছে সূক্ষ্মের, কারণের ; বুদ্ধি দিয়াছে অতীন্দ্রিয়ের—তাহাকে অবহিত করিয়াছে শুধু জাগ্রত চেতনায় নয়, সন্ধান দিয়াছে স্বপ্ন ও সুষুপ্তির। ইহাই খণ্ড জীবকে অখণ্ডতার ধারণা দিয়াছে, সীমার মধ্যে দিয়াছে অসীমের আভাস, অপূর্ণতাকে দিয়াছে পূর্ণ হইবার কৌশল—মানুষকে পথ দেখাইয়াছে ভগবানকে পাইবার।

এইরূপেই, যে পূর্ণ চেতনা নিজকে আবরিত করিয়াছিলেন অবচেতনা ও অচেতনার মধ্যে তিনিই আবার বিভিন্ন স্তরের মধ্য দিয়া আত্মমুক্তির সন্ধান পাইয়াছেন। ইহাকেই শ্রীঅরবিন্দ বলিয়াছেন double ladder of consciousness—চেতনা অবতরণ করিতেছে ও আরোহণ করিতেছে। ভগবান খণ্ডের, সীমার মধ্যে আত্মবিকাশ করিয়া, তাহার রসাস্বাদন করিয়া, লীলাবৈচিত্র্য ঘটাইয়া, অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া, আবার অখণ্ডতা, অসীমতা ও অনন্তের মহিমা জাগাইতেছেন খণ্ডের, অর্থাৎ মানুষের আধারে। নিম্ন চেতনার রূপান্তর করা, নিম্নের উপর ঊর্দ্ধের আলোকপাত করাই হইতেছে তাঁহার ঐহিক মহিমা।

বীজের মধ্যে যেমন ভাবী বৃক্ষ নিহিত থাকে, তেমনি বিশ্বসৃষ্টির মধ্যে সেই সনাতন আত্মা নিহিত। দেশ ও কাল অনুসারে যেমন বৃক্ষের বিবর্ত্তন হয়, তেমনি বিশ্বসৃষ্টির বিভিন্ন অবস্থার মধ্য দিয়া আত্মার বিকাশ।

মানুষই হইতেছে এই ঊর্দ্ধ বিবর্ত্তনের কেন্দ্র, এই কারণেই শ্রীভগবান বলিয়াছেন মানবাত্মা 'মমৈবাংশঃ'। মানুষের মধ্যেই ঊর্দ্ধ ও নিম্নের সমন্বয়ের সম্ভাবনা। যেমন নিম্নপ্রকৃতির বিবর্ত্তনের প্রতীক মানুষ, তেমনি তাহার বুদ্ধিতে ও হৃদয়ে পরিস্ফুট হয় ঊর্দ্ধ প্রকৃতি, পরম চেতনা। এই কারণেই জাগতিক অবস্থা মানুষকে একেবারে অভিভূত করিতে পারে না—সে জীবনের বিড়ম্বনার মধ্যেও আত্মার জয়গান করিতে পারে।

সপ্তদশ অধ্যায়

তপস্যা-সৃষ্ট জগৎ

ব্রহ্মের সৃষ্টিতে আত্মবিকাশের প্রেরণা বিষয়ে পূর্ব্ব অধ্যায়ে যে আলোচনা করা হইয়াছে, শ্রীঅরবিন্দ "The Riddle of This World"এ সে সম্বন্ধে দার্শনিকের ভঙ্গীতে শিষ্যের প্রশ্নের জবাব দিয়াছেন। কিন্তু তাহার বহুপূর্ব্বে তিনি এ সম্বন্ধে "দিব্য জীবনে" যেরূপ বিশদভাবে আলোচনা করিয়াছিলেন তাহা তাঁহার গভীরতর জ্ঞান ও উপলব্ধির পরিচায়ক। তত্ত্বানুসন্ধিৎসু পাঠক যদি "দিব্য-জীবনে"র উপরোক্ত বিষয়ক অধ্যায়টি পাঠ করেন তাহা হইলে চমৎকৃত হইবেন।

শ্রীঅরবিন্দ ব্রহ্মের স্বরূপ নির্ণয় এবং সৃষ্টিতে তাঁহার বিকাশ-মহিমা আলোচনা করিয়া, জ্ঞানের মধ্যে কিরূপে অজ্ঞান আসিল, এই সমস্যার সমাধান করিয়াছেন—দেখাইয়াছেন, অজ্ঞানের কি কারণ—এমন কি সার্থকতা। স্বল্পকথায় এ সম্বন্ধে এইটুকু আভাস দেওয়া যায় : ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দ অবস্থায় সৎ, চিৎ ও আনন্দ ; ত্রয়ী ওতপ্রোতভাবে বিজড়িত ; সে অবস্থায় কোন বিভেদ বা বিচ্ছিন্নতার আভাস নাই—তাহাতে সৃষ্টি ও সৃষ্টির অতীত অবস্থা সমভাবে বিধৃত। ব্রহ্মই সর্ব্বময়, বিরাট। তিনিই সৃষ্টির প্রতি অণুতে রহিয়াছেন। তাঁহার চেতনায় একাধারে একত্ব ও বহুত্ব। বহু হইয়াও তিনি একত্বের চেতনা হারান না। কিন্তু নিছক একত্বের চেতনায় বিকাশের ভঙ্গিমা থাকিতে পারে না ; তাই বহুধা বিকাশেই উদ্ভব হয় বহুপ্রকার সম্ভাবনা, বৈচিত্র্য, একত্বের মধ্যেই বহুবিধ সম্বন্ধ।* শ্রীঅরবিন্দ বলিয়াছেন দিব্যের

* But wherever there is anything of the nature of cosmic existence, there must be a play of relations and some principle of determination of relation.—*Life Divine*.

অতিমানস-চেতনা, supermind, এই সম্বন্ধ নির্ণয় করে। অতিমানস-শক্তিতেই একত্ব বহুত্বে অভিব্যক্তি পায়, কিন্তু ঐক্যের চেতনা হইতে ভ্রষ্ট হয় না। নিগূঢ়ভাবে অতিমানসই স্রষ্টা ; কিন্তু অতিমানসের স্বষ্টি স্বপ্নমাত্র নহে। শ্রীঅরবিন্দ বলিয়াছেন, "It is not an unsubstantial phantasmagoric idea creating mere appearances; it is being creating real terms of being"—স্বষ্টি একটা ছায়াবাজি মাত্র নহে ; ব্রহ্মের সত্তায়ই স্বষ্টি—বাস্তবেই বাস্তব স্বষ্টি হইতেছে।

স্বষ্টির ক্রমে পূর্ণ চেতনা হইতে উদ্ভূত হয় বিভিন্ন খণ্ড চেতনা—মন, প্রাণ, জড়। উহারা কিন্তু বাস্তবে খণ্ড নয়, একই চেতনার বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন রূপান্তর। অতিমানস-চেতনায় এই বিভিন্নতা বিভিন্নতা বলিয়াই মনে হয় না, প্রতীয়মান হয় একেরই লীলাবৈচিত্র্য। কিন্তু প্রত্যেক স্তরে বিকাশের পূর্ণতা উপলব্ধি করিবার জন্য একত্বের, অসীমতার ধারণা বিলীনপ্রায় হয়। ফলে উদ্ভব হয় খণ্ড চেতনার, খণ্ড জ্ঞানের—এবং খণ্ডতায় অবশেষে উদয় হয় ভেদবুদ্ধি। এই খণ্ডতা না হইলে মন, প্রাণ বা জড়ের স্থিতি হইত না, তাহাদের স্ব স্ব ক্ষেত্র স্বষ্ট হইত না—আমরা মনোজগৎ প্রাণজগৎ বা জড়জগৎ উপলব্ধি করিতে পারিতাম না, আমরাও ব্যক্তি হিসাবে স্বষ্ট হইতাম না। একে বহুর সম্বন্ধ স্বষ্টির জন্যই বিভিন্ন জগতের স্বষ্টি হইয়াছে। তাই শ্রীঅরবিন্দ বলিয়াছেন,—"It is on the play of these potentialities that the mental, vital and material worlds are founded."

পরমচেতনার বিশেষ অভিজ্ঞার জন্য এইরূপ একমুখিতা হইতেছে খণ্ডচেতনা স্বষ্টির কারণ। সর্ব্বব্যাপক চেতনা যখন বিশেষ সম্বিৎ-ভঙ্গীতে বিকাশ হন তখনই স্বষ্ট হয় বিশেষ বিশেষ চৈতন্য-জগৎ। ইহা হইতেছে ব্রহ্মের তপস্যার ফল। তপস্যা হইতেছে চৈতন্যের একমুখিতা। ব্রহ্মের তপঃশক্তিতেই বিশ্ব ও বিভিন্ন জগৎ স্বষ্ট

হইয়াছে।* পুরাণে বর্ণিত ব্রহ্মা বা অন্যান্য দেবতাদিগের তপস্যা-কাহিনীর একটা দার্শনিক ভিত্তি আছে, তাহা নিছক কল্পনা নহে। মানুষও যখন তপস্যা করে তখন তাহার সমগ্র চেতনা ও সত্তা একটি বিশেষ লক্ষ্যকে আশ্রয় করে। এমন কি অসুরের আসুরিক শক্তিও যে তপস্যায় বর্দ্ধিত হয় তাহার বহু কাহিনী আমরা জানি।

ব্রহ্মের তপঃশক্তিতে তাঁহার বিরাট অখণ্ড চেতনায় ভাসিয়া উঠে অসংখ্য জগৎ। সুতরাং প্রতিটি জগৎ এক অখণ্ড চৈতন্যের বিশেষ প্রকাশভঙ্গী; এবং প্রতিটির হয় বিশেষ রূপ, বিশেষ প্রকৃতি। কিন্তু সেই প্রকাশভঙ্গী তখন আর অখণ্ড নয়, বৈশিষ্ট্যের জন্য খণ্ড। তখন তাহাতে আর পূর্ণচেতনার আলোক প্রকট থাকে না; অজ্ঞান-আবরণের একটা ছায়া পড়ে। সৃষ্টিতে তাই দেখি আলো-আঁধারের খেলা; স্মৃতি-বিস্মৃতির লীলা—জ্ঞান-অজ্ঞানের দ্বন্দ্ব।

এই খণ্ড-জ্ঞান, অজ্ঞানের জন্যই, আমরা দেহধারী বলিয়া আমাদের দেহসর্ব্বস্ব বুদ্ধি হয়। আবার যখন আমরা প্রাণের উচ্ছ্বাসে আপ্লুত হই তখন ক্ষণিকের তরে আমাদের দেহের চেতনা থাকে না; যেমন যুদ্ধক্ষেত্রে রণোন্মাদনায় সৈনিক দৈহিক বিপদকে করে তুচ্ছ, আঘাতকে করে উপেক্ষা। মানসিক ভাববিশেষেও আমরা জগৎ-সংসার ভুলিতে পারি, কল্পলোকের সৃষ্টি করিতে পারি; তপস্যা দ্বারাই আমরা পরিচয় পাইতে পারি বিভিন্ন জগতের।

এই খণ্ড-জ্ঞানের জন্য অনেক সময়ে আমাদের জীবন মনে হয় আনন্দহীন। দারুণ দুঃখে আমাদের মনে হয় যেন সব থাকিয়াও কিছুই নাই। জীবন থাকিতেও মানসিক শক্তির অভাবে বা বিকৃতিতে মানুষ হয় উন্মত্তবৎ; চেতনা, আনন্দ ও বুদ্ধির অভাবে/সে হইতে

---

* By what power then is this (unity) ignored in our phenomenal consciousness? It is by the development of a power in conscious being, its power of dwelling in its idea of being, its act of being: this is its creative power—Tapas. —*Life Divine*

পারে জড়বৎ। মানুষের চেতনারই কতই না বিভিন্ন বিকাশ, কত ভঙ্গী, কত বিচিত্র অনুভূতি, যে বিষয়ে আজ আধুনিক মনোবিজ্ঞান অনুসন্ধিৎসু হইয়াছে।

অখণ্ড, পূর্ণচেতনা বহুধা একমুখিতায় সৃষ্টির নানাস্তরে নানাভাবে বিকশিত হইয়া অবশেষে যেন অবলুপ্ত হয় অচেতনায়—-আত্মা হন যেন আত্মবিস্মৃত! এই আত্মবিস্মৃতিই জড়ের প্রকৃতি। কিন্তু আত্ম-বিস্মৃতিই ত শেষ কথা নয়— ইহা যদি শেষ, কিংবা আদিম বা মূল হইত, তাহা হইলে পৃথিবী থাকিত একটা জড়পিণ্ড, তাহাতে জীবন-লীলার পরিচয় পাওয়া যাইত না। গূঢ় রহস্য এই যে, চরম স্তরে পুঞ্জীভূত রহিয়াছে অবরোহণের সকল ধাপগুলিই। অর্থাৎ জড়েই লুক্কায়িত রহিয়াছে প্রাণ, মন—এমন কি অতিমানস পর্য্যন্ত। বিবর্ত্তন-শক্তির দ্বারা এইগুলি ক্রমশঃ পুনঃ-প্রকাশিত হইতে থাকে। তাই দেখা যায় পৃথিবী সৃষ্ট হইবার পর ধীরে ধীরে চেতনার স্ফুরণ হইতে লাগিল এবং সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন রূপ, আধার সৃষ্ট হইতে লাগিল। চেতনার উর্দ্ধ হইতে নিম্নের অভিযান সারা হইলে সুরু হইল উর্দ্ধগতি; আরম্ভ হইল ধরার বিবর্ত্তন; ফুটিয়া উঠিতে লাগিল জড়জগতে প্রাণ-জগৎ, মনোজগৎ; অবশেষে মানবাত্মা স্বপ্ন দেখিল উর্দ্ধ জগতের, মহান্ আত্মার, পূর্ণ-চেতনার। যে চৈতন্য-শক্তি অচেতনায় অবগাহন করিয়াছিল, তাহাই লীলায়িত হইল উর্দ্ধে, মূর্ত্ত হইল মানবচেতনায় আরও উর্দ্ধের আস্পৃহায়। জড়ের নিশ্চলতায়, স্থিতিতে বিকাশ পাইয়াছিলেন সৎ; চিৎ হইয়াছিলেন তন্দ্রাভিভূত—সৎ আবার চিৎ-শক্তিতে বিকশিত হইলেন প্রাণে, জীবনে, মনে। সৃষ্টিতে আনন্দের আভাস জাগিল—মানবহৃদয়ে পরিস্ফুট হইল আনন্দময় সত্তার—-উপনিষদের ঋষি উপলব্ধি করিলেন, 'সবই আনন্দে সৃষ্ট, আনন্দে বিধৃত, আনন্দেই সবার গতি।'

আনন্দই সব, কিন্তু খণ্ড-আনন্দে মানুষ তৃপ্ত থাকিবে কি করিয়া? মানুষ তাই স্বপ্ন দেখে পূর্ণ অবিনশ্বর আনন্দের, আস্বাদ করিতে চায়

অখণ্ড আনন্দের, যুক্ত হইতে চায় আনন্দময় সত্তার সহিত। জড়ের যে আনন্দ তাহা প্রচ্ছন্ন—সজ্ঞান নহে। প্রাণের আনন্দ পরিস্ফুট কিন্তু পূর্ণভাবে সচেতন নহে। মনের আনন্দ সচেতন, কিন্তু চঞ্চল। এই চাঞ্চল্য কিসের জন্য? নিরবচ্ছিন্ন আনন্দলাভের জন্য নয় কি? মানুষ যাহা কিছু করে তাহা এই আনন্দলাভের জন্য। এমন কি মানুষ যে আনন্দ অস্বীকার করিয়া দুঃখকে বরণ করে, তাহারও প্রচ্ছন্ন কারণ এক নিগূঢ় আনন্দের প্রেরণা। শুধু মানুষ যখন অসহায়ভাবে দুঃখ ভোগ করে, আত্মকর্তৃত্ব হারাইয়া ফেলে তখনই তাহার নিরানন্দ—অকৃতকার্য্যতা কিংবা আশাভঙ্গের জন্য।

মানুষের শত সহস্র কামনা ও বাসনা এই আনন্দলাভের জন্য ধাবিত। প্রাণের ক্ষেত্রে কামনা হইতেছে এই আনন্দময় সত্তার স্ফুরণ। অবশ্য মনই কামনার উৎস—তাই মানুষের নিম্নস্তরের কোন প্রাণীর কামনা পরিস্ফুট নয়। কিন্তু মানুষের সব কামনা ত পূর্ণ হয় না; তাহারা অধিকাংশক্ষেত্রে মানুষকে করে বিভ্রান্ত—জানাইয়া দেয় ইহাতে পূর্ণ আনন্দ নাই। কামনা অন্ধভাবে ধাবিত, তাহার পূর্ণতা লাভ করিবার সামর্থ্য নাই। ইন্দ্রিয়গুলি চঞ্চল, তাহারা নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ দিতে পারে না। তাই আনন্দকে ধারণ করিবার জন্য চাই চেতনার বিবর্ত্তন, আনন্দে স্থিতি লাভ করিতে হইলে আশ্রয় লইতে হইবে আনন্দময়ের, কারণ অজ্ঞানে আমরা ইন্দ্রিয়-গত খণ্ড-আনন্দ লাভ করিতে পারি মাত্র।

আবার মানুষের অক্ষমতা জানাইয়া দেয় যে, তাহার ইচ্ছা ও শক্তি সীমাবদ্ধ। একদিকে মানুষ শক্তিমান; তাহার দেহের শক্তি, প্রাণ-শক্তি ও সর্ব্বোপরি মন ও বুদ্ধির শক্তি তাহাকে সৃষ্ট জীবের মধ্যে শক্তি-সম্পন্ন করিয়াছে; কিন্তু সে যদৃচ্ছাচরণ করিতে পারে না। তাহার শক্তি সীমাবদ্ধ। দৈহিক ব্যাপারে সে প্রাকৃতিক শক্তির নিকট অসহায়। তাহার মৃত্যুর দ্বার অসংখ্য। জরা ও ব্যাধির নিকট সে অসহায়। অবশ্য সে মানসিক শক্তিদ্বারা অনেকাংশে প্রকৃতির উপর কর্ত্তৃত্ব লাভ করিয়াছে, কিন্তু চক্ষুর অগোচর বীজাণু নিমেষের মধ্যে তাহাকে ধ্বংস

করিতে পারে। আর কতই না নূতন রোগ আবিষ্কৃত হইতেছে! তবু মানুষ শক্তিকাঙক্ষী। শক্তির দ্বারা সে যে অঘটনও ঘটায়। মানুষের এই ইচ্ছা-শক্তি ব্রহ্মের চিৎ-শক্তিরই পরিচায়ক। ব্রহ্মের চিৎ-শক্তি অপরিমেয়; তাঁহার চিৎ-শক্তির তপঃপ্রভাবেই জগৎ সৃষ্ট। মানুষের মধ্যেও এই শক্তি খণ্ডভাবে লীলায়িত। কিন্তু মানুষ তপস্যা দ্বারা চিৎ-শক্তির অদ্ভুত বিকাশ করিতে পারে, অপরিমেয় শক্তি লাভ করিতে পারে। এমন কি মানুষ তপস্যা, একাগ্র সাধনা দ্বারা জড়সৃষ্টির খানিকটা বৈচিত্র্য ঘটাইয়াছে। জ্ঞানও তাহার অপরিমেয় হইয়া উঠিতেছে—সে শুধু আধ্যাত্মিক জ্ঞান নয়, ঐহিক জ্ঞানও।

ব্রহ্মের চিৎ-শক্তি অখণ্ড, এবং সৎ ও আনন্দের সহিত ওতপ্রোত-ভাবে জড়িত বলিয়া পূর্ণ, স্বয়ংসিদ্ধ, অঘটনঘটনপটীয়সী। সৃষ্টিতেই তাহা খণ্ড, মানুষের মধ্যে সীমাবদ্ধ। তাই মানুষের পূর্ণতালাভের জন্য এত আকুলতা, শক্তির বিকাশে এত আগ্রহ। মানুষের দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ শক্তি-বিকাশের প্রাথমিক উপায়। সৃষ্টির বিকাশে—যেমন পূর্ণ-সত্তা খণ্ড-সত্তায়, অবশেষে অণুতে পরিণত হন, তেমনি শক্তিও খণ্ড আধারে দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষের কারণ ঘটায়। দ্বন্দ্বের উদ্দেশ্য আত্মকর্তৃত্ব স্থাপন করা; তাই সৃষ্টির নিম্নস্তরে জীব জীবকে গ্রাস করিয়া বর্দ্ধিত হয়।

সৃষ্টির ঊর্দ্ধ্বগতিতে এই দ্বন্দ্ব ও সংঘর্ষ শুধু নিছক জীবনধারণের জন্য নহে, তাহার বিভিন্ন কারণ—যেমন স্বীয় ভোগসুখের বাসনা, আত্মপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা—উপস্থিত হয়। এই সকল কারণেই মানুষ আদিম কাল হইতে কত যুদ্ধবিগ্রহ করিয়াছে, কত রক্তপাত করিয়াছে! মানুষের মানসিক উৎকর্ষলাভের পর উচ্চ অবস্থায় সংঘর্ষের কারণ আদর্শগত। আদর্শের জন্যও মানুষ কম রক্তপাত করে নাই—এখনও করিতেছে। লৌকিক ধর্ম্মপ্রতিষ্ঠার জন্য মানুষ কত যুদ্ধ করিয়াছে—তথাকথিত ঈশ্বরের রাজ্যস্থাপনার জন্য বর্ব্বরতার পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছে। মানুষের ইতিহাসের এই অধ্যায় এখনও সমাপ্ত হয় নাই। ধর্ম্মের জন্য পূর্ব্বে বহু দেশে বহু যুদ্ধ হইয়াছে, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কারণে এই শতাব্দীতে

অখণ্ড আনন্দের, যুক্ত হইতে চায় আনন্দময় সত্তার সহিত। জড়ের যে আনন্দ তাহা প্রচ্ছন্ন—সজ্ঞান নহে। প্রাণের আনন্দ পরিস্ফুট কিন্তু পূর্ণভাবে সচেতন নহে। মনের আনন্দ সচেতন, কিন্তু চঞ্চল। এই চাঞ্চল্য কিসের জন্য? নিরবচ্ছিন্ন আনন্দলাভের জন্য নয় কি? মানুষ যাহা কিছু করে তাহা এই আনন্দলাভের জন্য। এমন কি মানুষ যে আনন্দ অস্বীকার করিয়া দুঃখকে বরণ করে, তাহারও প্রচ্ছন্ন কারণ এক নিগূঢ় আনন্দের প্রেরণা। শুধু মানুষ যখন অসহায়ভাবে দুঃখ ভোগ করে, আত্মকর্তৃত্ব হারাইয়া ফেলে তখনই তাহার নিরানন্দ—অকৃতকার্য্যতা কিংবা আশাভঙ্গের জন্য।

মানুষের শত সহস্র কামনা ও বাসনা এই আনন্দলাভের জন্য ধাবিত। প্রাণের ক্ষেত্রে কামনা হইতেছে এই আনন্দময় সত্তার স্ফুরণ। অবশ্য মনই কামনার উৎস—তাই মানুষের নিম্নস্তরের কোন প্রাণীর কামনা পরিস্ফুট নয়। কিন্তু মানুষের সব কামনা ত পূর্ণ হয় না; তাহারা অধিকাংশক্ষেত্রে মানুষকে করে বিভ্রান্ত—জানাইয়া দেয় ইহাতে পূর্ণ আনন্দ নাই। কামনা অন্ধভাবে ধাবিত, তাহার পূর্ণতা লাভ করিবার সামর্থ্য নাই। ইন্দ্রিয়গুলি চঞ্চল, তাহারা নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ দিতে পারে না। তাই আনন্দকে ধারণ করিবার জন্য চাই চেতনার বিবর্ত্তন, আনন্দে স্থিতি লাভ করিতে হইলে আশ্রয় লইতে হইবে আনন্দময়ের, কারণ অজ্ঞানে আমরা ইন্দ্রিয়-গত খণ্ড-আনন্দ লাভ করিতে পারি মাত্র।

আবার মানুষের অক্ষমতা জানাইয়া দেয় যে, তাহার ইচ্ছা ও শক্তি সীমাবদ্ধ। একদিকে মানুষ শক্তিমান; তাহার দেহের শক্তি, প্রাণ-শক্তি ও সর্ব্বোপরি মন ও বুদ্ধির শক্তি তাহাকে সৃষ্ট জীবের মধ্যে শক্তি-সম্পন্ন করিয়াছে; কিন্তু সে যদৃচ্ছাচরণ করিতে পারে না। তাহার শক্তি সীমাবদ্ধ। দৈহিক ব্যাপারে সে প্রাকৃতিক শক্তির নিকট অসহায়। তাহার মৃত্যুর দ্বার অসংখ্য। জরা ও ব্যাধির নিকট সে অসহায়। অবশ্য সে মানসিক শক্তিদ্বারা অনেকাংশে প্রকৃতির উপর কর্তৃত্ব লাভ করিয়াছে, কিন্তু চক্ষুর অগোচর বীজাণু নিমেষের মধ্যে তাহাকে ধ্বংস

করিতে পারে। আর কতই না নূতন রোগ আবিষ্কৃত হইতেছে! তবু মানুষ শক্তিকাঙক্ষী। শক্তির দ্বারা সে যে অঘটনও ঘটায়। মানুষের এই ইচ্ছা-শক্তি ব্রহ্মের চিৎ-শক্তিরই পরিচায়ক। ব্রহ্মের চিৎ-শক্তি অপরিমেয়; তাঁহার চিৎ-শক্তির তপঃপ্রভাবেই জগৎ সৃষ্ট। মানুষের মধ্যেও এই শক্তি খণ্ডভাবে লীলায়িত। কিন্তু মানুষ তপস্যা দ্বারা চিৎ-শক্তির অদ্ভুত বিকাশ করিতে পারে, অপরিমেয় শক্তি লাভ করিতে পারে। এমন কি মানুষ তপস্যা, একাগ্র সাধনা দ্বারা জড়সৃষ্টির খানিকটা বৈচিত্র্য ঘটাইয়াছে। জ্ঞানও তাহার অপরিমেয় হইয়া উঠিতেছে—সে শুধু আধ্যাত্মিক জ্ঞান নয়, ঐহিক জ্ঞানও।

ব্রহ্মের চিৎ-শক্তি অখণ্ড, এবং সৎ ও আনন্দের সহিত ওতপ্রোত-ভাবে জড়িত বলিয়া পূর্ণ, স্বয়ংসিদ্ধ, অঘটনঘটনপটীয়সী। সৃষ্টিতেই তাহা খণ্ড, মানুষের মধ্যে সীমাবদ্ধ। তাই মানুষের পূর্ণতালাভের জন্য এত আকুলতা, শক্তির বিকাশে এত আগ্রহ। মানুষের দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ শক্তি-বিকাশের প্রাথমিক উপায়। সৃষ্টির বিকাশে—যেমন পূর্ণ-সত্তা খণ্ড-সত্তায়, অবশেষে অণুতে পরিণত হন, তেমনি শক্তিও খণ্ড আধারে দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষের কারণ ঘটায়। দ্বন্দ্বের উদ্দেশ্য আত্মকর্তৃত্ব স্থাপন করা; তাই সৃষ্টির নিম্নস্তরে জীব জীবকে গ্রাস করিয়া বর্দ্ধিত হয়।

সৃষ্টির উর্দ্ধগতিতে এই দ্বন্দ্ব ও সংঘর্ষ শুধু নিছক জীবনধারণের জন্য নহে, তাহার বিভিন্ন কারণ—যেমন স্বীয় ভোগসুখের বাসনা, আত্মপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা—উপস্থিত হয়। এই সকল কারণেই মানুষ আদিম কাল হইতে কত যুদ্ধবিগ্রহ করিয়াছে, কত রক্তপাত করিয়াছে! মানুষের মানসিক উৎকর্ষলাভের পর উচ্চ অবস্থায় সংঘর্ষের কারণ আদর্শগত। আদর্শের জন্যও মানুষ কম রক্তপাত করে নাই—এখনও করিতেছে। লৌকিক ধর্ম্মপ্রতিষ্ঠার জন্য মানুষ কত যুদ্ধ করিয়াছে—তথাকথিত ঈশ্বরের রাজ্যস্থাপনার জন্য বর্ব্বরতার পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছে। মানুষের ইতিহাসের এই অধ্যায় এখনও সমাপ্ত হয় নাই। ধর্ম্মের জন্য পূর্ব্বে বহু দেশে বহু যুদ্ধ হইয়াছে, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কারণে এই শতাব্দীতে

দুইটি মহাযুদ্ধ হইয়াছে। ইহার মধ্যে একটি ছিল অনেকাংশে আদর্শগত। আবার আদর্শগত কারণে একটি মহাপ্রলয় হইবে কি না কে জানে?

দেব-দানবের সংঘর্ষ বোধ হয় সৃষ্টির উর্দ্ধায়নের চরম সংঘর্ষ। অসুর যে খণ্ড-শক্তিতে বলীয়ান, তাহাকে সে ব্যাপক করিতে চাহে; তাহার যে খণ্ড-জ্ঞান, তাহাকে সে বিশ্বব্যাপী করিতে চাহে। সে শুধু ভোগে তৃপ্ত নহে—সমগ্র বিশ্বকে ভোগায়তন ক্ষেত্রে পরিণত করিতে অভিলাষী। পুরাণে দেখা যায় অসুর বা রাক্ষস তপস্যায় 'রাজ্যম্ সমৃদ্ধম্' লাভ করিয়া তৃপ্ত হয় নাই, বিশ্বকে গ্রাস করিতে চাহিয়াছে, এমন কি দেবতাগণকে সাময়িকভাবে রাজ্যচ্যুত করিয়াছে। সে সৃষ্টির উপর কর্তৃত্ব স্থাপন করিতে অভিলাষী হইয়াছে। এমন কি সে পরাশক্তির পরিচয় পাইয়াও তাঁহাকে চাহিয়াছে ভোগের জন্য। তাই পুরাণে আছে চণ্ডীর মনোমোহিনীরূপ দেখিয়া মহিষাসুর তাঁহাকে বনিতারূপে পাইতে চাহিয়াছে। তখন চণ্ডীকে কালীরূপ ধারণ করিয়া তাহাকে নিধন করিয়া মুক্তি দিতে হইয়াছে।

নিম্নজগতের এই দ্বন্দ্ব সংঘর্ষে বিভ্রান্ত না হইয়া মানুষ যদি পরম চেতনার, পরাশক্তির আশ্রয় লয়—যে চেতনা সৃষ্টির খণ্ডতায়, পরিচ্ছিন্নতায় আত্মবিস্মৃত নয়—তখন তাহার সত্যজ্ঞান ও পূর্ণশক্তি বিকাশ হয়, সে অমরত্বে, ব্রহ্মে, শাশ্বতে প্রতিষ্ঠিত হয়। মৃত্যু মানুষকে ঐহিক খণ্ড-সত্তার বিনশ্বরতা স্মরণ করাইয়া দেয়। মৃত্যু কি নিরানন্দের বিষয়, তাহাতে কি অজানার ভয় তাহা দেহধারী মানুষ ভাল করিয়া জানে। আর মৃত্যুতে সে অনুভব করে অদ্ভুত অসহায়তা। এই অনুভূতি কি মানুষের মৃত্যুকে অতিক্রম করিবার নিগূঢ় অভীপ্সার পরিচায়ক নয়? মৃত্যুই অমরতার সম্ভাবনা স্মরণ করাইয়া দেয়। কিন্তু দৈহিক জীব আমরা প্রথমেই দেহের অমরত্বের আকাঙ্ক্ষা করি—যাহাতে আমরা প্রাণগত ও মনোগত বাসনায় দৈহিক ভোগসুখের ক্ষমতা অটুট রাখিতে পারি। কিন্তু একটু গভীরভাবে চিন্তা করিলে বুঝা যায় আমাদের নিগূঢ় অভীপ্সা চেতনারই অমরত্ব লাভ। কিন্তু চেতনা খণ্ড আধারে আবদ্ধ থাকিলে তাহা নূতন আধার ছাড়া অখণ্ডতার আভাস পাইবে কি

করিয়া ? মৃত্যুই আমাদের আধারের রূপান্তর ঘটাইয়া অভিজ্ঞতার বৈচিত্র্য-লাভের সুযোগ দেয়। কোন স্থায়ী খণ্ড অভিজ্ঞতা কি মানুষকে তৃপ্ত করিতে পারে ? অথচ মানুষ একটা শাশ্বত সত্তার পরিচয় চাহে, যাহাতে সে উপলব্ধি করিতে পারে যে, 'নূতনের মাঝেও সে চিরপুরাতন'—নতুবা তাহার নিজকে 'হারাই হারাই সদা ভয় হয়'। ইহা শুধু ভয় নয়, পরিচিতের নিকট হইতে বিদায় লইবার ব্যথা।

মানুষ যতদিন অসহায়ভাবে, চেতনার খণ্ডতার জন্য, জন্ম-মৃত্যুর দোলায় দুলিতে থাকে, ততদিন মৃত্যুর অনুভূতিতে ব্যথা পায়। কিন্তু যখন সে শাশ্বত সত্তার, অবিনশ্বর চেতনার সন্ধান পায় ; যখন সে উপলব্ধি করে তাহার উদ্ভব কোথা হইতে, তাহার বিকাশের কারণ, সৃষ্টিরহস্য—যখন সে মহান্ আত্মার, পূর্ণ চেতনার আশ্রয় লয়, তখন সে জন্ম-মৃত্যুকে বরণ করে ব্রহ্মের বিকাশ-বৈচিত্র্য হিসাবে। ব্রাহ্মীস্থিতি হইলে তাহার সত্য অমরত্ব লাভ হয়। ব্রহ্ম অবিনশ্বর, আত্মা অবিনশ্বর—এই আত্মাই নিগূঢ়ভাবে মানব-সত্তা এই কারণেই মানব-আত্মাতে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন 'মমৈবাংশঃ'।

মানুষ আদিম কাল হইতে মৃত্যু, অক্ষমতা ও কামনার সমস্যা-সমাধানে কত বিভ্রান্ত হইয়াছে—এগুলিকে অতিক্রম করিবার উপায়-লাভের চেষ্টা করিয়াছে, কিন্তু ব্রহ্মের সৃষ্টিতে এইগুলির রহস্য বুঝিতে পারে নাই। "দিব্য-জীবনে" Death, desire ও incapacity সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দ যাহা লিখিয়াছেন তাহা পড়িয়া মুগ্ধ হইতে হয় ; কি অপূর্ব্ব যুক্তিদ্বারা তিনি এই সমস্যার মীমাংসা করিয়াছেন। তিনি এগুলি শুধু মানবীয় অভিজ্ঞতা হিসাবে দেখেন নাই, ইহাদের কারণ নির্ণয় করিয়াছেন, প্রতিপন্ন করিয়াছেন সৃষ্টিতে ইহাদের অবশ্য-ম্ভাবিতা। আর তিনি দেখাইয়াছেন যে ব্রহ্মের সাযুজ্য, সামীপ্য ও সালোক্য লাভ করিলে—যাহা মানবের মূল লক্ষ্য—ব্রহ্ম-চেতনার আশ্রয়ে মানব-চেতনার রূপান্তর ঘটিলে, মানুষ শুধু অমরত্ব নয়, পূর্ণ জ্ঞান, শক্তি ও আনন্দ লাভ করিতে পারে।

অষ্টাদশ অধ্যায়

পূর্ণযোগের ভিত্তি

গীতাকেই শ্রীঅরবিন্দ পূর্ণযোগের ভিত্তি করিয়াছেন। ভারতীয় দর্শনে তাঁহার অসাধারণ জ্ঞানের কথা লোকপ্রসিদ্ধ। তিনি ঈশ, কেন প্রভৃতি উপনিষদগুলির অনুপম ব্যাখ্যা করিয়াছেন ; বেদের গূঢ় রহস্য উদঘাটন করিয়াছেন—এমন কি বেদোক্ত মূর্তিগুলি যে চৈতন্যের বিভিন্ন প্রতীক তাহা সাধনায় উপলব্ধি করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে তিনি "আর্য্যে" 'বেদ-রহস্যের' মুখবন্ধে লিখিয়াছেন যে, পূর্ব্বে তিনি উপনিষদগুলিকে ভারতের জ্ঞানের একমাত্র উৎস বলিয়া মনে করিতেন, এবং স্বয়ং বেদ পড়িবার পূর্ব্বে ইয়ুরোপীয় পণ্ডিতদিগের ভাষ্যই গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু সাধনার বিশেষ স্তর অনুধাবন করিবার সময়ে তিনি সহসা আমাদের পূর্ব্বপুরুষদিগের অনুস্থত, বর্ত্তমানে বিস্মৃতপ্রায়, প্রাচীন পথে আসিয়া উপস্থিত হন। এই সময়ে যৌগিক-অভিজ্ঞতার সহিত সংশ্লিষ্ট কতকগুলি নাম-প্রতীক তাঁহার মনে উদয় হইতে লাগিল ; তাহাদের মধ্যে তিনটি মাতৃশক্তির মূর্ত্তি—ইলা, সরস্বতী ও সরমা। তাঁহারা স্বতঃ-জ্ঞানের তিনটি স্তরের প্রতীক।*

ইহাতেই বুঝা যায় যে তিনি আমাদের দেশের জগৎ-প্রসিদ্ধ পুস্তকগুলি শুধু জ্ঞানার্জনের জন্য পড়েন নাই, সেগুলিকে সাধনার সহায়করূপে

---

* At this time there began to arise in my mind an arrangement of symbolic names attached to certain psychological experiences which had begun to regularise themselves; and among them there came the figures of three female energies, Ila, Saraswati and Sarama, representing severally three out of the four faculties of the intuitive reason—revelation, inspiration and intuition.—*The Secrets of the Vedas*.

লইয়াছিলেন। তাহাতে যে সত্য পরিস্ফুট হইয়াছে তাহা তিনি পরিপূর্ণভাবে উপলব্ধি করিয়াছেন এবং সেই জ্ঞানালোকে সাধনার এক নূতন পথের সন্ধান করিয়াছেন। তিনি ইংরাজী গীতাভাষ্যের ভূমিকায় লিখিয়াছেন যে, গীতায় যে সনাতন সত্য বিধৃত হইয়াছে তাহা দেশ, কাল ও পাত্রের অতীত। কিন্তু তাই বলিয়া বলা চলে না যে, জ্ঞানা-লোকের ঊষার দিকেই থাকিবে আমাদের দৃষ্টি: আধুনিক মানুষকে বিবর্ত্তন লাভ করিতে হইবে জ্ঞানসূর্য্যের মধ্যাহ্ন-দীপ্তিতে।

এই উদ্দেশ্য-প্রণোদিত হইয়াই তিনি গীতাকে করিয়াছেন পূর্ণ-যোগের ভিত্তি। গীতাই হইয়াছে তাঁহার ভাগবত-উপলব্ধি-প্রকাশের প্রধান অবলম্বন। বাংলায় থাকিতে তিনি লিখিয়াছিলেন বাংলা "গীতার ভূমিকা"; পণ্ডিচারী যাইয়া সুরু করিলেন গীতার মহাভাষ্য, যাহা "Essays on the Gita" নামে দুই খণ্ডে কয়েক বৎসর পূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছে।

জ্ঞান-বিস্তারে, সাধনার সহায়করূপে কালোপযোগী বলিয়া তিনি গীতাকে অবলম্বন করিয়াছিলেন। পণ্ডিচারী যাইবার পূর্ব্বে গীতার বিশ্বরূপ দর্শনের ন্যায় দুর্জ্ঞেয় বিষয়ে তাঁহার কি অপূর্ব্ব অভিজ্ঞতা হইয়াছিল তাহার পরিচয় পাওয়া যায় প্রসঙ্গক্রমে "ধর্ম্মে" লিখিত এই অনুচ্ছেদটিতে :—

"বিশ্বরূপ দর্শন গীতায় অতি প্রয়োজনীয় অঙ্গ। অর্জুনের মনে যে দ্বিধা ও সন্দেহ উৎপন্ন হইয়াছিল, তাহা শ্রীকৃষ্ণ তর্ক ও জ্ঞানগর্ভ উক্তিদ্বারা নিরসন করিয়াছিলেন, কিন্তু তর্ক ও উপদেশদ্বারা যে জ্ঞানলাভ হয়, তাহা অদৃঢ়-প্রতিষ্ঠিত; যে জ্ঞানের উপলব্ধি হইয়াছে, সেই জ্ঞানের দৃঢ়প্রতিষ্ঠা হয়। সেই জন্য অর্জুন অন্তর্য্যামীর অলক্ষিত প্রেরণায় বিশ্বরূপ দর্শনের আকাঙ্ক্ষা জানাইলেন। বিশ্বরূপ দর্শনে অর্জুনের সন্দেহ চিরকালের জন্য তিরোহিত হইল। বুদ্ধি পূত ও বিশুদ্ধ হইয়া গীতার পরম রহস্য গ্রহণের যোগ্য হইল। বিশ্বরূপ দর্শনের পূর্ব্বে গীতায় যে জ্ঞান কথিত হইয়াছিল, সে সাধকের উপযোগী জ্ঞানের বহিরঙ্গ;

সেইরূপ দর্শনের পর যে জ্ঞান কথিত হয় সে জ্ঞান গূঢ় সত্য, পরম রহস্য, সনাতন শিক্ষা। এই বিশ্বরূপ দর্শনকে যদি কবির উপমা বলি, গীতার গাম্ভীর্য্য, সততা, গভীরতা নষ্ট হয়; যোগলব্ধ গভীরতম শিক্ষা কয়েকটি দার্শনিক মত ও কবির কল্পনার সমাবেশে পরিণত হয়। বিশ্বরূপ দর্শন কল্পনা নয়, উপমা নয়, সত্য; অতিপ্রাকৃত সত্য নহে—কেন না বিশ্ব প্রকৃতির অন্তর্গত; বিশ্বরূপ অতিপ্রাকৃত হইতে পারে না। বিশ্বরূপ কারণজগতের সত্য, কারণজগতের রূপ দিব্যচক্ষুতে প্রকাশ হয়। দিব্যচক্ষুপ্রাপ্ত অর্জুন কারণজগতের বিশ্বরূপ দেখিলেন।"

অতঃপর লিখিতেছেন, "যিনি শক্তির উপাসক, কর্ম্মযোগী, যন্ত্রীর যন্ত্র হইয়া ভগবৎ-নির্দ্দিষ্ট কার্য্য করিতে আদিষ্ট, তাঁহার চক্ষে বিশ্বরূপ দর্শন অতি প্রয়োজনীয়। বিশ্বরূপ দর্শনের পূর্ব্বেও তিনি আদেশ লাভ করিতে পারেন, কিন্তু সেই দর্শন লাভ পর্য্যন্ত আদেশ ঠিক মঞ্জুর হয় না, রুজু হইয়াছে, পাশ হয় না। সেই পর্য্যন্ত তাঁহার কর্ম্মশিক্ষার ও তৈয়ারী হইবার সময়। বিশ্বরূপ দর্শনে কর্ম্মের আরম্ভ।" ("ধর্ম্ম", ২৩ সংখ্যা)।

শ্রীঅরবিন্দ বাংলায় গীতার ভাষ্য লেখা শেষ করেন নাই, "ধর্ম্মে" যতটুকু লিখিয়াছিলেন তাহা "গীতার ভূমিকা" নামক পুস্তকে প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু সেই অল্প কয়েক অধ্যায়ের মধ্যে তিনি শুধু গীতার যৌগিক ব্যাখ্যা করেন নাই, তাহার অন্তর্নিহিত রাজনীতিক উদ্দেশ্য সম্বন্ধেও আলোচনা করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ কেন কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ ঘটাইলেন, তাহাতে ভারতের কি মঙ্গল হইয়াছিল সে সম্বন্ধে ইঙ্গিত করিয়াছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে কুলনাশের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে তিনি কি লিখিয়াছেন তাহার উল্লেখ করা যাইতে পারে: "কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে কুলনাশ হইয়াছিল, তাহাও সত্য কথা। এই যুদ্ধের ফলে মহাপ্রতাপান্বিত কুরুবংশ একরূপ লোপ পাইল। কিন্তু কুরু-জাতির লোপে যদি সমস্ত ভারত রক্ষা হইয়া থাকে, তাহা হইলে কুরু-বংশের ক্ষতি না হইয়া লাভ হইয়াছে।...এমন হয় যে দেশভাইয়ের সঙ্গে

বিরোধ, দেশভাইকে যুদ্ধে বধ, জাতির হিত ও জগতের হিতের একমাত্র উপায় হয়। ইহাতে কুলনাশের আশঙ্কা যদি হয়, তাহা হইলেও জাতির হিত ও জগতের হিতসাধনে ক্ষান্ত হইতে পারি না। এই যুগে জাতিই ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা, মানবসমাজের কেন্দ্র। জাতিরক্ষা এই যুগের প্রধান ধর্ম্ম, জাতিনাশ অমার্জনীয় মহাপাতক। কিন্তু এমন যুগ আসিতেও পারে যখন এক বৃহৎ মানবসমাজ প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে, তখন হয়ত জাতির বড় বড় জ্ঞানী ও কর্ম্মী জাতির রক্ষার জন্য যুদ্ধ করিবেন (যেমন ভীষ্ম, দ্রোণ প্রভৃতি কুলরক্ষার জন্য করিয়াছিলেন), অপর পক্ষে শ্রীকৃষ্ণ বিপ্লবকারী হইয়া নব কুরুক্ষেত্র বাধাইয়া জগতের হিত সাধন করিবেন।"

সেই সুদূর অতীতেও (১৯০৯ খৃষ্টাব্দে) শ্রীঅরবিন্দ আন্তর্জাতিকতা স্থাপনের জন্য যুদ্ধের আভাস দিয়াছিলেন, প্রথম মহাযুদ্ধের পরে তাহা সত্যই জগৎজোড়া বুলি হইয়াছিল ; দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরেও অনুরূপ প্রচেষ্টা হইয়াছে, কিন্তু পূর্ব্বের মত তাহা সফল হয় নাই। অপর পক্ষে এক্ষণে কেহ কেহ অখণ্ড এক বিশ্বরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিতেছেন। অথচ আন্তর্জাতিকতা প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্ব্বে জাতীয়তা বারবার দম্ভভরে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে। জাতীয়তার দম্ভ ও সংকীর্ণতা দূর হইয়াছে, সাম্রাজ্যবাদের প্রায় অবসান হইয়াছে, কিন্তু সত্য আন্তর্জাতিকতা প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। শ্রীঅরবিন্দ মানুষের বিবর্ত্তনে খণ্ড আদর্শের জন্য সংগ্রামের অবশ্যম্ভাবিতা দেখাইয়াছেন, কিন্তু কোন দিনই নীট্শে বা হিট্লারের ন্যায় সংগ্রামের গুণকীর্ত্তনে পঞ্চমুখ হইয়া উঠেন নাই। বরং তিনি মানুষের শ্রেষ্ঠ আদর্শ সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার উপর বিশেষ জোর দিয়াছেন ; তবে স্মরণ করাইয়াছেন যে এই আদর্শকে অটল ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে অন্তরের পরিবর্ত্তন প্রয়োজন। আদর্শ যতই মহান্ হউক না কেন, মানুষ যতদিন অন্তরে তাহা না উপলব্ধি করে, ততদিন উহা বাহিরে হয় কপটাচার ও সংঘর্ষের কারণ। এই সংঘর্ষের আগুনে পুড়িয়াই

মানুষকে হইতে হয় শুদ্ধ। মানবের বিবর্ত্তনে সংঘর্ষের প্রয়োজন এই কারণেই।

শ্রীঅরবিন্দ শ্রীকৃষ্ণকে তখনকার যুগের শ্রেষ্ঠ রাজনীতিবিদ্ বলিয়াছেন, কিন্তু রাজনীতিক শ্রীকৃষ্ণকে তিনি গীতাভাষ্যে ফুটাইয়া তুলেন নাই—তিনি মহিমা প্রকাশ করিয়াছেন অবতার শ্রীকৃষ্ণের। শ্রীকৃষ্ণ যদি শুধুই রাজনীতিবিদ্ হইতেন তাহা হইলে অর্জুনকে তাঁহার একমাত্র উপদেশ হইত কর্ত্তব্যপালন এবং গীতা হইত কর্ত্তব্যপালনের নীতিগ্রন্থ। প্রথমে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে কর্ত্তব্যবুদ্ধিতে উদ্বুদ্ধ করিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু অর্জুনের হৃদয়সমুদ্র তখন আসন্ন প্রলয়বাত্যার আলোড়নে বিক্ষুব্ধ, তিনি তত্ত্বকথায় তৃপ্ত হইবেন কি করিয়া ? কাজেই ভগবানের অর্জুনকে দিতে হইল চরম জ্ঞান, বিবৃত করিতে হইল পরম রহস্য, বুঝাইতে হইল সৃষ্টিতত্ত্ব—অবশেষে তাঁহার স্বরূপ প্রকাশ করিতে হইল।

পরম উপলব্ধির পরই যোগারূঢ় অর্জুন যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন আর তিনি শুধু বীরকুলচূড়ামণি, গাণ্ডীবধারী অর্জুন নহেন, তিনি পূর্ণজ্ঞানসম্পন্ন ভাগবত-যোদ্ধা—যিনি ভগবানের উদ্দেশ্যসাধনের জন্য পরমোৎসাহে যুদ্ধ করিলেন। ভগবান দেখাইলেন যে, ইহা নিছক রাজনীতিক যুদ্ধ নহে, ইহা হইতেছে সৃষ্টির বিবর্ত্তনে অন্তর ও বাহিরে অবশ্যম্ভাবী সংঘর্ষ। তখন ভারতে ক্ষত্রিয়কুল যেমন ছিল দুর্দ্ধর্ষ, তেমনি ছিল দাম্ভিক। দম্ভের ফলে নীতিজ্ঞান ও ন্যায়পরায়ণতা লুপ্তপ্রায় হইয়াছিল। রীতি মানিয়া চলা ছিল তখনকার ধর্ম্ম, আধ্যাত্মিক ঔদার্য্য ছিল অনাদৃত। এই কারণেই ভীষ্মের ন্যায় মহান্ ব্যক্তি পূর্ব্বাপর সমস্ত জানিয়া বুঝিয়াও, দুর্য্যোধনের পক্ষ ত্যাগ করিলেন না। দুর্য্যোধনও দম্ভে এরূপ বিমূঢ় হইলেন যে, তিনি শান্তিস্থাপনার প্রয়াসী শ্রীকৃষ্ণকে পর্য্যন্ত বন্ধন করিতে উদ্যত হইলেন।

মানুষ যখন মানবীয় বৃত্তিগুলির উৎকর্ষসাধন করে তখন সে জাগতিক জ্ঞান, বিদ্যা প্রভৃতিতে পারদর্শী হয়, বাহুবলের পরাকাষ্ঠা লাভ করে কিন্তু আত্মার স্বরূপ বিস্মৃত হইতে পারে। প্রকৃতির বহিঃপ্রকাশের

দিকে, তাহার ভোগে তাহার চেতনা নিয়োজিত হয়, সে অন্তরের প্রেরণায় সাড়া দিতে চাহে না। সে ক্ষুদ্র স্বাথসিদ্ধি লইয়া ব্যস্ত থাকে, মহতের প্রেরণা তাহার হৃদয়ে জাগে না। সে যেমন অন্তর্য্যামীকে চিনিতে পারে না, তেমনি সৃষ্টি কাহার বিকাশ, কে সৃষ্টিকর্তা তাহার খোঁজ লয় না। সে খণ্ডকে আশ্রয় করে, অখণ্ডতা উপলব্ধি করিতে পারে না। সে মুহূর্ত্তকে অবলম্বন করে, শাশ্বতের দিকে ফিরিয়া চায় না।

অবশেষে এই খণ্ডবুদ্ধি, ভেদবুদ্ধি তাহার ধ্বংসের কারণ হয়। আবার অনিবার্য্যভাবে যখন ধ্বংসের সম্মুখীন হয় তখন কর্ত্তব্যপালনে তাহার দ্বিধা উপস্থিত হয়। সে দেখে তাহার পরিচিত, গতানুগতিক জগৎ কালের তরঙ্গে লুপ্ত হইবার উপক্রম হইয়াছে। সে অসহায় বোধ করে। সে উপলব্ধি করিতে পারে না ধ্বংসের পরে নূতন সৃষ্টি হইবে। এমন কি সে মনে করিতে পারে যে, এই আহবে যদি সে যোগদান না করে তাহা হইলে হয়ত ইহা এড়ান যাইবে।

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের প্রারম্ভে অর্জুনের এই অবস্থা। তাঁহার দেহ ও মন অবসন্ন, তাঁহার গাণ্ডীব যেন হস্তচ্যুত। এই বিষাদের ক্ষণে তাঁহার সখা, সারথি তাঁহাকে উদ্বুদ্ধ করিলেন, উৎসাহ দিলেন, কর্ত্তব্যপালনের কথা স্মরণ করাইলেন। কিন্তু তাহাতেও অর্জুনের দ্বিধাসংশয় দূর হইল না। তখন শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে বুঝাইলেন যে এই খণ্ডপ্রলয় অবশ্যম্ভাবী—অর্জুন ইহাতে যোগদান না করিলেও ইহাকে রোধ করা যাইবে না। অর্জুন কালের লীলায়, সৃষ্টির বিবর্ত্তনে নিমিত্ত মাত্র।

তবু মানুষী বুদ্ধি এই যুক্তিতে তুষ্ট হইতে চাহে না, মন প্রবোধ মানিতে চাহে না—কেন এই ধ্বংস, কেন এত দুঃখ বেদনা? তখন ভগবানকে তাঁহার সমগ্র রূপ দেখাইতে হইল, তাঁহার লীলারহস্য প্রকট করিতে হইল—চাক্ষুষভাবে দেখাইতে হইল তিনিই সব, তাঁহাতেই সব বিধৃত, তিনিই সৃষ্টির লীলায় বিভিন্নভাবে বিকাশ পাইতেছেন। অর্জুন এই বিশ্বরূপ দেখিয়া ভয় পাইলেন—তিনি খণ্ড, অংশ; বিরাট তাঁহার পরিচিত নহেন। তিনি শ্রীকৃষ্ণকে সখা, সারথি হিসাবেই

জানেন, কাজেই তাঁহার অভিনব বিরাট সত্তা দেখিয়া তিনি বিভ্রান্ত হইলেন।

অচিরে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে শান্ত করিলেন—শুধু তাঁহার পরিচিত রূপ ধারণ করিয়া নহে, অর্জুনকে এই জ্ঞান দিয়া যে, ভগবান নিছক ভয় আর দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা নহেন, তিনি মধুর—তিনি বন্ধু, সখা, অন্তরঙ্গ, জীবনসাথী। তাঁহাতেই একাধারে সব কিছুর বিকাশ ঘটিতেছে। একদিকে যেমন দৈত্য, রাক্ষস প্রভৃতি বিমূঢ়াত্মা—যাহারা আলোককে অস্বীকার করে, খণ্ডচেতনার, অহংবুদ্ধির জয় ঘোষণা করে, যাহারা অখণ্ডের, শাশ্বতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে—এক কথায়, মূর্ত্ত খণ্ড চেতনা এবং খণ্ড বিকাশেই যাহারা তৃপ্ত। অপরদিকে, দেবগণ, সিদ্ধগণ, ঋষিগণ, তপস্বিগণ—যাঁহারা জ্ঞানালোকের সত্তা বা আলোর পথের পথিক। একদিকে আলো, অপরদিকে আঁধারে আলোর আত্মবিস্মৃতি—কিন্তু সমস্তই বিধৃত এক সত্তায়, পুরুষোত্তমে—যিনি সমস্ত বিকাশের উর্দ্ধে।

মানুষ ভগবান ও তাঁহার স্বষ্টির প্রতীক—মানবাত্মা তাঁহারই অংশ। মানবের মধ্যেই ভগবানের, ভাগবতসত্তার বিবর্ত্তন হইতেছে। সাধারণ জীবনে মানুষ স্বষ্টির অংশ, নিম্ন প্রকৃতির অধীন; অপরদিকে তাহার মধ্যে যে ভাগবত সত্তা নিহিত রহিয়াছে তাহা যখন জাগ্রত হয় তখন ভাগবত প্রকৃতির, পরাপ্রকৃতির আশ্রয়ে মানুষ ক্রমশঃ ভাগবত চেতনা লাভ করিতে পারে। তখন মানুষের প্রকৃতিতে "যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া" থাকে না, ভগবানের জ্ঞান, শক্তি, আনন্দ তাহার মধ্যে পরিস্ফুট হয়; সে খণ্ড হইলেও চেতনা দ্বারা যুক্ত হইয়া অখণ্ডে বাস করে—স্বষ্টিতে ভাগবত চেতনা বিকাশের, স্বষ্টির রূপান্তরের আধাররূপে সে ভগবানের লীলার সাথী হয়। তাহার ভিতর দিয়াই ভাগবতসত্তা হইতে অজ্ঞানে রূপান্তরিত প্রকৃতি আবার ভগবানের স্পর্শলাভ করিয়া, ভাগবত প্রকৃতির অঙ্গীভূত হইয়া পূর্ণ হয়।

মানবের এই বিবর্ত্তনে সহায়তা করিবার জন্য ভগবানই মানবরূপ পরিগ্রহ করেন। যখন মানুষ দিশাহারা হয়, মানুষী বুদ্ধি যখন আর

তাহাকে পথ দেখাইতে পারে না, বুদ্ধি বিকৃত হইয়া যখন দারুণ অশান্তি, অসন্তোষ, অজ্ঞানের সৃষ্টি করে ; সুপ্ত নিম্নবৃত্তিগুলি যখন জাগরিত হইয়া ব্যক্তির মধ্যে, সমাজের মধ্যে, জাতির মধ্যে অনর্থ সৃষ্টি করে—যখন শ্রীকৃষ্ণের কথায় ধর্ম্মের গ্লানি হয়—তখনই ভগবান আসেন মানুষের মধ্যে। ইহা শুধু প্রচলিত লৌকিক ধর্ম্মের গ্লানি নহে, মানব-ধর্ম্মের গ্লানি। মানুষ যখন আর ঊর্দ্ধ বিবর্ত্তনের স্তর দেখিতে পায় না, তখনই ভগবান হন ব্যক্তির, সমাজের, জাতির দিশারী। কখনও কুল ধ্বংস করিয়া ভগবান জাতিগঠনে মানব-ঐক্যের পথ দেখান। আবার জাতীয়তার উদ্দেশ্য পূর্ণ হইয়া যখন উহা বিকৃত হয়, তখন বৃহত্তর মানবজাতি গঠনের, বৃহত্তর ঐক্যের পথ দেখান।

ভগবানের এই মানব-রূপ-পরিগ্রহ হইতেছে তাঁহার অবতারত্ব। আধুনিকগণের মধ্যে অনেকে এই কথায় সংশয় প্রকাশ করিতে পারেন, এই জন্য শ্রীঅরবিন্দ ইংরাজী গীতাভাষ্যে অবতারবাদের কথা বিশেষ-ভাবে বুঝাইয়াছেন। অবতার হইতেছেন আদর্শ পুরুষ। তিনি যুগের, বিশেষতঃ যুগ-সন্ধির নেতা। তাঁহারই আদর্শে সমাজের, জাতির রূপান্তর ঘটে। তিনি শুধু জীবন-আদর্শ স্থাপন করেন না, ভাবরাজ্যে —এবং তাহার ফলে বহিঃপ্রকৃতিতেও—বিপ্লব ঘটান। তিনি যে দেশে জন্ম গ্রহণ করেন, তাঁহার ব্যক্তিত্ব শুধু সেই দেশের লোককে আকর্ষণ করে না, তাঁহার প্রভাব বহু জাতির মধ্যে কার্য্যকরী হয়।

মানুষ বিবর্ত্তনের যে স্তরে থাকে তাহারই উপযোগী হয় অবতারের প্রকৃতি ও রূপ। আমাদের দেশে সুবিদিত দশ অবতারের গূঢ় রহস্য হইতেছে প্রকৃতির ঊর্দ্ধায়ন। অবশ্য সর্ব্বত্র অবতারের উদ্দেশ্য অভিনবত্ব বা অলৌকিকত্ব দেখান নয়—যদিও মানুষ অলৌকিকত্বে অভিভূত হইতে বড় ভালবাসে ; তাঁহার লক্ষ্য মানব-হৃদয়ে কার্য্য করা, মানুষের মন-প্রাণ আকর্ষণ করা। এই কারণেই আমরা শ্রীকৃষ্ণের অলৌকিকত্ব অপেক্ষা তাঁহার বাল্যলীলা, যৌবনে অসাধারণ ব্যক্তিত্বের বিকাশে মুগ্ধ হই। একদিকে তিনি যেমন অবতার, অপরদিকে

তেমনি যুগের শ্রেষ্ঠ মানুষ। দ্বাপরে অর্জুন ছিলেন সেই যুগের আদর্শ-মানুষ ; তাই তাঁহাকে অবতার শ্রীকৃষ্ণ আত্মীয়, শিষ্য ও অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ করিলেন। তাঁহার আধারেই দিব্যজ্ঞান বিকাশ করিলেন ; তাঁহার চেতনাকে ভগবদ্‌মুখী করিলেন ; তাঁহাকে পূর্ণযোগ-কৌশল শিখাইলেন—অবশেষে তাঁহার নিকট পুরুষোত্তমরূপে নিজের স্বরূপ ব্যক্ত করিলেন।

পুরুষোত্তমই হইতেছেন গীতার পরম রহস্য। পুরুষোত্তমকে না জানিলে পূর্ণযোগ-প্রতিষ্ঠা হয় না। তিনি পরম পুরুষ, তাঁহাতে বিশ্ব বিধৃত ; তিনি বিশ্বের নিয়ন্তা—তাঁহাতেই সৃষ্টির চরম সমন্বয়। কিন্তু তিনি সৃষ্টির অতীত ; অতীত না হইলে সৃষ্টির নিয়ন্তা হইবেন কি করিয়া ? আবার যদি তিনি সৃষ্টিছাড়া হন তাহা হইলে সৃষ্টি হয় একটা হেঁয়ালী—কি সৃষ্ট হইল, কোথা হইতে সৃষ্টি হইল, কে সৃষ্টি করিল এ প্রশ্নের কোন মীমাংসা হয় না। আপাতদৃষ্টিতে আমরা সৃষ্টিকে একটা অন্ধশক্তির বিবর্ত্তন মনে করিতে পারি (যেমন অনেক বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক মনে করেন), কিন্তু সূক্ষ্মজ্ঞান লাভ করিলেই আমরা বুঝিতে পারি সৃষ্টি-সমন্বয়, সৃষ্টি-ছন্দ, সৃষ্টি-লীলা।

জ্ঞানলাভের সহায়তার জন্য, আমাদের চেতনাকে অংশ হইতে বৃহতে বিকশিত করিবার জন্য, গীতা তিন পুরুষের কথা বলিয়াছেন—ক্ষর, অক্ষর, ও পুরুষোত্তম। ক্ষর নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল, নব নব রূপ পরিগ্রহ করিতেছে, বিচিত্র অভিজ্ঞতা লাভ করিতেছে ; তাহার লীলা দেশ, কাল ও পাত্রে নিবদ্ধ। ক্ষর যতদিন নিজের লীলায় বিভোর থাকে, ততদিন অক্ষর, শাশ্বতকে বুঝিতে পারে না। ক্ষরের জ্ঞানোদয়ে অক্ষর পরিস্ফুট হন, ক্ষর অক্ষরকে উপলব্ধি করে, ক্ষরলীলার ঊর্দ্ধে সনাতন অক্ষর সত্তার পরিচয় পায়—উপনিষদের দুই পক্ষীর কথা।

আমাদের সাধারণ অভিজ্ঞতায় দেখি যে, অধিকাংশ স্থলে মানুষ গতানুগতিক জীবনে বিরক্ত হইয়া অন্তরে আশ্রয় চায় একটা নির্লিপ্ততার। কর্ম্মজগতে ক্লান্ত মানুষ চায় একটা অখণ্ড শান্তি, তৃপ্তি—সে আত্মানন্দে,

ভাবজগতে বিভোর থাকিতে চায়। অক্ষর এই নির্লিপ্ততা। তিনি কবি, জগৎসাক্ষী। তাঁহাতে সব বিধৃত, কিন্তু তিনি অপরিবর্ত্তনীয়। যেন রহস্যময় আকাশ! পৃথিবীর কত পরিবর্ত্তন, কিন্তু উপরে আকাশ স্থির, নির্লিপ্ত। অথচ আকাশের ব্যাপ্তি সর্ব্বত্র। বৈজ্ঞানিকের ইথর-তত্ত্ব আকাশের রহস্য অনেকটা ব্যক্ত করিয়াছে। মানুষ যখন উচ্ছ্বাস-ময় জগৎ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া প্রকৃতির নির্জনতা, বিশালতা ও গাম্ভীর্য্যের মহিমা উপলব্ধি করে, তখন তাহার অন্তরে জাগে এক পরম নির্লিপ্ততা।

জ্ঞানযোগী নিয়ত অন্তরে এই নির্লিপ্ততা অনুভব করেন। যাহা কিছু ঘটুক, অন্তরে তিনি নির্লিপ্ত ; কোন কিছু তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। উঁচুদরের সৃষ্টিতেও মানুষের এই নির্লিপ্ততা চাই। যদি মানুষের মধ্যে এই নির্লিপ্ততা না থাকিত, তাহা হইলে মানুষের জীবন পশুজীবনের উচচসংস্করণ হইত মাত্র। সে জীবনে সূক্ষ্মরসের আস্বাদ পাইত না ; ক্ষণিকের স্থূলরস ও তাহার প্রতিক্রিয়াভোগে তাহার জীবন নিঃশেষ হইত। মানুষ জীব-জগতের সংগ্রাম ও সংঘর্ষ অতিক্রম করিবার উপায় পাইত না।

অক্ষরের এই মহিমা উপলব্ধি করিয়া ভারতের (অন্যান্য দেশেরও) বহু জ্ঞানী, বহু ধ্যানী ইহার আশ্রয় লওয়াই জীবনের গতি বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। এই ভাবের বশেই তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ জগৎকে, নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল সংসারকে, ক্ষরের জীবনকে বলিয়াছেন নিছক মায়া—পার্থিব জীবন একটা দুঃস্বপ্ন! সত্যই মানুষ যখন দেখে যে, একদিকে দুঃখবেদনা, মায়ামরীচিকা, আর অপরদিকে শান্তি ও নির্লিপ্ততা, তখন তাহার জ্ঞানী-মন স্বতঃই শান্তি ও নির্লিপ্ততার দিকে আকৃষ্ট হয়-উহার উপলব্ধিতেই চরম সার্থকতা মনে করিয়া বলে 'নান্যঃ পন্থাঃ'। এই কারণেই ভারতে এককালে সন্ন্যাস-জীবনের আদর্শ একমাত্র আদর্শ বলিয়া ঘোষিত হইয়াছিল—তুরীয় সমাধি ছিল যোগীর একমাত্র কাম্য।

গীতা বিশেষ নৈপুণ্যের সহিত এই ক্ষর ও অক্ষরের সমন্বয় করিয়াছেন। অক্ষর সত্য, সনাতন, শাশ্বত; কিন্তু ক্ষরও সত্য, সনাতন। ক্ষর ও অক্ষরের সমন্বয় হইয়াছে পুরুষোত্তমে। পুরুষোত্তমই ক্ষর, পুরুষোত্তমই অক্ষর—তাঁহাতে উভয় অবস্থা বিধৃত, কিন্তু তিনি উভয়ের অতীত। তিনিই সনাতন, শাশ্বত, পরম সত্য, পরমা গতি। তাঁহার সত্তায় প্রকৃতি স্থষ্ট, জীব স্থষ্ট। প্রকৃতি তাঁহার চেতনার অজানায় অভিযান; জীব তাঁহার অংশ—মমৈবাংশঃ। কিন্তু তাঁহার দুই প্রকৃতি —দ্বে মে প্রকৃতি; পরাপ্রকৃতি তাঁহার পরম চেতনা। জীবে তাঁহার পরাপ্রকৃতি বিকাশ পাইলেই তাঁহার বিকাশের পূর্ণতা—আর জীবেরও পূণতা। এক বহুর বৈচিত্র্য উপভোগ করিতেছেন—বহু তখন বহুর ও একের মহিমা উপলব্ধি করিতে পারে।

শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে এই কারণে পুরুষোত্তমের আশ্রয় লইতে বলিয়াছিলেন। মানুষের ব্যক্তিত্ব দেশ ও কালের মধ্যে পুরুষোত্তমের অভিব্যক্তি: ব্যক্তিত্বের চরম বিকাশও পুরুষোত্তম। এইজন্যই মানুষের পরমা গতি পুরুষোত্তম। পুরুষোত্তম মানুষের শুধু নিয়ন্তা, প্রভু, বিভু নহেন, তিনি অন্তর্য্যামী—সাথী, পরম সখা।

ক্ষর মানব অক্ষর ব্রহ্মকে উপলব্ধি করিয়া পুরুষোত্তমের বিশ্বব্যাপী, সনাতন সত্তা উপলব্ধি করে—পরমধাম প্রাপ্ত হয়। তখন তাহার চেতনা ক্ষরের লীলায় আর খণ্ড নয়—তাহা অখণ্ডেরই বিকাশ, অখণ্ডেরই লীলাবৈচিত্র্য, বৈচিত্র্যেও ছন্দোময়। পুরুষোত্তমের আশ্রয় লইলে চরাচর সমস্তই দেখে পুরুষোত্তম, দেখে সর্ব্বভূতে পুরুষোত্তম, দেখে পুরুষোত্তমের বিশ্বরূপ—দেখে এক বিরাট, মহান্ সত্তা অগণনরূপে বিকাশ পাইয়াছেন, লীলামাধুর্য্য স্থষ্টি করিতেছেন—আবার সবার প্রভুরূপে বিশ্ব পরিচালনা করিতেছেন।

মানুষ যখন এইভাবে পুরুষোত্তমের আশ্রয় গ্রহণ করে, তখন আধার অনুসারে—অর্থাৎ লীলাবৈচিত্র্যে বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব স্থষ্টি করিয়া—পুরুষোত্তমের সত্তা বিকশিত হয়। তখন মানুষ যে অবস্থায় থাকুক, যাহাই করুক

না কেন, সে আর মানুষী খণ্ডবুদ্ধি দ্বারা পরিচালিত হয় না—তাহার দিশারী হন স্বয়ং পুরুষোত্তম। তখন মানুষ হয় যোগী ;—কৌপীন-ধারী, সমাজে নিজের বিশেষত্ব ও প্রভাব দেখাইবার জন্য লালায়িত, 'আমি একটা কেউ-কেটা নই'-ভাবাপন্ন যোগী নহে ;—বিশ্ববন্ধু, মানবপ্রেমিক, করুণাময়, উদারহৃদয়, নিত্য ভাগবতযোগযুক্ত পরম যোগী। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন যোগীই তাঁহার পরম প্রিয়। তাঁহাকে তিনি বাহিরের সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে, শারীরিক ক্লেশ ভোগ করিতে, উৎকট কঠোরতপা হইতে উপদেশ দেন নাই (বরং বলিয়াছেন এই অহৈতুক কৃচ্ছ্রসাধনে তিনিই পীড়া অনুভব করেন)—বলিয়াছেন সর্ব্বকর্ম্মে, জ্ঞানে, ভক্তিতে সর্ব্ব অবস্থায় তাঁহার সহিত যুক্ত থাকিতে, সর্ব্বদা হৃদিস্থিত হৃষীকেশ, নারায়ণ, জনার্দ্দন, শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করিতে। প্রেরণা দিয়াছেন দিব্যকর্ম্মী হইতে, লোকসংগ্রহের জন্য কর্ম্ম করিতে।

উনবিংশ অধ্যায়

ভাগবত শক্তির বিকাশ

ভক্তি মানুষের ভগবানের সহিত যুক্ত হইবার সেতু। মানুষ যখন ভগবানের দিকে আকৃষ্ট হয় তখনই তাহার হৃদয়ে ভক্তির উদয় হয়। ভক্তির উদয়ে ভগবানের সহিত মানুষের প্রেমের যোগ হয়। ভক্তিই ভাগবত কৃপা—ভক্তের হৃদয়ে ভগবানের আনন্দঘন মূর্ত্তির বিকাশ। ভক্তির পরিণতিতে মানবাত্মা পরমাত্মার সহিত শাশ্বত যোগসূত্র বুঝিতে পারে। কি মধুরভাবে শ্রীঅরবিন্দ "Synthesis of Yoga" শীর্ষক প্রবন্ধগুলির এক অধ্যায়ে ভক্তির মাধুর্য্য বর্ণনা করিয়াছেন! ভক্ত ভগবানকে যাহা কিছু দিয়া পূজা করে—একটি ফুল, একটি পাতা, একটু জল—তাহাতেই ভগবান তৃপ্ত। মানুষের অন্তর হইতে যখন ভক্তির উৎস উঠে, ভগবান তাহা প্রেমরসে সিঞ্চিত করেন।

মানুষ জ্ঞানবিকাশের পর হইতেই ভগবানের সন্ধান করিয়াছে। মানুষ ভগবানকে কত মূর্ত্তিতে, কত রূপে, কত ভাবে অর্চ্চনা করিয়াছে, শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়াছে। মানুষ মানুষীরূপেও ভগবানকে পাইয়াছে—কত অবতার, নবী, ধর্ম্মগুরু, জ্ঞানীগুরু, যোগীগুরুর পূজা করিয়াছে। তবু মানুষের হৃদয়ে প্রশ্ন উঠে, 'কস্মৈ দেবায়'? মানুষ অনেক সময়ে নিজের বুদ্ধি ও কল্পনানুযায়ী ভগবান সৃষ্টি করিয়াছে; তাহা লইয়া খণ্ডবুদ্ধি, ভেদবুদ্ধিপরায়ণ মানুষের মধ্যে কম সংঘর্ষ হয় নাই। এখনও কি সে সংঘর্ষের শেষ হইয়াছে? আজও মানুষ ধর্ম্মমতের শ্রেষ্ঠত্ব জাহির করিবার জন্য রক্তারক্তি করিতে একটুও পশ্চাৎপদ নহে।

মানুষের স্বভাব এই যে, সে নিজে যাহা বিশ্বাস করে অপরকে তাহা বিশ্বাস না করাইতে পারিলে তৃপ্ত হয় না। এইরূপ বিশ্বাসে মানুষ গোষ্ঠী, সমষ্টি, সম্প্রদায় গঠনে বিশেষ ব্যগ্র। শুধু বিশ্বাস হইতে

প্রবর্ত্তিত আচার, মতবাদ প্রভৃতি প্রচারে মানুষের কতই না আগ্রহ। এই মনোভাবের ফলে মানুষ ভগবানের সার্ব্বভৌমত্ব ভুলিয়া যায়, ভুলিয়া যায় যে ভগবানই সব, সবই ভগবানের সৃষ্টি। সৃষ্টিতে যে বৈচিত্র্য তাহাও ভগবানের। মানব-ইতিহাসের প্রারম্ভ হইতে এই সংঘর্ষ, ধর্ম্মমতের অসহিষ্ণুতা, ধর্ম্মের বিকৃতি দেখিয়া এক শ্রেণীর মানুষ ধর্ম্মের উপর খড়্গহস্ত। লোকবিশেষের স্বার্থবুদ্ধিতে ধর্ম্মের বিকৃতি দেখিয়া ভ্রান্ত মতের প্রাদুর্ভাব দেখিয়া তাঁহাদের ধারণা হইয়াছে ধর্ম্মই সব অনিষ্টের মূল। ইদানীং আমরা দেখিয়াছি যে, এই কারণে কোন এক রাজনীতিকসম্প্রদায় ধর্ম্মকে জনসাধারণের পক্ষে অহিফেনের ন্যায় বুদ্ধিম্লানকারী বলিতে কুণ্ঠিত হয় নাই।

কথাটা একেবারে নিছক মিথ্যা নয়, কারণ মানুষের স্বার্থবুদ্ধির জন্য যখন কোন জিনিষ বিকৃত হয় তাহার অনিষ্টকারিতা নির্ব্বিচারে সকলকেই ভোগ করিতে হয়। তখন মানুষের মন বিদ্রোহী হইয়া উঠে। এই মনোভাবের ফলে কাহারও কাহারও ধারণা জন্মে যে, মানুষের ভোগসুখের ব্যবস্থা করা, মানবধর্ম্ম পালন করার সুযোগের ব্যবস্থা করিলেই হইল। তাহার জন্য যে কাজ করা যায় তাহাই নিষ্কাম কর্ম্ম। ভগবানকে দাঁড় করানর প্রয়োজন কি?

বাস্তবক্ষেত্রেও আমরা অনেকেই এই ভাবে চলি। আমরা সকলে মানবতার ধার ধারি না, তবে নিজের এবং সম্ভবমত পরের ভোগসুখের ব্যবস্থা করিতে পারিলে, মানবজীবন সার্থক হইল মনে করি। আমাদের কোন ধর্ম্মবিশ্বাস থাকিলেও তাহা থাকে মনের এক কোণে! দরকারমত আমরা তাহা জাহির করি, বিপাকে পড়িলে হয়ত তাহার আশ্রয় লইতে পারি। তাহার আচার পালন করাই চরম সার্থকতা মনে করি, কিন্তু তাহার আদর্শে ব্যক্তিগত (জাতিগত ত নহেই) জীবন গঠন করার ধার ধারি না।

কিন্তু জীবনে আমরা কি একেবারে ভগবানকে এড়াইয়া চলিতে পারি? গতানুগতিক জীবনে আসে যখন প্রচণ্ড আঘাত, তখন আমরা

দিশাহারা হইয়া উর্দ্ধে তাকাই এবং আমাদের আকুলতা জাগে—এমন কি কেউ বিশ্বে নাই যাঁর নিকট আমাদের মর্ম্মবেদনা পৌঁছে? আমাদের অহংবুদ্ধি যাহাতে তৃপ্ত হইতে পারে, সংস্কার বা ধারণানুযায়ী সেইরূপ সাড়া হয়ত পাই না; কিন্তু একটু কান পাতিয়া শুনিলে হৃদয়ের অন্তস্তলে একটু সাড়া পাওয়া যায় বৈ কি!

কিন্তু শুধু দুঃখ বেদনা কেন, প্রাচুর্য্যের মধ্য দিয়া, আনন্দের মধ্য দিয়া, সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্যের মধ্য দিয়া কি আমরা অসীমের হাতছানি পাই না? এই বিষয়ে জনৈক শিষ্যের নিকট শ্রীঅরবিন্দ লিখিয়াছিলেন: তুমি হয়ত নির্জন নদীতটে একটি সুন্দর মন্দির দেখিতেছ; হয়ত মূর্ত্তির সৌষ্ঠব কিংবা মন্দিরের কারুকার্য্যে তোমার মন বিভোর! অকস্মাৎ হয়ত তুমি অনুভব কর যে জগন্মাতার সস্নেহ দৃষ্টি তোমার উপর নিবদ্ধ—যেন চকিতে তুমি দেখিতে পাও তাঁর প্রসন্ন আনন! কিংবা হয়ত তুমি উচ্চ পর্ব্বতের চূড়ায় উঠিয়াছ; নিম্নের প্রাকৃতিক দৃশ্য স্বপ্নের মত—উর্দ্ধে অনন্ত আকাশ, আকাশ ধরণীকে আলিঙ্গন করিতেছে। তখন হয়ত তোমার হৃদয়ে জাগিয়া ওঠে অনন্তের আভাস, তুমি অনুভব কর এক বিশ্ব-সত্তা, যাহাতে সমস্ত বিধৃত। ভাবাবেশে তোমার ক্ষুদ্রত্ব বিস্মৃত হও।*

সত্যই আমরা যখন প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে অভিভূত হই (প্রকৃতির রুদ্ররূপেও;—সমুদ্রবক্ষে সাইক্লোনের বর্ণনায় শরৎচন্দ্র এই অনুভূতিটি বড় চমৎকারভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন), তখন অজ্ঞাতে আমাদের হৃদয়ে ভক্তির উৎস বিশ্বস্রষ্টার দিকে প্রবাহিত হইতে থাকে। কিন্তু শুধু বহিঃপ্রকৃতি আমাদের হৃদয়ে ভাগবত প্রেরণা জাগায় না: কোন হৃদয়গ্রাহী পুস্তক, কোন সুন্দর কবিতা, কোন দার্শনিক তথ্য, কোন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারও আমাদিগকে ভাগবত মহিমার আভাস দিতে পারে। আমরা যদি প্রতীক্ষায় থাকি, হৃদয়ের দ্বার উন্মুক্ত রাখি, আমাদের মন যদি উন্মুখ হয়, তাহা হইলে ভগবানের, ভূমার স্পর্শ পাইবার যে অসংখ্য পথ রহিয়াছে তাহা আমরা উপলব্ধি করিতে পারি।

* "The Riddle of This World."

ভগবানের এই বিরাটত্ব, অসীমত্বের আকর্ষণ আমাদের চেতনার বিবর্ত্তনের প্রথম অবস্থা। এই প্রেরণা যদি ক্ষণস্থায়ী না হয়, তাহা হইলে আমাদের হৃদয়ে ক্রমশঃ শুদ্ধাভক্তির উদয় হইতে থাকে। ভক্তি ক্রমশঃ জ্ঞানের ক্ষেত্র বিস্তৃত করে; আমরা অহংবুদ্ধির অতীত সত্তার অনুসন্ধান করি। সন্ধানের ফলে ক্রমশঃ আমরা ভগবানের নিত্য, শাশ্বত সত্তার পরিচয় পাইতে থাকি। আমাদের হৃদয় ও মনে বিকাশ পায় সমতা। এই সমতাই জ্ঞান, কর্ম্ম ও ভক্তির ভিত্তি। এইজন্য শ্রীঅরবিন্দ গীতাভাষ্যে ও অন্যান্য প্রবন্ধে সমতার কথা বিশেষভাবে লিখিয়াছেন।

সমতা কি? ইহা কি জীবন ও জগৎ সম্বন্ধে উদাসীনতা—শুধু নিজের ভাবে বিভোর হইয়া থাকা? যৌগিক সমতা উদাসীনতা নহে। যোগী আপাতদৃষ্টিতে সর্ববিষয়ে উদাসীন; বাহিরে তাঁহার চাঞ্চল্যের কোন লক্ষণ দেখা যায় না; মানুষের সুখদুঃখে তিনি যেন নির্ব্বিকার। মনে হয় যেন তাঁহার হৃদয় বলিয়া কিছু নাই। বাস্তবপক্ষে যোগীর দৃষ্টি আপাতদৃশ্য ঘটনাবলীতে নিবদ্ধ নহে; তিনি উপলব্ধি করেন কালপ্রবাহে সমস্ত জিনিষের অভিব্যক্তি হইতেছে, তাহারা মানবদৃষ্টির অগোচর লক্ষ্যে নিয়ন্ত্রিত হইতেছে। তিনি সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখ উপলব্ধি করেন, কিন্তু কার্য্য-কারণ-পরম্পরায় ঘটনার অবশ্যম্ভাবিত্ব বুঝিয়া বিচলিত হন না। তাঁহার ভাবাবেগ সাধারণের ন্যায় ক্ষণস্থায়ী নয়, তাহা গভীর। তাঁহার হৃদয় সমগ্র বিশ্বের স্পন্দন অনুভব করে; বিশ্বের মঙ্গল, শান্তি, আনন্দ ও পরিপূর্ণতার ধ্যানে তিনি মগ্ন। তিনিই সত্য বিশ্বপ্রেমিক।

বহিঃপ্রকৃতির, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য কোন ব্যাপারই তাঁহাকে বিচলিত করিতে পারে না। তিনি বাহিরের চাঞ্চল্যের পিছনে স্থির, শাশ্বত সত্তা অনুভব করেন। তিনি অনুভব করেন, নিম্নপ্রকৃতি উর্দ্ধ প্রকৃতি-স্পর্শের জন্য, রূপান্তরের জন্য উন্মুখ। তাহার আকুলতা, চাঞ্চল্যের কারণ এই উন্মুখতা। তিনি উপলব্ধি করেন প্রাকৃত জীবনের গতি দিব্যজীবনের দিকে—দিব্যজীবনও প্রাকৃতজীবনের রূপান্তরের

দিশাহারা হইয়া উর্দ্ধে তাকাই এবং আমাদের আকুলতা জাগে—এমন কি কেউ বিশ্বে নাই যাঁর নিকট আমাদের মর্ম্মবেদনা পৌঁছে ? আমাদের অহংবুদ্ধি যাহাতে তৃপ্ত হইতে পারে, সংস্কার বা ধারণানুযায়ী সেইরূপ সাড়া হয়ত পাই না ; কিন্তু একটু কান পাতিয়া শুনিলে হৃদয়ের অন্তস্তলে একটু সাড়া পাওয়া যায় বৈ কি !

কিন্তু শুধু দুঃখ বেদনা কেন, প্রাচুর্য্যের মধ্য দিয়া, আনন্দের মধ্য দিয়া, সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্যের মধ্য দিয়া কি আমরা অসীমের হাতছানি পাই না ? এই বিষয়ে জনৈক শিষ্যের নিকট শ্রীঅরবিন্দ লিখিয়াছিলেন : তুমি হয়ত নির্জন নদীতটে একটি সুন্দর মন্দির দেখিতেছ ; হয়ত মূর্ত্তির সৌষ্ঠব কিংবা মন্দিরের কারুকার্য্যে তোমার মন বিভোর ! অকস্মাৎ হয়ত তুমি অনুভব কর যে জগন্মাতার সস্নেহ দৃষ্টি তোমার উপর নিবদ্ধ—যেন চকিতে তুমি দেখিতে পাও তাঁর প্রসন্ন আনন ! কিংবা হয়ত তুমি উচ্চ পর্ব্বতের চূড়ায় উঠিয়াছ ; নিম্নের প্রাকৃতিক দৃশ্য স্বপ্নের মত—উর্দ্ধে অনন্ত আকাশ, আকাশ ধরণীকে আলিঙ্গন করিতেছে। তখন হয়ত তোমার হৃদয়ে জাগিয়া ওঠে অনন্তের আভাস, তুমি অনুভব কর এক বিশ্ব-সত্তা, যাহাতে সমস্ত বিধৃত। ভাবাবেশে তোমার ক্ষুদ্রত্ব বিস্মৃত হও।*

সত্যই আমরা যখন প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে অভিভূত হই (প্রকৃতির রুদ্ররূপেও ;—সমুদ্রবক্ষে সাইক্লোনের বর্ণনায় শরৎচন্দ্র এই অনুভূতিটি বড় চমৎকারভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন), তখন অজ্ঞাতে আমাদের হৃদয়ে ভক্তির উৎস বিশ্বস্রষ্টার দিকে প্রবাহিত হইতে থাকে। কিন্তু শুধু বহিঃপ্রকৃতি আমাদের হৃদয়ে ভাগবত প্রেরণা জাগায় না : কোন হৃদয়গ্রাহী পুস্তক, কোন সুন্দর কবিতা, কোন দার্শনিক তথ্য, কোন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারও আমাদিগকে ভাগবত মহিমার আভাস দিতে পারে। আমরা যদি প্রতীক্ষায় থাকি, হৃদয়ের দ্বার উন্মুক্ত রাখি, আমাদের মন যদি উন্মুখ হয়, তাহা হইলে ভগবানের, ভূমার স্পর্শ পাইবার যে অসংখ্য পথ রহিয়াছে তাহা আমরা উপলব্ধি করিতে পারি।

---

* "The Riddle of This World."

ভগবানের এই বিরাটত্ব, অসীমত্বের আকর্ষণ আমাদের চেতনার বিবর্ত্তনের প্রথম অবস্থা। এই প্রেরণা যদি ক্ষণস্থায়ী না হয়, তাহা হইলে আমাদের হৃদয়ে ক্রমশঃ শুদ্ধাভক্তির উদয় হইতে থাকে। ভক্তি ক্রমশঃ জ্ঞানের ক্ষেত্র বিস্তৃত করে; আমরা অহংবুদ্ধির অতীত সত্তার অনুসন্ধান করি। সন্ধানের ফলে ক্রমশঃ আমরা ভগবানের নিত্য, শাশ্বত সত্তার পরিচয় পাইতে থাকি। আমাদের হৃদয় ও মনে বিকাশ পায় সমতা। এই সমতাই জ্ঞান, কর্ম্ম ও ভক্তির ভিত্তি। এইজন্য শ্রীঅরবিন্দ গীতাভাষ্যে ও অন্যান্য প্রবন্ধে সমতার কথা বিশেষভাবে লিখিয়াছেন।

সমতা কি? ইহা কি জীবন ও জগৎ সম্বন্ধে উদাসীনতা—শুধু নিজের ভাবে বিভোর হইয়া থাকা? যৌগিক সমতা উদাসীনতা নহে। যোগী আপাতদৃষ্টিতে সর্ব্ববিষয়ে উদাসীন; বাহিরে তাঁহার চাঞ্চল্যের কোন লক্ষণ দেখা যায় না; মানুষের সুখদুঃখে তিনি যেন নির্ব্বিকার। মনে হয় যেন তাঁহার হৃদয় বলিয়া কিছু নাই। বাস্তবপক্ষে যোগীর দৃষ্টি আপাতদৃশ্য ঘটনাবলীতে নিবদ্ধ নহে; তিনি উপলব্ধি করেন কালপ্রবাহে সমস্ত জিনিষের অভিব্যক্তি হইতেছে, তাহারা মানবদৃষ্টির অগোচর লক্ষ্যে নিয়ন্ত্রিত হইতেছে। তিনি সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখ উপলব্ধি করেন, কিন্তু কার্য্য-কারণ-পরম্পরায় ঘটনার অবশ্যম্ভাবিত্ব বুঝিয়া বিচলিত হন না। তাঁহার ভাবাবেগ সাধারণের ন্যায় ক্ষণস্থায়ী নয়, তাহা গভীর। তাঁহার হৃদয় সমগ্র বিশ্বের স্পন্দন অনুভব করে; বিশ্বের মঙ্গল, শান্তি, আনন্দ ও পরিপূর্ণতার ধ্যানে তিনি মগ্ন। তিনিই সত্য বিশ্বপ্রেমিক।

বহিঃপ্রকৃতির, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য কোন ব্যাপারই তাঁহাকে বিচলিত করিতে পারে না। তিনি বাহিরের চাঞ্চল্যের পিছনে স্থির, শাশ্বত সত্তা অনুভব করেন। তিনি অনুভব করেন, নিম্নপ্রকৃতি উর্দ্ধ প্রকৃতি-স্পর্শের জন্য, রূপান্তরের জন্য উন্মুখ। তাহার আকুলতা, চাঞ্চল্যের কারণ এই উন্মুখতা। তিনি উপলব্ধি করেন প্রাকৃত জীবনের গতি দিব্যজীবনের দিকে—দিব্যজীবনও প্রাকৃতজীবনের রূপান্তরের

অপেক্ষায় আছে। যে পরাশক্তিতে এই রূপান্তরের সম্ভাবনা তাহা তিনি অনুভব করেন, এবং তিনি আশ্রয় লন এই শক্তির, এই শক্তির নিকট প্রাকৃত-সত্তাকে সমর্পণ করেন। স্বীয় আধারে তিনি বিশ্বকে ধারণ করিয়া—(macrocosm in microcosm)—তাঁহার আত্মা বিশ্বাত্মার সহিত যুক্ত হয়, তিনি বিশ্বহিতের জন্য, মানবের দিব্য-রূপান্তরের জন্য অখণ্ড কর্ম্ম করেন। এই কর্ম্মে তাঁহার যে ব্যক্তিত্ব ফুটিয়া উঠে, ইহা তাঁহার অহং, খণ্ডব্যক্তিত্ব নহে, ইহা পরম ব্যক্তিত্ব—পুরুষোত্তমের বিকাশ।

তাঁহার কর্ম্ম বুদ্ধদেবের ন্যায় নিছক জ্ঞানযোগ, কিংবা খৃষ্ট বা গৌরাঙ্গ-দেবের ন্যায় নিছক প্রেম-ভক্তিযোগ না হইতে পারে। কখন কখন যোগী যুদ্ধের ন্যায় ঘোর কর্ম্মেও আত্মনিয়োগ করিতে পারেন—যেমন শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে কুরুক্ষেত্রের খণ্ডপ্রলয়ে নিয়োজিত করিয়াছিলেন। এ যুদ্ধ শ্রীঅরবিন্দের কথায়—

"ধরার কল্পলোকের তরে ঘোষেন তিনি রণ!"

যুদ্ধে দিব্যকর্ম্মী মানুষের স্বাভাবিক যন্ত্রণা, বেদনা ও আর্ত্তনাদে উদাসীনতা দেখাইলেও তাঁহার দৃষ্টি থাকে পরম মঙ্গলের দিকে। যুদ্ধকে তিনি নীট্শের কিংবা হিটলারের মত, জীবনের, জাতির চরম আদর্শ বলিয়া ঘোষণা করেন না ; আবার উৎকট শান্তিবাদীদের মত বিনা আয়াসে চিরস্থায়ী শান্তির কল্পনায় বিভোর থাকেন না। তিনি উপলব্ধি করেন যে, মানুষের ব্যষ্টি বা সমষ্টিগত অহমিকা ধ্বংসের জন্য, খণ্ডবুদ্ধি দূর করিবার জন্য, জড়জগতে, প্রাণজগতে ও মনোজগতে যুদ্ধের প্রয়োজন। কিন্তু মানুষকে যে চিরকালই যুদ্ধ করিয়া কাটাইতে হইবে তাহা নয়। মানুষ যখন সংঘর্ষের গ্লানিতে আর্ত্ত হইয়া উঠিবে, আন্তরিকভাবে মৈত্রী উপলব্ধি করিবে—যখন মানুষ নিজেকে বিশ্বাত্মার সহিত যুক্ত করিবে, বহুর মধ্যে এককে অনুভব করিবে, নিজের মধ্যে বহুকে ধারণ করিবে, তাহার চেতনা মানুষের সাধারণ সংস্কারের উর্দ্ধে উঠিবে, তখন যুদ্ধ হইবে অসভ্যতার নিদর্শন।

কিন্তু মানুষ যতদিন সেই পরম আলোকের সন্ধান না পায়, ততদিন তাহাকে দুঃখ আনন্দ, হিংসা অহিংসা, যুদ্ধ শান্তি প্রভৃতি দ্বন্দ্বের ভিতর দিয়া অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিতে হইবে। জ্ঞানের পূর্ণতা হইলে এই দ্বন্দ্ব চুকিয়া যাইবে। মানুষ তখন আনন্দলোকের সন্ধান পাইবে—ধরায় কল্পলোক বিকশিত হইবে।

সমতায় প্রতিষ্ঠিত, ভাগবত চেতনায় নিত্যযুক্ত যোগী উপলব্ধি করেন সর্ব্বভূতে ব্রহ্ম এবং ব্রহ্মে সর্ব্বভূতের স্থিতি। কাজেই তিনি যেমন বাহিরে মানুষের হাসিকান্নায় যোগদান করিতে দ্বিধাবোধ না করিতেও পারেন, সাধারণ কাজ করিতে পারেন, তেমনি তিনি আবার ভাগবত প্রেরণায় সর্ব্বদাই বিরাট কাজ করিবার জন্য প্রস্তুত। আবার তিনি ঐ প্রেরণায় একান্ত কর্ম্মহীন অবস্থায় তুরীয় সমাধিতে মগ্ন থাকিতে পারেন। নিশ্চল থাকিলেও তিনি নিষ্কর্ম্মা নহেন। স্বামী বিবেকানন্দ কি বলেন নাই যে, যোগীর সাধনায় ভাবরাজ্যে যে বিপ্লব ঘটিতে পারে, শত সহস্র লোকের কর্ম্মেও তাহা হইতে পারে না ? বুদ্ধদেব শিখাইয়াছিলেন নির্ব্বাণ—কিন্তু তাঁহার তিরোধানের পরে ভারতে ধর্ম্ম, রাজনীতি ও সমাজনীতির যে অভিনব বিকাশ হইয়াছিল, শিল্পকলায় যে অভিনব শ্রী ফুটিয়া উঠিয়াছিল, তাহা কি বুদ্ধের সৃষ্ট ভাব-বিপ্লবের ফল নহে ? বুদ্ধ শুধু এ জাতি নহে, অপর বহু জাতির মধ্যেই নূতন জীবন-সৃষ্টির বীজ বপন করিয়াছিলেন। মহাপুরুষের, যোগীর কর্ম্মক্ষেত্র শুধু বাহিরে নয়, অন্তরে। তাঁহার নিকট কর্ম্মের বিভেদ নাই, তিনি কৃৎস্নকর্ম্মকৃৎ।

পূর্ণযোগের ভিত্তি উদার দৃষ্টি ও সমতা। শ্রীঅরবিন্দ যোগপথ সম্বন্ধে যে ইঙ্গিত করিয়াছেন, তাহাতে বিশেষ করিয়া বলিয়াছেন যে সাধককে অন্তরে সমতা ও স্থৈর্য্যের উপর দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইতে হইবে। স্থিরতা না জন্মিলে আমরা ঊর্দ্ধ্বতর সত্তা সম্বন্ধে সচেতন হইতে পারি না। এই সত্তাই ভাগবত সত্তার সহিত যুক্ত। আমাদের মন সাধারণতঃ চঞ্চল, বিষয়মুখী ও ইন্দ্রিয়পরিতৃপ্তিতে উন্মখ। এই

জন্যই প্রথমে মনে স্থৈর্য্যের প্রয়োজন। মন যখন শান্ত, প্রাণাবেগেও অচঞ্চল, ইন্দ্রিয় চাঞ্চল্যমুক্ত ও সমতাযুক্ত হয়, তখনই আমাদের স্থিরবুদ্ধির স্ফুরণ এবং প্রকৃত সত্তার—আত্মার—উদ্বোধন হয়—যে সত্তা শাশ্বত, বহিঃপ্রকৃতির পরিবর্ত্তনেও অপরিবর্ত্তনশীল—যাহা আমাদের সত্য ব্যক্তিত্ব, যাহাকে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন 'মমৈবাংশঃ'।

মনের চাঞ্চল্য দূর হইলে হৃদয়ের চাঞ্চল্যও দূর হয়। আমাদের ভাবাবেগ, স্বাভাবিক অনুভূতির প্রকৃতিকে সমভাবাপন্ন না করিলে আমরা জাগতিক দ্বন্দ্ব সম্বন্ধে নিরপেক্ষ হইতে পারি না, আমাদের মমত্ব দূর হয় না। মমত্ব দূর না হইলে যেমন আমাদের সত্যজ্ঞান হয় না, হৃদয়ও স্বচ্ছ হয় না। হৃদয় যখন আবিলতাবিহীন হয় তখনই তাহাতে স্ফুরিত হয় ভাগবত প্রেম, ভগবানে আস্পৃহা—যাহাকে শ্রীঅরবিন্দ বলিয়াছেন aspiration। এই আস্পৃহা প্রথমে আমাদিগকে ভাগবতমুখী করে এবং বিকাশ করে চৈত্যপুরুষকে (Psychic)। এই চৈত্যপুরুষই অলক্ষ্যভাবে মনোময় সত্তা, প্রাণময়সত্তা ও অন্নময় সত্তার পিছনে রহিয়াছে—কিন্তু আমরা এই বিভিন্ন চেতনার দাবী মিটাইতে ব্যস্ত, চৈত্যপুরুষের সন্ধান রাখি না। কাজেই আমাদের মন, প্রাণ ও দেহ আলোড়িত হইলে বিভ্রান্ত হই। চৈত্যপুরুষ সম্বন্ধে যখন আমরা সচেতন হই তখনই আমাদের মন, প্রাণ ও দেহ নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা জন্মে।

"যোগের পথে আলো" ("Lights on Yoga") নামক পুস্তকে শ্রীঅরবিন্দ আমাদের সত্তার বিভিন্ন স্তরের বিশদভাবে বিশ্লেষণ করিয়াছেন। আমরা যদি জীবনের রূপান্তর চাই, তাহা হইলে আমাদের এই রহস্যের সন্ধান করিতেই হইবে, আমাদের সত্তার পরিচয় পাইতেই হইবে। চিকিৎসা-বিজ্ঞান যেমন আমাদের দেহের পরিচয় দেয়, তেম্নি যোগ-বিজ্ঞান পরিচয় দেয় আমাদের প্রকৃত সত্তার ও উর্দ্ধ সত্তার। এই পরিচয় না পাইলে আমরা আমাদের সত্তাকে ভাগবতশক্তির আধার করিতে পারি না ভগবান ও তাঁহার শক্তি সম্বন্ধে একটা অস্পষ্ট ধারণা পাইতে পারি মাত্র।

"যোগের পথে আলো" ও "যোগ সাধনার ভিত্তি" ("Bases of Yoga") এই দুইখানি পুস্তক মানুষের দিব্যজীবন সাধনার পরম সহায়ক। যোগ সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দ "আর্য্যে" "Synthesis of Yoga" নামে যে প্রবন্ধগুলি লিখিয়াছেন (যাহার একখণ্ড পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে) তাহাকে যোগ-বারিধি বলা যায়; কিন্তু উপরোক্ত দুইখানি পুস্তকের বিশেষত্ব এই যে, উহাতে শ্রীঅরবিন্দের শিষ্যদিগের ব্যক্তিগত প্রশ্নের লিখিত উত্তরগুলি একত্র করা হইয়াছে। তাঁহারা ব্যক্তিগত-ভাবে যে সকল অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন, যে সকল সমস্যার সম্মুখীন হইয়াছেন, তাহার উপর আলোকপাত করিয়া শ্রীঅরবিন্দ মানব-চেতনার উর্দ্ধ-বিবর্ত্তনের কৌশল দেখাইয়াছেন।

শ্রীঅরবিন্দের শিক্ষার প্রণালী এই যে, তিনি বাঁধাধরা, ছককাটা কতকগুলি আধ্যাত্মিক নিয়মকানুন প্রণয়ন করেন নাই, কিংবা বাধা-নিষেধে সাধকদিগের জীবন আড়ষ্ট বা মন পঙ্গু করেন নাই। ব্যক্তি-গত ভাবে তাঁহাদের মনে যে প্রশ্ন জাগিয়াছে বা সাধনায় তাঁহারা যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন, তাহারই সমস্যা-সমাধানে সাহায্য করিয়াছেন। পূর্ণযোগের উদ্দেশ্য নিম্নের ধর্ম্ম অতিক্রম করিয়া উর্দ্ধের ধর্ম্ম স্থাপন করা—জীবনের বিকাশ-বৈচিত্র্য সূক্ষ্মতর, রসঘন করিয়া তোলা, জীবনের কোন অংশকে অস্বীকার করা নয়। কিন্তু জীবনের নিয়ন্তা তখন অহং নয়—জ্ঞান, শান্তি, আনন্দদায়িনী ভাগবতশক্তি। জীবনের উদ্দেশ্য তখন খণ্ড-অহংকে পূর্ণ করা নয়, অখণ্ডকে প্রতিষ্ঠিত করা, তাঁহারই ধর্ম্ম গ্রহণ করা, তাঁহারই ইচ্ছায়, শক্তিতে বিশ্বলীলার উদ্দেশ্য সফল করা। কাজেই অধ্যাত্মজগতে dictatorship-এর স্থান নাই—ভগবান ত' স্বেচ্ছাচারী রাজা বা সর্ব্বময় কর্ত্তা নহেন, যে একঢালাভাবে জীবন গঠন করিবেন! বিশ্বে বৈচিত্র্য ঘটানই তাঁহার কাজ।

জীবনে সংযমের প্রয়োজন আছে। কিন্তু আধ্যাত্মিক সাধনায় সে-সংযম হইবে স্বতঃস্ফূর্ত্ত সংযম। শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন, 'প্রকৃতিং

যান্তি ভূতানি নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি'—শুধু বাহিরের সংযমে বহিঃ-প্রকৃতি কখনও আয়ত্ত করা যায় না, চাই অন্তরের প্রেরণা, দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্ত্তন। তাই শ্রীঅরবিন্দ সংযমের নীতিজ্ঞান প্রচার করেন না; ইঙ্গিত দেন সমর্পণের—আমাদের প্রত্যেক বৃত্তিকে ভাগবত শক্তির নিকট সমর্পণ করিতে বলেন।

আমাদের স্বাভাবিক অবস্থায় ইন্দ্রিয় ও মানসিক বৃত্তিগুলির উপর যতক্ষণ কর্ত্তৃত্ব লাভ না করি, ততক্ষণ তাহারা আমাদের সত্তাকে আলোড়িত করে; আমরা এই চাঞ্চল্যে অসহায়। আমাদের মন যতই উন্নত হয় ততই আমরা তাহাদের আয়ত্ত করিতে চাহি, বুদ্ধিদ্বারা এবং অনেকক্ষেত্রে শারীরিক ও মানসিক নিগ্রহ দ্বারা। অনেক সময়ে আমরা কৃতকার্য্য হই বটে, কিন্তু আচম্বিতে বাঁধ ভাঙ্গিয়া যায়, আমাদের মন ও বুদ্ধি কর্ত্তৃত্ব হারাইয়া ফেলে। দেহ ও প্রাণের আলাদা ধর্ম্ম আছে, মন ও বুদ্ধি তাহাদের দ্বারা অভিভূত হইয়া পড়ে। এই জন্যই আমরা দেখি যে, পরম পণ্ডিত, সুবিজ্ঞ দার্শনিক কিংবা উঁচুদরের শিল্পী বা কবি আকস্মিকভাবে প্রাণস্রোতের উচ্ছ্বাসে বিভ্রান্ত হইয়া উঠেন। কথায় বলে 'মুনিনাঞ্চ মতিভ্রমঃ'।

মানবজাতির ইতিহাসেও এইজন্য দেখি মানুষ যুগে যুগে কত নীতি, নিয়মকানুনের বেড়া দিয়া সমাজ রক্ষা করিবার প্রয়াস পাইয়াছে, কিন্তু প্রাণের উন্মাদনায় তাহা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, সমাজে দেখা গিয়াছে অসুর-তাণ্ডব। তাই বলিয়া ইহাও বলা চলে না যে, নীতিজ্ঞান, ethics, একেবারে নিরর্থক। মানুষ নীতিজ্ঞানের বিকাশেই পাশবিক অবস্থা অতিক্রম করিয়া সভ্যতার আলোকে আসিয়াছে। সকল ধর্ম্মেই সেইজন্য নীতিশাস্ত্র স্থান পাইয়াছে; অধিকাংশ ধর্ম্মপুস্তককে নীতিশাস্ত্র বলিলেও চলে।

কিন্তু সভ্যতার এতদূর বিকাশেও মানুষ এমন অবস্থায় আসিয়াছে, যাহাতে নীতিশাস্ত্র অজ্ঞানের প্লাবনে ভাসিয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছে। মনোবিজ্ঞানবিদ্‌গণ বলেন যে, ইহা অচেতনের (unconscious)

স্ফুরণ। মানব-সভ্যতা এতদিন সুরম্য নগরীর মত গড়িয়া উঠিতেছিল, কিন্তু তাহার তলদেশে প্রচ্ছন্ন আগ্নেয়গিরি রহিয়াছে কে মনে করিয়াছিল?

মানুষের এক্ষণে ধারণা জন্মিতেছে যে, শুধু মানসিক বৃত্তি ও বুদ্ধি দ্বারা সুষ্ঠুভাবে, স্থায়ীভাবে জীবন ও সমাজ গঠন করা সম্ভব নয়। মানসিক চেতনার উর্দ্ধ্বে যে অতিমানস চেতনা আছে তাহার সাধনা করিতে হইবে, এবং তাহার বিকাশেই মানুষের কর্ত্তৃত্ব জন্মিবে শুধু মনে নয়, প্রাণে এবং দেহে। শুধু মনের কর্ত্তৃত্বে প্রাণের প্লাবন রোধ করা কিংবা প্রাণের কর্ত্তৃত্বে দেহ নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভবপর নহে। যখন মানুষের হৃদয় খুলিয়া যায়, চৈত্যপুরুষ জাগিয়া উঠে, তখন মানুষের আত্মজ্ঞান জন্মে এবং সেই জ্ঞানালোকে মানুষ মন, প্রাণ ও দেহ নিয়ন্ত্রণ করিবার শক্তিলাভ করে;—শুধু নিয়ন্ত্রণ নহে, তাহাদের রূপান্তরিত করিতে পারে। মন, প্রাণ, দেহ লইয়া তখন আর বিড়ম্বনা বোধ হয় না, বোধ হয় তাহারা আত্মার বিকাশের আধার এবং তাহাদের বিচিত্র বিকাশ বিশ্ব-চেতনার লীলাতরঙ্গ।

দৃশ্যজগতের উর্দ্ধ্বে ও অন্তরে যে জ্ঞান, আনন্দ ও শক্তির জগৎ আছে তাহার সহিত আমাদের চেতনা যুক্ত হইলেই আমাদের প্রাকৃত চেতনার খণ্ডতা ও মালিন্য দূর হয়। খণ্ডতা দূর হইলে সমস্তই এক পরম-চেতনার বিভিন্ন স্তর বলিয়া প্রতিভাত হয়। তখন আমাদের প্রাকৃতিক বৃত্তিগুলি স্ব স্ব ক্ষেত্রে পূর্ণ জ্ঞান, শক্তি ও আনন্দ বিকীর্ণ করে। আমাদের মন তখন ভূমার সহিত যুক্ত হয়, হৃদয় যুক্ত হয় বিশ্বাত্মার সহিত। তখন বিশ্বের প্রতি স্পন্দন আমাদের হৃদয়ে স্পন্দনছন্দ জাগায়। আমাদের মন হয় শান্ত, সমাহিত; আমাদের বুদ্ধি হয় স্থির, অবিচল; আর আমাদের হৃদয়ে বিকাশ পায় শুধু মানবপ্রেম, জীবপ্রেম, বিশ্বপ্রেম নহে —ভগবানের পূর্ণ সত্তা—যাহা বিশ্বাতীত, সনাতন, শাশ্বত; আবার যাহা বিশ্বলীলায় মধুর।

আমাদের সত্তার বিভিন্ন স্তর সম্বন্ধে আমরা প্রায়ই সচেতন নই।

আমাদের দেহ, প্রাণ ও মন কিভাবে কাজ করে তাহা আমরা প্রায়ই লক্ষ্য করি না। মন আমাদের পরিচালক, কিন্তু উহা সাধারণতঃ দেহ ও প্রাণের দাবী মিটাইতে ব্যস্ত। মানসিক শক্তিচর্চার ফলেই আমরা মনের প্রভাব বুঝিতে পারি। এই প্রভাব অনেকস্থলে আমাদের নিকট বিস্ময়কর বলিয়া বোধ হয়। মনঃসংযম দ্বারা যোগী কি অদ্ভুত শক্তি বিকাশ করিতে পারেন তাহার পরিচয় আমরা পাইয়া থাকি।

রেচক কুম্ভকাদি দ্বারা প্রাণশক্তিরও অদ্ভুত বিকাশ করা যায়। অনেক যোগী আশ্চর্য্য প্রক্রিয়ায় মানুষকে বিস্মিত করিতে পারেন। প্রাণায়াম আধ্যাত্মিক সাধনার একটি বিশিষ্ট উপায় বলিয়া পরিগণিত। হঠযোগী দেখাইতে পারেন দেহের উপর কি আশ্চর্য্য কর্ত্তৃত্ব লাভ করা যায়। শ্রীঅরবিন্দ "আর্য্যে" 'যোগ-সমন্বয়' নামক পুস্তকের কয়েকটিতে রাজযোগ, জ্ঞানযোগ, হঠযোগ প্রভৃতি বিশেষভাবে আলোচনা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, পূর্ণযোগেও এইগুলি বিভিন্ন উপায় হইতে পারে, তবে ইহা অপেক্ষা সহজসাধ্য ও অব্যর্থ উপায় হইতেছে যোগশক্তির আশ্রয় গ্রহণ করা। আমাদের হৃদয়দ্বার যখন খুলিয়া যায়, চৈত্যপুরুষ স্ফুট হন, তখনই আমাদের মধ্যে যোগশক্তি, ঊর্দ্ধ্বপ্রকৃতি সক্রিয় হন। পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ দ্বারা আমরা এই শক্তির সহিত যুক্ত হইতে পারি, এবং যতই আমদের সত্তার বিভিন্ন স্তর, আমাদের বিভিন্ন বৃত্তিগুলি সজ্ঞানে ও সানন্দে এই শক্তির আশ্রয় গ্রহণ করে, ততই ঊর্দ্ধ্বের চৈতন্য বিকশিত হয়, ক্রমশঃ আমাদের সত্তা হয় এই চৈতন্যশক্তির আধার। আধার বিশেষের (প্রতি আধার সংস্কার অনুসারে বিশেষ প্রকৃতি লইয়া জন্মগ্রহণ করে, যাহার জন্য আমরা বিচিত্র প্রকৃতির মানুষ দেখি) মানবোত্তর বিবর্ত্তন ও রূপান্তর একমাত্র এই প্রকৃতির সহায়তায় সম্ভব। বিবর্ত্তন ঘটিলে আমাদের প্রাকৃত চেতনাকে বিচ্ছিন্ন, অহঙ্কারযুক্ত মনে হয় না—মনে হয় অখণ্ড চেতনা বিচিত্র ভঙ্গীতে, অভিনব ছন্দ সৃষ্টি করিয়া অহরহঃ ব্রহ্মেরই তপস্যা করিতেছে। ব্রহ্মের তপস্যায় জগৎ সৃষ্ট; মানবের মধ্যেও যখন তপস্যা স্ফূর্ত্ত হয় তখনই ব্রহ্মের চেতনার

সহিত মানবচেতনা যুক্ত হয়। তখন শুধু মানবপ্রকৃতিতে নয়, বিশ্বেও অপূর্ব্ব ছন্দ অনুভূত হয়।

মানুষের চেতনা তখন শুধু আনন্দ অনুভব করে না—অনুভব করে বিরাটত্ব, ভূমা। মানুষ তখন অনুভব করে যে, বিশাল জড়-জগতের সহিত তাহার দেহ যুক্ত—তাহার দেহ জড়-জগতের অংশ; প্রাণ যুক্ত প্রাণ-জগতের সহিত এবং মন যুক্ত মনোজগতের সহিত। বিজ্ঞানও এই সত্যে সাক্ষ্য দেয়, কিন্তু বিজ্ঞানের বিশ্লেষণে এ বিষয়ে আমরা মনে একটা ধারণা করিতে পারি মাত্র। সৃষ্টির প্রতি স্তরের বিশালতা ও অখণ্ডতা অনুভব করিতে হইলে তাহার সহিত বিশেষ চেতনায় যুক্ত হইতে হয়—যুক্ত হইলে সত্য জ্ঞান জন্মে। শ্রীঅরবিন্দ ইহাকে বলিয়াছেন knowledge by identity। জড়, প্রাণ ও মনের এই সার্ব্বভৌমত্ব আছে বলিয়া আমরা উপলব্ধি করি সকল মানুষের দেহ একই ভাবে গঠিত; প্রাণে আমরা অপরের সুখ দুঃখ অনুভব করিতে পারি, এবং মন দ্বারা অপরের মন বুঝিতে পারি। এই সার্ব্ব-ভৌমত্বের জন্যই প্রাকৃতিক নিয়ম, ধর্ম্ম সম্ভব হইয়াছে—বিজ্ঞান কার্য্য-কারণ নির্ণয় করিবার সুবিধা পাইয়াছে।

মানুষ যখন যোগপথে অগ্রসর হয় তখন সে অনুভব করে এই স্তর-গুলি এক একটা বিভিন্ন জগৎ—জড়জগৎ, প্রাণজগৎ, মনোজগৎ; —অবশ্য একেবারে বিচ্ছিন্ন নয়, বরং ওতপ্রোতভাবে বিজড়িত; কিন্তু প্রত্যেকের ক্ষেত্র বিভিন্ন, প্রকৃতি বিভিন্ন এবং প্রত্যেকেরই আছে বিকাশ-বৈচিত্র্য। মানুষের চেতনা ও বুদ্ধি যে স্তরের আশ্রয় লয়, মানুষের সত্তা সেই স্তরের প্রকৃতি প্রাপ্ত হয়। এই জন্য জড়বুদ্ধি মানব পায় জড়ের প্রকৃতি—তামসিক; যে প্রাণশক্তিকে আশ্রয় করে সে হয় রাজসিক; এবং যে মানসিক শক্তির আশ্রয় লয় তাহার মধ্যে সত্ত্বগুণ বিকাশ পায়। অবশ্য প্রকৃতি অধিকাংশ ক্ষেত্রে মিশ্রিত, ত্রিগুণান্বিত। মানুষ যখন ইহাদের অবস্থানুযায়ী সার্থকতা তথা অপূর্ণতা বুঝিতে পারে, তখনই সে প্রকৃতির উর্দ্ধে উঠিতে পারে—যাহাকে বলে ত্রিগুণাতীত অবস্থা।

মানুষ এই গুণত্রয়ের অস্থিতি বুঝিতে পারিলেই, পরাপ্রকৃতির আশ্রয় লয়—যাহাতে আর দ্বন্দ্ব বা খণ্ডতা নাই, যে অবস্থা হইতে আর বিচ্যুতি নাই। এই পরম রূপান্তর লাভ করিবার পূর্ব্বে মানুষ উপলব্ধি করিতে পারে যে সে দেহ নয়, প্রাণ নয়, মন নয়—এগুলি তাহার আত্ম-বিকাশের, বহির্জগতের পরিচয় পাইবার উপায়। সে উপলব্ধি করে ইহাদের পরিচালক জীবাত্মা। জীবাত্মাই বিভিন্ন অভিজ্ঞতা লাভ করিবার জন্য বিভিন্ন আধার গ্রহণ করে, এবং তাহার প্রয়োজন অনুসারে মহাপ্রকৃতি তাহার দেহ, প্রাণ ও মন গঠন করেন। মানুষ সাধনা দ্বারা এই জ্ঞানলাভে সমর্থ বলিয়া মনঃসংযম দ্বারা এমন অনুভূতি পায় যে তাহার আত্মা, তাহার সত্তা অটল অবিচল, আর চিন্তাগুলি তাহার আশেপাশে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, তাহার মস্তিষ্কে প্রবেশ করিতে পারিতেছে না। শ্রীঅরবিন্দ "যোগের পথে আলোতে" এই অবস্থার কথা বলিয়াছেন। জেলে থাকিতে তাঁহার নিজের এইরূপ অভিজ্ঞতা হইয়াছিল তাহা তিনি "কারাকাহিনী"তে বর্ণনা করিয়াছেন।

মানুষের হৃদয় শান্ত হইলে সে উপলব্ধি করিতে পারে যে বাসনাও বহির্জগতের স্রোতঃপ্রসূত। মানুষ অধিকাংশ ক্ষেত্রে অসহায়ভাবে বাসনাস্রোতে হাবুডুবু খায়, কিন্তু একটু নির্লিপ্ত ভাব অবলম্বন করিলেই অনুভব করিতে পারে যে, তাহার সত্তা এই স্রোতের টানেও অবিচলিত থাকিতে পারে। আরও নির্লিপ্ত হইলে উপলব্ধি করে সে আছে স্থির, আর বাসনা বুদ্বুদের ন্যায় উঠিতেছে ও মিলাইয়া যাইতেছে। তখন সে আর বাসনার দাস নয়—প্রভু, তাহার তাহাকে নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা জন্মে। অবশ্য চাঞ্চল্যের বিপরীত ভাব অবলম্বন করিলেও ক্রমশঃ এই স্থিরতা আসে, কিন্তু তাহা কৃচ্ছ্রসাধ্য। বাসনাকে নির্ম্মমভাবে বিনষ্ট করিবার চেষ্টা করিলে, দমন করিলে তাহা সাময়িকভাবে প্রশমিত হয়, কিন্তু তাহার বীজ নষ্ট হয় না। এই কারণেই ধীমান ব্যক্তি স্বাভাবিক বৃত্তিগুলি নিপীড়িত না করিয়া, সমতা, অবিচলতা ও ধৈর্য্য অবলম্বন করেন এবং তাহাদের রূপান্তরিত করিয়া চৈতন্যের

উচ্চভাবগুলির আশ্রয় লন। এই অব্যর্থ উপায়ে প্রাকৃতিক বৃত্তিগুলি আর সত্তাকে অন্ধভাবে আলোড়িত করে না, উর্দ্ধের প্রেরণায় সুনির্দ্দিষ্টভাবে কার্য্য করে।

শারীরিক সুখ-দুঃখ মানুষ কিভাবে জয় করিতে পারে তাহার নিদর্শন অপ্রতুল নহে। ধীমান ব্যক্তিগণ শারীরিক ব্যাধি উপেক্ষা করিয়া কিরূপে মনঃশক্তি নিয়োজিত করেন তাহার পরিচয় অনেক মহৎ জীবনীতে পাওয়া যায়। আবার প্রাণের প্রেরণায় মানুষ, শারীরিক বিপদ কেন, মৃত্যুকেও উপেক্ষা করিতে পারে। সৈনিক রণক্ষেত্রে মৃত্যুকে তুচ্ছ করে; দেশহিতৈষী দেশের মঙ্গলের জন্য, দেশপ্রেমে মাতোয়ারা হইয়া মৃত্যুকে বরণ করিতে কুণ্ঠিত হন না। মানুষ উচ্চভাবের বশবর্ত্তী হইয়া, বিশ্বাসের জন্য বা প্রেরণাবশে গতানুগতিক জীবন উপেক্ষা করিতে পারে তাহার ভূরি ভূরি নিদর্শন পাওয়া যায়।

কিন্তু সকল মানুষ এই প্রেরণা চিরকাল অবলম্বন করিয়া চলিতে পারে না। প্রেরণা চকিতে বিদ্যুতের মত ঝিলিক দেয়; আবার মিলাইয়া যায়। সত্য রূপান্তরের জন্য তাই মানুষকে আশ্রয় করিতে হয় উর্দ্ধের ধর্ম্ম, আঁকড়াইয়া থাকিতে হয় সত্যকে, প্রেম জাগাইতে হয় সত্যের প্রতি। শুধু ইহাতেও সত্যে প্রতিষ্ঠিত হওয়া যায় না—ইহা প্রাথমিক উপায় মাত্র। প্রতিষ্ঠিত হইতে হইলে চাই সত্য জ্ঞান, বিশ্বসত্তার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম স্তরের অভিজ্ঞতা। তপস্যা, ধ্যান, প্রার্থনায় এই অভিজ্ঞতার আভাস দেয়। ফলে জন্মে দৃঢ় প্রত্যয়, অটুট বিশ্বাস, লক্ষ্যে অব্যর্থ দৃষ্টি। তাহার পর বিকাশ পায় দিব্য চেতনা। প্রথমে বিকাশ পায় হৃদয়ে, তাহার পর মনে, ক্রমে প্রাণে, অবশেষে দেহে—এমন কি চেতনার অন্তর্লীন স্তরে পর্য্যন্ত;—যেমন সূর্য্য উঠিলে প্রথমে আলোক পড়ে তরুশিরে, তাহার পর সমস্ত প্রকৃতির উপর আলো ছড়াইয়া পড়ে।

চৈতন্যের আলোকে, শক্তিতে, আনন্দে যখন আমাদের সত্তা ভরিয়া উঠে, তখন মানুষের মনে হয় সে আর জরা-মরণশীল, অহংবুদ্ধিপরায়ণ

মানুষ এই গুণত্রয়ের অস্থিতি বুঝিতে পারিলেই, পরাপ্রকৃতির আশ্রয় লয়—যাহাতে আর দ্বন্দ্ব বা খণ্ডতা নাই, যে অবস্থা হইতে আর বিচ্যুতি নাই। এই পরম রূপান্তর লাভ করিবার পূর্ব্বে মানুষ উপলব্ধি করিতে পারে যে সে দেহ নয়, প্রাণ নয়, মন নয়—এগুলি তাহার আত্ম-বিকাশের, বহির্জগতের পরিচয় পাইবার উপায়। সে উপলব্ধি করে ইহাদের পরিচালক জীবাত্মা। জীবাত্মাই বিভিন্ন অভিজ্ঞতা লাভ করিবার জন্য বিভিন্ন আধার গ্রহণ করে, এবং তাহার প্রয়োজন অনুসারে মহাপ্রকৃতি তাহার দেহ, প্রাণ ও মন গঠন করেন। মানুষ সাধনা দ্বারা এই জ্ঞানলাভে সমর্থ বলিয়া মনঃসংযম দ্বারা এমন অনুভূতি পায় যে তাহার আত্মা, তাহার সত্তা অটল অবিচল, আর চিন্তাগুলি তাহার আশেপাশে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, তাহার মস্তিষ্কে প্রবেশ করিতে পারিতেছে না। শ্রীঅরবিন্দ "যোগের পথে আলোতে" এই অবস্থার কথা বলিয়াছেন। জেলে থাকিতে তাঁহার নিজের এইরূপ অভিজ্ঞতা হইয়াছিল তাহা তিনি "কারাকাহিনী"তে বর্ণনা করিয়াছেন।

মানুষের হৃদয় শান্ত হইলে সে উপলব্ধি করিতে পারে যে বাসনাও বহির্জগতের স্রোতঃপ্রসূত। মানুষ অধিকাংশ ক্ষেত্রে অসহায়ভাবে বাসনাস্রোতে হাবুডুবু খায়, কিন্তু একটু নির্লিপ্ত ভাব অবলম্বন করিলেই অনুভব করিতে পারে যে, তাহার সত্তা এই স্রোতের টানেও অবিচলিত থাকিতে পারে। আরও নির্লিপ্ত হইলে উপলব্ধি করে সে আছে স্থির, আর বাসনা বুদ্বুদের ন্যায় উঠিতেছে ও মিলাইয়া যাইতেছে। তখন সে আর বাসনার দাস নয়—প্রভু, তাহার তাহাকে নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা জন্মে। অবশ্য চাঞ্চল্যের বিপরীত ভাব অবলম্বন করিলেও ক্রমশঃ এই স্থিরতা আসে, কিন্তু তাহা কৃচ্ছ্রসাধ্য। বাসনাকে নির্ম্মমভাবে বিনষ্ট করিবার চেষ্টা করিলে, দমন করিলে তাহা সাময়িকভাবে প্রশমিত হয়, কিন্তু তাহার বীজ নষ্ট হয় না। এই কারণেই ধীমান ব্যক্তি স্বাভাবিক বৃত্তিগুলি নিপীড়িত না করিয়া, সমতা, অবিচলতা ও ধৈর্য্য অবলম্বন করেন এবং তাহাদের রূপান্তরিত করিয়া চৈতন্যের

উচ্চভাবগুলির আশ্রয় লন। এই অব্যর্থ উপায়ে প্রাকৃতিক বৃত্তিগুলি আর সত্তাকে অন্ধভাবে আলোড়িত করে না, উর্দ্ধের প্রেরণায় সুনির্দ্দিষ্টভাবে কার্য্য করে।

শারীরিক সুখ-দুঃখ মানুষ কিভাবে জয় করিতে পারে তাহার নিদর্শন অপ্রতুল নহে। ধীমান ব্যক্তিগণ শারীরিক ব্যাধি উপেক্ষা করিয়া কিরূপে মনঃশক্তি নিয়োজিত করেন তাহার পরিচয় অনেক মহৎ জীবনীতে পাওয়া যায়। আবার প্রাণের প্রেরণায় মানুষ, শারীরিক বিপদ কেন, মৃত্যুকেও উপেক্ষা করিতে পারে। সৈনিক রণক্ষেত্রে মৃত্যুকে তুচ্ছ করে; দেশহিতৈষী দেশের মঙ্গলের জন্য, দেশপ্রেমে মাতোয়ারা হইয়া মৃত্যুকে বরণ করিতে কুণ্ঠিত হন না। মানুষ উচ্চভাবের বশবর্ত্তী হইয়া, বিশ্বাসের জন্য বা প্রেরণাবশে গতানুগতিক জীবন উপেক্ষা করিতে পারে তাহার ভূরি ভূরি নিদর্শন পাওয়া যায়।

কিন্তু সকল মানুষ এই প্রেরণা চিরকাল অবলম্বন করিয়া চলিতে পারে না। প্রেরণা চকিতে বিদ্যুতের মত ঝিলিক দেয়; আবার মিলাইয়া যায়। সত্য রূপান্তরের জন্য তাই মানুষকে আশ্রয় করিতে হয় উর্দ্ধের ধর্ম্ম, আঁকড়াইয়া থাকিতে হয় সত্যকে, প্রেম জাগাইতে হয় সত্যের প্রতি। শুধু ইহাতেও সত্যে প্রতিষ্ঠিত হওয়া যায় না—ইহা প্রাথমিক উপায় মাত্র। প্রতিষ্ঠিত হইতে হইলে চাই সত্য জ্ঞান, বিশ্বসত্তার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম স্তরের অভিজ্ঞতা। তপস্যা, ধ্যান, প্রার্থনায় এই অভিজ্ঞতার আভাস দেয়। ফলে জন্মে দৃঢ় প্রত্যয়, অটুট বিশ্বাস, লক্ষ্যে অব্যর্থ দৃষ্টি। তাহার পর বিকাশ পায় দিব্য চেতনা। প্রথমে বিকাশ পায় হৃদয়ে, তাহার পর মনে, ক্রমে প্রাণে, অবশেষে দেহে—এমন কি চেতনার অন্তর্লীন স্তরে পর্য্যন্ত;—যেমন সূর্য্য উঠিলে প্রথমে আলোক পড়ে তরুশিরে, তাহার পর সমস্ত প্রকৃতির উপর আলো ছড়াইয়া পড়ে।

চৈতন্যের আলোকে, শক্তিতে, আনন্দে যখন আমাদের সত্তা ভরিয়া উঠে, তখন মানুষের মনে হয় যে আর জরা-মরণশীল, অহংবুদ্ধিপরায়ণ

ক্ষুদ্র মানুষ নয়—সে অনন্ত জ্ঞান, শক্তি ও আনন্দের অগণন কেন্দ্রের অন্যতম। মানবজাতিকে তখন মনে হয় বিরাট চৈতন্যময় পুরুষের বহিঃরূপ—মানুষের মধ্যে লীলায়িত হইতেছে ভাগবত শক্তি। মানুষের কর্ম্ম তখন আর অহংকে কেন্দ্র করিয়া চলে না, তাহা পরিণত হয় বিশ্ব-যজ্ঞে। ইহাই উপনিষদের 'তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ'।

এই মরজগতে, অজ্ঞান-অন্ধকার সমুদ্রে ভাসমান আমাদের দিশারী কে? চিরন্তন দিশারী হৃদিস্থিত হৃষীকেশ, যিনি অলক্ষ্যভাবে অন্তরে থাকিয়া সমস্তই নিয়ন্ত্রিত করিতেছেন। কিন্তু আমাদের বহির্ম্মুখী জীবনে ত' বাহিরের অবলম্বন চাই। এ অবলম্বন হইতেছেন গুরু—লৌকিক গুরু নহেন, যোগ-গুরু। গুরুর ভিতর আমরা আদর্শের অভিব্যক্তি দেখিয়া তাঁহাকে হৃদয়ে বরণ করি। আধুনিকদিগের গুরুবাদে ঘোরতর আপত্তি শুনা যায়। কিন্তু জাগতিক সাধারণ ব্যাপারেও আমরা গুরু বিনা জ্ঞান লাভ করিতে পারি না। অধ্যাত্ম-সাধনায়, পূর্ণ-যোগে গুরুই যে একমাত্র দিশারী ইহা একান্ত দাম্ভিক ছাড়া সকলেই স্বীকার করিবে। পূর্ণযোগ কোন বিশেষ মতবাদ নহে, এখানে জোর-জুলুম, নিয়মকানুন, দলপুষ্টি করার চেষ্টা প্রভৃতির স্থান নাই—ইহা হইতেছে মানবাত্মার বিশ্বাত্মাকে আবাহন, আত্মার শাশ্বত অভিযান, চেতনার পরম চেতনার সন্ধানে অভিসার, আমাদের খণ্ড-জীবনে পূর্ণতালাভের কৌশল। ইহার দিশারী না পাইলে 'ক্ষুরধার' পথ অতিক্রম করিব কি করিয়া? আর চাই এমন দিশারী যাঁহার পথের পূর্ণ অভিজ্ঞতা হইয়াছে, যিনি পথের রহস্যকে আয়ত্ত করিয়াছেন এবং লক্ষ্যে বিজয়কেতন স্থাপন করিয়াছেন।

বিংশ অধ্যায়

জগন্মাতার লীলা

সাধক যখন নিজের সত্তা বিশ্লেষণ করিয়া আত্মজ্ঞান লাভ করে, অজ্ঞান-অন্ধকার হইতে আলোকের সন্ধান পায় ; যখন হৃদয়-দ্বার খুলিয়া যায়, মন গতানুগতিক সংস্কারের, বিচারবুদ্ধির গণ্ডী কাটাইয়া সত্য-জ্ঞানের জন্য উন্মুখ হয়, যখন সে সমগ্র সত্তা দিয়া শাশ্বতের স্পর্শ পাইতে চায় এব সেই স্পর্শে রূপান্তরের জন্য প্রস্তুত হয়, তখন সে এক অপূর্ব্ব জগতের সন্ধান পায় যেখানে পরম চেতনা পূর্ণভাবে সক্রিয়, যেখানে চলে জগন্মাতার অবাধ লীলা—যেখানে সমস্তই তাঁহার সত্তার সত্তা, তাঁহারই চেতনার উর্ম্মি। জগন্মাতার পরাজ্ঞান, পরাশক্তি, পরা-আনন্দ, পরা-লীলার আশ্রয় লওয়া যোগমার্গে শ্রীঅরবিন্দের অব্যর্থ নির্দ্দেশ।

তিনি "The Mother" ("মা") নামক পুস্তকের শেষভাগে লিখিয়াছেন : "এই অন্ধ তমসাচ্ছন্ন, মিথ্যামায়ার, মৃত্যু ও দুঃখের জগতে, আবরণ ভেদ করিয়া, আধারকে উপযুক্তভাবে গঠিত করিয়া, সত্য, আলোক, দিব্যজীবন ও অমরত্বের আনন্দ আনিতে মানুষের চেষ্টা, এমন কি তপস্যাও সমর্থ নয়—সমর্থ মাতার শক্তি।"*

জগৎ হইতে, মানব হৃদয় হইতে যখন দিব্যের জন্য আকুল আহ্বান উঠে, দিব্য যখন তাহাতে সাড়া দেন, তখন মানব-আধারে, এই

* The Mother's power and not any human endeavour and tapasya can alone tear the lid and covering and shape the vessel and bring down into this world of obscurity and falsehood and death and suffering Truth and Light and Life divine and the immortal's Ananda.

আলো-আঁধারের জগতে যে শক্তি সক্রিয় হন, তিনিই হইতেছেন দিব্যশক্তি, পরাপ্রকৃতি, জগন্মাতা।

মানুষের তপস্যা মানবসত্তার পূর্ণ রূপান্তর সাধন করিতে সমর্থ নয় কেন? মানুষ সাধারণতঃ যে শক্তি লইয়া কার্য্য করে, তাহা বিশ্ব-শক্তির অংশ হইলেও, আধারের খণ্ডতার জন্য সীমাবদ্ধ। যখন সে সীমা অতিক্রম করিতে চায়, তখনই তাহাকে আশ্রয় লইতে হয় ঊর্দ্ধের অবারিত শক্তির, ইন্দ্রিয়জগতে যাহার মাত্র প্রচ্ছন্ন আভাস পাওয়া যায়। মানুষের তপস্যা সেই শক্তির আশ্রয় লাভের চেষ্টা। মানুষের তপস্যা যদি অখণ্ড না হয়, তাহা হইলে সে যখন তুরীয় অবস্থা হইতে নামিয়া আসে, তখনই প্রাকৃতিক চেতনায় ফিরিয়া আসে। এই অবস্থায় মনে হইতে পারে ঊর্দ্ধ্ব ও নিম্নের এই দুই জগৎ, ঊর্দ্ধ্ব ও নিম্ন চেতনা বিচ্ছিন্ন। মানুষের খণ্ডজ্ঞানের জন্য, মনোবৃত্তির জন্য এইরূপ হইয়া থাকে।

এই কারণেই শ্রীঅরবিন্দ অতিমানসের—যাহাকে তিনি Supramental বলিয়াছেন—আশ্রয় লইতে বলিয়াছেন। অতিমানসের আশ্রয় লইলে মানুষের কতকগুলি দিব্যবৃত্তি পরিস্ফুট হইতে থাকে, যাহাতে তাহার অন্তর আলোকিত হয়, অব্যর্থ জ্ঞানদৃষ্টি জন্মে—জ্ঞান-লাভের জন্য তাহাকে শুধু ইন্দ্রিয়গত বুদ্ধি বা যুক্তিতর্কের উপর নির্ভর করিতে হয় না। সে ক্রমশঃ উপলব্ধি করিতে পারে যে, সে শুধু নিম্ন-জগতের জীব নহে—সে এক বিরাট সত্তা, অপরিমেয় জ্ঞান, স্বতঃস্ফূর্ত্ত অবাধশক্তি ও ভূমার আনন্দের মধ্যে রহিয়াছে। ইহা সর্ব্বব্যাপী এবং অন্তরে ইহা সক্রিয়। তাহার চেতনা প্রসারিত হইলে তাহার প্রতীতি জন্মে এই সত্তা, জ্ঞান, শক্তি ও আনন্দে সে শুধু বিধৃত নয়, ইহাতে গঠিতও। যখন এই উপলব্ধি নিবিড় হয় তখন মানুষের জীবন হয় সাব-লীল—এক মহান্ ছন্দের বিকাশ; তাহার কর্ম্ম হয় অবাধ—সে কর্ম্মকে আর নিজের কর্ম্ম বলিয়া দেখে না, দেখে যে ইহা পরাশক্তি, জগন্মাতার লীলার বহিস্তরঙ্গ। সে অনুভব করে সে নিজেই এই দিব্যশক্তির বিকাশের অন্যতম আধার।

শ্রীঅরবিন্দ নির্দ্দেশ দিয়াছেন যে, এই মহান্ উপলব্ধি লাভ করিতে হইলে সাধককে পূর্ণভাবে, সমগ্র সত্তায় এই মহাশক্তির নিকট আত্ম-সমর্পণ করিতে হইবে। আত্মসমর্পণ বলিলেই আমাদের সাধারণ মনে বিজেতা-বিজিতের সম্বন্ধ জাগিয়া উঠে ; কিন্তু দিব্য-সমর্পণে এইরূপ ভাবের লেশমাত্র নাই। এমন কি ইহা লৌকিক ত্যাগও নহে। ইহা খণ্ডতার অখণ্ডের নিকট সমর্পণ, সসীমের অসীমকে বরণ, অহংএর আত্মাকে আহ্বান। আমাদের অহং কি ? কতকগুলি সংস্কারবিশিষ্ট, নিজ খণ্ড-শক্তিতে বিশ্বাসী, স্বল্প ও অস্থিত আনন্দের জন্য লালায়িত, নিজস্বষ্ট মনোজগতে বিচরণ-প্রয়াসী যে চেতনা তাহাই আমাদের অহঙ্কার। যখন এই চেতনা স্বল্পে তুষ্ট না থাকিয়া জগৎকে চায়, কূপ-মণ্ডূক না থাকিয়া বৃহদাকাশের পরিচয় পাইতে চায়, তখন ইহাকে আশ্রয় করিতেই হইবে, যুক্ত হইতেই হইবে, সমর্পণ করিতেই হইবে অখণ্ড চেতনার, পূর্ণজ্ঞানের নিকট—অভীপ্সা করিতে হইবে আনন্দ-লোকের। তখন খণ্ড চেতনার আধার মানুষকে অন্তর্ম্মুখী হইতে হইবে, নিছক বহির্ম্মুখী ব্যবহারিক বুদ্ধিপরায়ণ থাকিলে চলিবে না। তাহাকে সন্ধান করিতে হইবে চেতনার উৎসের, পর্য্যবেক্ষণ করিতে হইবে চেতনার লীলাভঙ্গী—শুধু এই দৃশ্যমান জগতে নয়, উর্দ্ধের জগতে, যেখানে চৈতন্যের লীলা অব্যাহত, যেখানে চৈতন্য স্বরাট, সম্রাট—যে জগৎ হইতে সকল জগতের স্বষ্টি, দার্শনিক যাহাকে বলেন কারণ-জগৎ।

"যোগের পথে আলো"-তে শ্রীঅরবিন্দ নির্দ্দেশ করিয়াছেন মানুষ কিরূপে এই মহাচেতনার, পরাশক্তির, পূর্ণ আলোক ও আনন্দের অভিজ্ঞতা লাভ করিতে পারে। যোগমার্গে সাধক শুধু অসীম শান্তি, নিস্তব্ধতা, বিশালতা অনুভব করে না, সে উপলব্ধি করিতে পারে এক বিরাট শক্তি, যাহাতে সমস্ত শক্তি বিধৃত, যাহা সমস্ত শক্তির কারণ ; এক অদ্ভুত আলোক, যাহাতে পরিস্ফুট পরাজ্ঞান ; এক অপরিমেয় আনন্দ, যাহা জগতের সব মাধুরীর উৎস।

সাধক যখন বাহিরের চাঞ্চল্যমুক্ত হইয়া নিবিড় শান্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন এই দিব্যশক্তি তাহার আধারে সক্রিয় হয়। প্রথমে ইহা মস্তকে অবতরণ করে এবং সাধকের মনের অন্তর্লীন কেন্দ্রগুলিকে বিকশিত করে; পরে হৃদয়ে অবতরণের ফলে চৈত্যময় ও ভাবময় সত্তা মুক্ত হয়, নাভি ও অন্যান্য প্রাণকেন্দ্রে অবতরণ করিলে প্রচ্ছন্ন প্রাণশক্তি সাবলীল হইয়া উঠে, এবং অবশেষে যোগে যাহাকে মূলাধার বলা হয় তাহাতে অবতরণ করিলে দৈহিক সত্তা পায় পরম আলোকের স্পর্শ। শ্রীঅরবিন্দ বলিয়াছেন এই শক্তি সাধকের সমগ্র প্রকৃতিকে ধারণ করে—একেবারে নয়, এক এক অংশ লইয়া; তাহার পর যাহা বর্জনীয় বর্জন করে, যাহা রূপান্তরিত হওয়া প্রয়োজন তাহাকে রূপান্তরিত করে, নূতন যাহা সৃষ্টি করার প্রয়োজন তাহা সৃষ্টি করে। ইহা সমগ্র মানবসত্তার সমন্বয় সাধন করে, প্রকৃতিকে দেয় এক নূতন ছন্দ। সাধকের লক্ষ্য যদি আরও উর্দ্ধে হয়, তাহা হইলে এই শক্তিই আরও উচ্চতর শক্তি, আরও উচ্চতর প্রকৃতি তাহার আধারে বিকাশ করিতে পারে—এমন কি অতিমানসশক্তি ও সত্তা পর্য্যন্ত।

এই শক্তির কৃপায় সাধকের চেতনার রূপান্তর ঘটিলে সাধক মহাশক্তির পরিচয় পায়। মহাশক্তি কে, কিরূপ তাঁহার প্রকাশভঙ্গী—এসম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দ "মা" পুস্তকে যে হৃদয়গ্রাহী বর্ণনা করিয়াছেন তাহা পাঠ করিলে অপূর্ব্ব ভাবের সঞ্চার হয়, সমগ্র সত্তা যেন দীপ্ত হইয়া উঠে এবং মাতৃসাধক মাত্রেরই জগন্মাতার ক্রোড় আশ্রয় করিয়া পরম পূর্ণতা লাভ হয়।

বিশ্বে যাহা কিছু ঘটিতেছে তাহার পিছনে রহিয়াছেন দিব্য—তাঁহার শক্তিতেই সমস্ত বিকাশ পাইতেছে। দিব্য যোগমায়া দ্বারা নিজেকে আবৃত করেন, নিম্ন প্রকৃতিতে কার্য্য করেন জীবের অহং দ্বারা। যোগেও দিব্য হইতেছেন সাধক ও সাধনা। তাঁহার শক্তি, জ্ঞান, চেতনা, আনন্দ প্রভৃতি আধারে বিকাশ করেন, যখন আধার উহা গ্রহণে উন্মুখ হয়। (এই উন্মুখতা প্রকৃতির নিম্ন হইতে উর্দ্ধে

আবর্ত্তন)। এই বিকাশের ফলেই সাধনা সফল হয়, সাধকের সত্তা রূপান্তরিত হয়, সে আর নিম্নপ্রকৃতির ক্রীড়নক থাকে না, হয় উর্দ্ধ্বপ্রকৃতির আধার—মূর্ত্তরূপ।

জীব কিরূপে এই মহাশক্তির সাযুজ্য, সামীপ্য ও সালোক্য লাভ করিতে পারে শ্রীঅরবিন্দ তাহাও নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বিষয়মুখী, ইন্দ্রিয়গত বুদ্ধি যখন ঊর্দ্ধ্বশক্তি বিকাশের সঙ্কল্প করে, তখনই সে মহাশক্তির শরণাপন্ন হয়। প্রথমতঃ জীব এই ভাব লইয়া কার্য্য করে যে সে মহাশক্তির সেবার জন্য সৃষ্ট হইয়াছে, তাহার আত্মা ও দেহ এই উদ্দেশ্যেই সৃষ্ট; অহংবুদ্ধিবশে সে কোন কাজ করে না, নিজেকে সে মনে করে ভাগবত যন্ত্র। এমন কি যদি তাহার মনে হয় সে-ই সব করিতেছে, তাহা হইলে এই এই ধারণায় করে যে প্রতিটি কাজ জগন্মাতার তৃপ্তির জন্যই করিতেছে—তাহার নিজের কোন ফলাকাঙক্ষা নাই। তাহার একমাত্র পুরস্কার হইতেছে ক্রমশঃ দিব্যচেতনা, শান্তি, শক্তি ও আনন্দ লাভ করা। স্বার্থহীন কর্ম্মীর পক্ষে কর্ম্মের আনন্দ, কর্ম্মের দ্বারা আত্মোপলব্ধি কি যথেষ্ট পুরস্কার নহে?

অবশেষে সাধক উপলব্ধি করে তাহার কোন পৃথক সত্তা নাই, সে মহাশক্তির দ্বারা সৃষ্ট, বিধৃত, সে কর্ম্মী নয়, তাঁহার বিকাশের আধার মাত্র। সে উপলব্ধি করে সে জগন্মাতার কাজ করিতেছে না, জগন্মাতাই তাহাকে যন্ত্র করিয়া কাজ করিতেছেন—তাহার সব শক্তিই মা'র শক্তি; তাহার মন, জীবন, দেহ মা'র লীলার আধার—মা এইগুলির সহায়ে বিশ্বে নিজকে বিকশিত করিতেছেন। যদি সাধক মা'র কৃপায় এই চেতনা লাভ করে তখন তাহার পৃথিবীতে কোন দুঃখ ভয় থাকে না, তাহার হৃদয় মা'র অজস্র করুণায় ভরিয়া উঠে, তাহার সত্তা হয় শান্তিময়, আনন্দময়। তখন সে উপলব্ধি করে সে শুধু মা'র লীলার আধার নয়, সত্যই মা'র সন্তান, তাঁরই চেতনার, শক্তির সনাতন অংশ। সে অনুভব করে তাহাকে মা ধারণ করিয়া রহিয়াছেন, তাহার মধ্যেই মা বিরাজ করিতেছেন। আর সে অনুভব করে তাহার দৃষ্টি, চিন্তা, কার্য্য—এমন

কি তাহার শ্বাসপ্রশ্বাস, প্রতি অঙ্গসঞ্চালন মা'রই, তাহার নিজের নয়। সে উপলব্ধি করে মা তাঁর লীলার জন্য তাহাকে ব্যক্তিরূপে, শক্তির আধার-রূপে সৃষ্টি করিয়াছেন, গঠন করিয়াছেন—এই অজ্ঞান-জগতেও সে তাঁহা হইতে বিচ্ছিন্ন নয়, সে তাঁরই সত্তার সত্তা, চেতনার চেতনা, শক্তির শক্তি, আনন্দের আনন্দ।

যখন সাধকের অনুক্ষণ এই চেতনা থাকে, যখন কিছুতেই তাহার চেতনা অখণ্ডতা হারায় না, বিস্মৃতি আসিয়া বিচ্ছিন্নতা ঘটায় না, কিছুতেই তাহার অহংবুদ্ধি, খণ্ডবুদ্ধি, খণ্ডচেতনা বিকৃতি ঘটায় না, তখন মা তাঁর অতিমানস-শক্তি বিকাশ করেন—যে-শক্তি বিশ্বাতীত, যাহা সত্যজ্ঞানপ্রদায়িনী, যাহাতে সমগ্র সৃষ্টির ছন্দ বিধৃত, যাহা হইতেছে সমস্ত আনন্দের উৎস। মা তখন সাধকের সত্তাকে এমন জগতে লইয়া যান যেখানে তাঁহার লীলা অবারিত—সে হইতেছে মা'র নিজের জগৎ, যেখানে পরম সত্তা সচ্চিদানন্দরূপে বিরাজমান। সেই জগৎই স্বর্গ ও মর্ত্ত্যের মিলন-ভূমি—সেই জগতে উত্তীর্ণ হইলে ধরা স্বর্গে পরিণত হয়।

জগন্মাতার বিশ্বলীলা সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দ যে বর্ণনা করিয়াছেন তাহা অপূর্ব্ব, পরম রহস্যময়, সাধারণবুদ্ধির ধারণাতীত। যোগাশ্রয়ী সাধক মায়ের কৃপায়, গুরুর কৃপায় তাহা উপলব্ধি করিতে পারে। জগন্মাতা বিশ্বব্যাপী এক অখণ্ড চেতনাশক্তি, কিন্তু তাঁহার অভিব্যক্তির এত অজস্রধারা যে, অতি তীক্ষ্নধীর পক্ষেও তাহা অনুসরণ করা সম্ভব নয়।* পরমসত্তা মাতৃশক্তির সহায়ে ঈশ্বর-শক্তি ও পুরুষ-প্রকৃতিরূপে অসংখ্য জগতে, সৃষ্টির অসংখ্য স্তরে দেব ও দেবশক্তিরূপে বিকশিত। আমাদের জানা ও অজানা যত জগৎ আছে সমস্তই মাতৃশক্তিতে মূর্ত্ত। সমস্তই হইতেছে পরমপুরুষের সহিত জগন্মাতার লীলা ; মা'ই অনন্তের সনাতন সত্তার রহস্য বিকাশ করিতেছেন। মা পরমসত্তার ইচ্ছায়

* বেদানুসন্ধিৎসার ফলে শ্রীঅরবিন্দের যে অনুরূপ অভিজ্ঞতা লাভ হইয়াছিল তাহা পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে।

সমস্ত বিকাশ করেন—সৃষ্টির সমস্ত গতিভঙ্গী মা'য়ের হ্লাদিনী-শক্তিতে নিরূপিত হয়।

আমরা মন, প্রাণ ও জড় এই ত্রিধারা বিকাশের জগৎকে জানি, কিন্তু ইহার উর্দ্ধে যে কত অজানা জগৎ রহিয়াছে তাহার পরিচয় পাইতে হইলে আমাদের মহাশক্তির আশ্রয় লইতে হইবে। অবশ্য পরাচেতনা হইতে এই বিচ্ছিন্ন জগৎ মা'ই ধারণ করিয়া আছেন এবং ইহাকে দুর্জ্ঞেয় লক্ষ্যে নিয়ন্ত্রিত করিতেছেন। কিন্তু আমরা যদি উর্দ্ধের অভিলাষী হই তাহা হইলে মা'র শরণাপন্ন হইতে হইবে। শরণাপন্ন হইবার সুযোগ মা'ই দিয়াছেন, কারণ তিনি স্বয়ং জগতে চারিটি মূর্ত্তিতে নিজকে বিকাশ করিয়াছেন। একটি হইতেছে মায়ের জ্ঞানঘনমূর্ত্তি—মহেশ্বরী, অপরটি শক্তিঘন মূর্ত্তি—মহাকালী ; আর একটি পরমা শ্রীর মূর্ত্তি মহালক্ষ্মী ; আর একটি পরমপূর্ণতার সার্থকতার ও নৈপুণ্যের মূর্ত্তি—মহাসরস্বতী। সাধক মা'র আশ্রয় লইলে তাহার আধারে বিকাশ পায় জ্ঞান, শক্তি, শ্রী, পূর্ণতা।

এই মূর্ত্তিগুলি হিন্দুর বিশেষ পরিচিত, কিন্তু বাহিরের লৌকিক পূজায় অনেক সময়ে আমরা ইঁহাদের তত্ত্ব উপলব্ধি করিবার চেষ্টা করি না। এই কারণে আমাদের আধুনিক মন সাধারণত ইহাদের পূজা ও সাধনাকে পৌত্তলিকতা বলিয়া উড়াইয়া দিতে চাহে। প্রাচীন-কালে এদেশীয় সাধকগণ ধ্যানে ভাগবতসত্তার বিভিন্ন রূপ দেখিয়া মূর্ত্তিতে সেগুলি ফুটাইয়া তুলিয়াছিলেন, ইহাদের সবগুলি নিছক কল্পনাপ্রসূত নহে।* আমরা আর্ট কি কল্পনা বলিয়া উড়াইয়া দিই, না মানসমূর্ত্তি বলিয়া বরণ করি?

গভীর ধ্যানে সমস্ত জিনিষের কারণ-রূপ ফুটিয়া উঠে। কারণ

---

* The One whom we adore as the divine Conscious Force that dominates all existence, one and yet so many-sided that to follow her movement is impossible even for the quickest mind and the freest and most vast intelligence.—The Mother.

বলিয়া হয়ত তাহা মানুষের বহির্জীবনে ততটা প্রয়োজনীয় নয়, কিন্তু মানুষের মনের কাছে তাহার কি মূল্য তাহা শিল্পী, কবি, সাহিত্যিক মাত্রেই জানেন। সৃষ্টি প্রথমে হয় কারণে, রূপান্তরের সূচনা দেখা যায় কারণে—পরে তাহা বিকাশ পায় কার্য্যে, রূপে। ইহা সাধারণ অভিজ্ঞতা। এইজন্যই রূপের পিছনে তত্ত্বের অনুসন্ধান করিতে হয়; কার্য্যের কারণ, উদ্দেশ্য নির্ণয় করিতে হয়।

গীতার দশম অধ্যায় আলোচনা প্রসঙ্গে শ্রীঅরবিন্দ দেখাইয়াছেন যে, সক্রিয় অবস্থায়, অর্থাৎ সৃষ্টির বিকাশে, ভাগবতসত্তার চারিটি ধারা—knowledge, power, harmony and work (জ্ঞান শক্তি শ্রী ও কর্ম্ম)। মানবজাতির মধ্যেও আমরা এই চার-ধর্ম্মী লোক দেখি। এক শ্রেণী জ্ঞানী, যাঁহারা জ্ঞানের চর্চায় জীবন যাপন করেন (ভারতে যাঁহাদের ব্রাহ্মণ বলা হইত); আর এক শ্রেণী শক্তি-আশ্রয়ী (ভারতের ক্ষত্রিয়, যাঁহারা সমাজ-শৃঙ্খলা রক্ষা করেন); অপর শ্রেণী বহির্জীবন পূর্ণ ও শ্রীসম্পন্ন করেন (ভারতের বৈশ্য); চতুর্থ শ্রেণী হইতেছেন কর্ম্মী যাঁহারা সমাজ-সেবা করেন, যাঁহাদের উপর সমাজের জীবিকার জন্য নির্ভর করিতে হয় (ভারতের শূদ্র, যে কথাটি ব্যবহারে হীন অর্থ পাইয়াছে)। আধুনিক জাতিভেদ বংশগত, কৃত্রিম; কিন্তু উপরোক্ত জাতিভেদ প্রকৃতির বিভিন্নতার উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল, কাজেই ছিল স্বাভাবিক।*

সমাজে যে ব্যবস্থা হউক না কেন, প্রতি মানুষের মধ্যে কি এই চারিটি ধারা নাই? মানুষ চায় জ্ঞান, শক্তি (পরপীড়নের জন্য নহে, আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য), জীবনে চায় শ্রী ও সুষমা এবং এইগুলির অভিব্যক্তি করিতে যায় কর্ম্মে—অর্থাৎ নিখুঁতভাবে কর্ম্ম করিয়া এইগুলি ফুটাইতে

* পণ্ডিতেরা অনুমান করেন আর্য্য সভ্যতা বিস্তৃতি লাভ করিবার পূর্ব্বে প্রতি ব্যক্তিই চার-ধর্ম্মী ছিলেন। বর্ত্তমান যুগেও দেখা যাইতেছে পূর্ণ পুরুষ হইতে হইলে ব্যক্তি মাত্রেরই চার-ধর্ম্মী হওয়া প্রয়োজন। জাতিভেদ, শ্রেণীবিভাগ অবস্থা বিপর্য্যয়ে ক্রমশঃ দূর হইতেছে।

চায়—অন্তরের মহৎ প্রেরণাগুলি বাহিরের স্বষ্টিতে বিকাশ করিতে চায়। জ্ঞান, শক্তি, শ্রী ও কর্ম্মের সমন্বয়ে মানুষের জীবন পূর্ণ হয়, কর্ম্মও হয় নিখুঁত। জ্ঞান, শক্তি ও সৌন্দর্য্যবুদ্ধি না থাকিলে কর্ম্ম হয় যান্ত্রিক—তাহাকে বিড়ম্বনা বলিলেও হয়।

মানুষের মনুষ্যত্ব, মানুষের সভ্যতা এই চারিটি শক্তি বিকাশের ফল। মানুষ পূর্ণভাবে ইহাদের প্রত্যেকটির আশ্রয় লইতে পারে না বলিয়া তাহার জীবনে এত অশুভ বিড়ম্বনা, অজ্ঞান ও দুঃখ—জীবন ছন্দহীন। এই কারণেই শ্রীঅরবিন্দ জগন্মাতার এই চারিটি প্রকৃতির শরণাপন্ন হইতে বলিয়াছেন, আমাদের সত্তায় পরাশক্তির এই চারি প্রকৃতি বিকাশ করিতে বলিয়াছেন। তিনি নির্দ্দেশ দিয়াছেন যে, যতক্ষণ এই চারিটি প্রকৃতির পূর্ণ বিকাশ ও অবাধ লীলা না হয়, ততক্ষণ জগন্মা-তার উর্দ্ধতন প্রকৃতি, মা'র সত্তার অন্যান্য রূপ সাধকের হৃদয়ে পরিস্ফুট হয় না।* আমাদের বহির্ম্মুখী মন, চঞ্চল হৃদয় ও জড়ধর্ম্মী দেহের পক্ষে এ সমর্পণ মুখের কথা নয়। মা'র এক একটি প্রকৃতি ও রূপ লইয়া যুগ যুগ সাধনা করিতে হয়; কিন্তু মায়ের কৃপায় সাধকের পক্ষে একটা যুগ এক মুহূর্ত্তে পরিণত হইতে পারে।

শ্রীঅরবিন্দ বিশেষভাবে বলিয়াছেন যে, আমাদের খণ্ডবুদ্ধি, স্বল্প-পরিসর মন, আবেগচঞ্চল হৃদয় ও গতানুগতিক দেহধর্ম্ম লইয়া মা'র সত্তা নিরূপণ করিবার চেষ্টা বৃথা। যদি আমরা সমগ্র প্রকৃতি ও জীবনের রূপান্তরের জন্য উদ্‌গ্রীব হই, যদি আমাদের দেহের প্রতিটি কোষ পর্য্যন্ত মায়ের শান্তি, শক্তি, আনন্দদায়িনী চেতনার স্পর্শ পাইবার জন্য উন্মুখ হয়, তাহা হইলেই মা তাঁহার শক্তি বিকাশ করেন, সাধকের চেতনা, এমন কি আধারকে পর্য্যন্ত, রূপান্তরিত করেন। আর আমরা

---

* Only when the Four have founded their harmony and freedom of movement in the transformed mind and life and body, can those rarer Powers manifest in the earth movement and the supramental action becomes possible.—The Mother.

যদি অখণ্ডভাবে মা'কে না চাহি, যদি মাত্র তাঁহার করুণা-কণা যাজ্ঞা করি, তাহা হইলে আমদের চেতনায় মা'র প্রকৃতির ক্ষণিক বিজলী আভা দেখা যাইবে—মা একবার দেখা দিবেন, আবার লুকাইবেন। বিমূঢ় হইয়া যদি আমরা গর্ব্বভরে অহংবুদ্ধির উপর নির্ভর করি, মা তাহাতে বাধা দিবেন না, কিন্তু আমরা চলিব ধ্বংসের পথে।* গীতায় ভগবান বলিয়াছেন বিমূঢ়াত্মা বিনাশ পায়।

মা বিশ্বজননী, কিন্তু সৃষ্টির উপর তাঁহার আসক্তি নাই। তাই একদিকে তিনি আর্ত্তকে দেন আশ্রয়, পরম অভয়, তেমনি প্রয়োজন বোধ করিলে, ভাগবত উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সৃষ্টি ধ্বংস করিতে পশ্চাৎ-পদ হন না। আমরা যখন দুর্ব্বুদ্ধিপরায়ণ হই, আমাদের হৃদয়, মন, দেহ যখন কলুষিত হয়, তখন মায়ের খড়্গ দেখিয়া আমাদের অন্তরাত্মা কাঁপিয়া উঠে; কিন্তু তিনি নির্ম্মম হস্তে অশুভ ধ্বংস করেন শুভ সৃষ্টি করিবার জন্যই।

কিন্তু মা শুধু সৃষ্টির বাহিরে দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা নহেন, তিনি নিজেই এই অজ্ঞানের আবরণ গ্রহণ করিয়া প্রচ্ছন্নভাবে সৃষ্টির বিবর্ত্তনে সহায়তা করিতেছেন। ভক্ত মায়ের পরিচয় পাইয়া অনেক সময়ে ব্যাকুল হয় যে, মা'ই যদি সব জিনিষের পিছনে রহিয়াছেন, তাহা হইলে তিনি ত্বরিতগতিতে সমস্ত অশুভ ধ্বংস করিয়া সৃষ্টির কল্যাণ করেন না কেন? মানুষের মন সব বিষয়ে ব্যস্ত; দৈবের কেরামতি দেখিবার জন্য সে বিশেষ উৎসুক। কিন্তু ভাগবত চেতনার ক্রিয়া ত আধ্যাত্মিক ভোজবাজি (শ্রীঅরবিন্দ গীতাভাষ্যে যাহাকে spiritualistic fireworks বলিয়াছেন) নহে—তাহার উদ্দেশ্য অজ্ঞানের মধ্যে জ্ঞান বিকাশ

* In each man she answers and handles the different elements of his nature according to their need their urge and the return they call for, puts on them the required pressure or leaves them to their cherished liberty to prosper in the ways of the Ignorance or to perish.—The Mother.

করা, অজ্ঞানকে জ্ঞানে রূপান্তরিত করা। তাই মা'র শক্তি কতকটা অজ্ঞান আবরণের মধ্যে লুকান (partly she veils and partly she unveils her knowledge and her powwer); এমন কি অনেক সময়ে তিনি মানুষের মনের গতি, প্রাণের আবেগ, দেহের আকৃতিতে সাড়া দিয়া অদ্ভুত কৌশলে তাহাদের রূপান্তরে সহায়তা করেন।* এইজন্যই তাঁহাকে অঘটনঘটনপটীয়সী বলে।

কি অসীম করুণায় মা সৃষ্টির বিবর্ত্তনের জন্য, জীব ও জীবনকে অজ্ঞান হইতে ত্রাণ করিয়া তাঁহার আলো ও আনন্দের রাজ্যে লইবার জন্য এই ধূসর ধরায় অবতরণ করিয়াছেন! মা যদি অবতরণ না করিতেন, তাহা হইলে জীব কখনই শান্তি, আনন্দ, পরিপূর্ণতা ও মুক্তি লাভ করিতে পারিত না; তাহাকে অসহায়ভাবে, যন্ত্রবৎ, পশুজগতের ন্যায়, নিম্নপ্রকৃতির নিয়মাধীন থাকিতে হইত—সে ঊর্দ্ধের স্বপ্ন দেখিতেও সক্ষম হইত না। কি অনুপম ভাষায় শ্রীঅরবিন্দ মা'য়ের এই মহান্ ত্যাগের কথা লিখিয়াছেন!

"সন্তানের উপর গভীর বিপুল স্নেহবশতই তিনি এই তমসার আবরণখানি নিজের উপর টেনে নিতে সম্মত হয়েছেন। অজ্ঞানের অনৃতের শক্তিরাজির আক্রমণ, তাদের প্রভাবের উৎপীড়ন সব কৃপা ক'রে সহ্য করতে স্বীকৃত হয়েছেন, মৃত্যুর অন্য রূপ যে জন্ম সেই তোরণটি পার হ'য়ে চলে এসেছেন। সৃষ্টির যত দুঃখ, বেদনা ও যন্ত্রণা নিজের উপরে গ্রহণ করেছেন—কারণ, তিনি হয়ত দেখেছিলেন এক-মাত্র এই পন্থায় সে-সৃষ্টিকে জ্যোতির আনন্দের সত্যের অনন্তজীবনের মধ্যে উন্নীত করা যেতে পারে। এই যে বিপুল আত্মবলি, এরই সময়ে সময়ে নাম দেওয়া হয় পুরুষ-যজ্ঞ—কিন্তু গভীরতর অর্থে একে বলা যায় প্রকৃতির যজ্ঞ—ভাগবতী মায়ের নিঃশেষ আত্মবলি!"†

* The Mother is dealing with the Ignorance in the fields of the Ignorance; she has descended there and is not all above.

—The Mother.

† "মা" শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্তের অনুবাদ

একবিংশ অধ্যায়

সভ্যতা বিবর্ত্তনের ধারা

মানুষের বিবর্ত্তনের প্রেরণা হইতেছে সর্ব্বতোভাবে পূর্ণতালাভ করা—জ্ঞানে, কর্ম্মে ও সৌন্দর্য্যসৃষ্টিতে। সভ্যতার বিবর্ত্তনেও আমরা এই প্রেরণা পাই। প্রথমতঃ মানুষের মূল লক্ষ্য ছিল শুধু দৈহিক ক্ষুধার পরিতৃপ্তি করা। তারপর সে চলিতে লাগিল প্রাণের প্রেরণায়; অবশেষে তাহার প্রগতি নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে মানসিক আদর্শ। মানুষ শুধু ব্যক্তিগত সুখস্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা করিয়া তৃপ্ত হয় নাই, সে গড়িয়াছে সমাজ, জাতি; সৃষ্টি করিয়াছে ধর্ম্ম, এবং প্রেরণা পাইয়াছে মৈত্রীর। এই প্রেরণাই মানুষকে নিছক প্রাকৃতিক জীবন হইতে তুলিয়াছে উর্দ্ধে। মানুষের ভিতর দিয়া উর্দ্ধের প্রেরণা জাগানই প্রকৃতির যোগ; নিম্ন-প্রকৃতিই বিবর্ত্তন লাভ করিতেছে উর্দ্ধ-প্রকৃতির দিকে। মানুষের মধ্যে যখন এই উর্দ্ধের প্রেরণা জাগে তখনই জীবন সম্বন্ধে তাহার দৃষ্টি-ভঙ্গী যায় বদলাইয়া; সে শুধু ক্ষুৎপিপাসা প্রভৃতি প্রাকৃতিক বৃত্তিগুলি চরিতার্থ করিয়া তৃপ্ত হয় না, তাহার সমগ্র জীবনকে উচ্চতর আদর্শে রূপান্তরিত করিতে চায়। সে এই বৃত্তিগুলি স্থূলভাবে ভোগ করিয়া তৃপ্ত হয় না, তাহাতে সূক্ষ্মরস আস্বাদন করিতে চায়। তাহার নূতন দৃষ্টিভঙ্গীর ফলে সে ব্যক্তিগত রূপান্তর ঘটাইয়া তৃপ্ত হয় না, সে মহান্ আদর্শে সমাজকে, জাতিকে, সমগ্র মানবজাতিকে রূপান্তরিত করিতে চায়—বহুর মঙ্গলের জন্য স্বার্থ তুচ্ছ করিয়া, ব্যক্তিগত শান্তি উপেক্ষা করিয়া, মানবসেবায় আত্মনিয়োগ করিয়া। তখন আত্মপ্রেম মানব-প্রেমে রূপান্তরিত হয়।

বুদ্ধের সম্বন্ধে একটি গল্প আছে (শ্রীঅরবিন্দ স্মরণ করাইয়াছেন) যে, নির্ব্বাণ-স্বর্গের তোরণে আসিয়া তিনি পৃথিবীর দিকে দৃষ্টিপাত

করিলেন। মানবের দুঃখে আবার তাঁহার হৃদয় দ্রবীভূত হইল, তিনি আর স্বর্গে প্রবেশ করিলেন না, মানবসেবার জন্য মর্ত্ত্যেই রহিয়া গেলেন। দেশে দেশে এইরূপ মানবপ্রেমিক জন্মিয়াছেন বলিয়া মানুষ মনুষ্যত্ব লাভ করিয়াছে, প্রেম শিখিয়াছে, স্বার্থ বিসর্জন করিতে প্রেরণা পাইয়াছে, সমষ্টির জন্য কাজ করিতে শিখিয়াছে। সমাজ-প্রেমিক সমাজের সেবা করিয়া তাহার মঙ্গল ও উন্নতি সাধন করিয়াছেন; দেশপ্রেমিক দেশের ও জাতির সেবা করিয়া তাহাকে সমৃদ্ধ ও গৌরবান্বিত করিয়াছেন; সর্ব্বোপরি মানবপ্রেমিক মানব-জাতির মধ্যে মৈত্রী প্রচার করিয়া মানবধর্ম্ম স্থষ্টি করিয়াছেন, যাহা সমগ্র মানবজাতিকে এক মহাজাতিতে পরিণত করিবার প্রেরণা জাগাইতেছে।

তবু একথা বলা চলে না যে, মানবসভ্যতার নিরবচ্ছিন্ন প্রগতি হইয়াছে। একদিকে যেমন বুদ্ধ, চৈতন্য, কন্‌ফুসিয়াস, লাওৎসে, যীশুখৃষ্ট, মহম্মদ প্রভৃতি মানবপ্রেমিকের আবির্ভাব হইয়াছে, তেমনি অপরদিকে দেশে দেশে, যুগে যুগে নরবিদ্বেষী, ক্রূরপ্রকৃতি, নিষ্ঠুর, পরাক্রান্ত ব্যক্তিও জন্মিয়াছে, যাহারা নররক্তে পৃথিবী প্লাবিত করিয়াছে। যুদ্ধের বিভীষিকা ছাড়াও, অকারণে যে কত ব্যাপক নরহত্যা হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই—বিংশশতাব্দীতেও তাহা বিজ্ঞানের সহায়ে ব্যাপকতর ও ভীষণতর হইয়াছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রাক্কালে ফ্যাসি-বর্ব্বরতার পুনরাবর্ত্তনে ব্যথিত হইয়া বিলাতের সুপ্রসিদ্ধ ধর্ম্মযাজক ডীন ইঞ্জে তিনটি ইতিহাসপ্রসিদ্ধ নরবিদ্বেষীর কীর্ত্তিকাহিনী আলোচনা করিয়াছিলেন—তাঁহারা হইতেছেন রোমক সম্রাট নীরো, জঙ্গীস খাঁ ও রুশিয়ার উন্মাদ সম্রাট আইভান দি টেরিব্‌ল, ভয়াবহ আইভান। বাস্তবিক ইঁহারা যেরূপ অহেতুক হত্যাতাণ্ডব করিয়াছিলেন তাহার লোমহর্ষণ কাহিনী পড়িয়া মনে হয়, দানব আর রাক্ষস ত এই! ইঁহারা পৌরাণিক অসুর ও রাক্ষসদের ভীষণতা ম্লান করিয়াছেন। কিন্তু তাহা অপেক্ষা ব্যাপকতর ও ভয়াবহ জার্ম্মানীতে নাৎসী হস্তে ইহুদীদের বৈজ্ঞানিক ও অবৈজ্ঞানিক ভাবে নিধন। ভারতেও স্বাধীনতালাভের

ক্ষণে মুসলমান ও হিন্দুর হত্যাতাণ্ডব ভারতসভ্যতার উপর দুরপনেয় কলঙ্ক লেপন করিয়াছে।

ডীন ইঙ্গে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্ব্বে পৃথিবীর অবস্থা দেখিয়া আশঙ্কা করিয়াছিলেন যে আবার এইরূপ ভয়ঙ্করপ্রকৃতি লোকের আবির্ভাব হওয়া বিচিত্র নয়। হইয়াছিল তাহাই। তিনি আলোচনা করিয়াছিলেন—কি উপায়ে ইহাদের তাণ্ডব ব্যর্থ করা যায়। তাঁহার যুক্তি ছিল যে জনসাধারণ যদি উপযুক্তভাবে শিক্ষিত হয় তাহা হইলে ঔদার্য্যে দয়া, প্রেম প্রভৃতি সদ্‌গুণরাজি বিকশিত হইবে, এবং ভীষণ প্রকৃতি-বিশিষ্ট কোন ব্যক্তির আবির্ভাব হইলেও মানবজাতি সঙ্ঘবদ্ধভাবে তাহার তাণ্ডবলীলা রোধ করিতে পারিবে। তাণ্ডবলীলা রোধ হয় নাই কিন্তু কয়েকটি জাতির মিলিত শক্তিতে তাণ্ডবপরায়ণ আসুরিক জাতিগুলির শক্তি চূর্ণ হইয়াছিল।

কিন্তু এই নিষ্ঠুরতা কি শুধু ব্যক্তিগত প্রকৃতির জন্য? কত জাতিগত ধর্ম্মগত নিষ্ঠুরতার সাক্ষ্য ইতিহাসে পাওয়া যায়; ভারতেও কি চোখের সামনে আমরা তাহা দেখি নাই? আমরাই চোখের উপর দেখিয়াছি ধ্বংসলীলা হইয়াছে নৈর্ব্যক্তিক—দেখিয়াছি জাতিগত ও ধর্ম্মগত নিষ্ঠুরতা বর্ব্বরতা ক্রূরতা এবং তাহার ভয়াবহ ব্যাপকতা। একা জঙ্গীস বা নীরো এত নিরপরাধ মানব-জীবন ধ্বংস করিতে পারে নাই—যাহা ব্যাপক বিমানাক্রমণের ফলে এবং আণবিক বোমার ব্যবহারে হইয়াছে। হিরোসিমা ও নাগাসাকিতে এক মুহূর্ত্তে লক্ষাধিক লোক জীবন হারাইয়াছিল।

সভ্যতার প্রগতিতে, জ্ঞানের বিকাশে, বিজ্ঞান-চর্চার ফলেই যে মানুষের ধ্বংসতাণ্ডবের শক্তি বাড়িয়াছে এ কথা আজ সকলেই বলেন। পাশ্চাত্যের অনেকেও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্ব্বে সভ্যতার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে চিন্তিত হইয়াছিলেন; এক্ষণে আণবিক বোমার পরিণামে মানবের চরম গতি সম্বন্ধে সকলেই শঙ্কিত, বিভ্রান্ত। মানুষের সভ্যতার ইতিহাস, গঠন ও ধ্বংসের ইতিহাস। ইদানীং মানুষের আশা হইয়াছিল

যে, বিজ্ঞানের বিকাশে মানুষ এক নূতন জগৎ সৃষ্টি করিতে পারিবে। কিন্তু এখন সে-আশা লুপ্তপ্রায়; এখন সকলেই শঙ্কিত, ইহার পরে মানবজাতির কি অবস্থা হইবে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রাক্কালেই এ পুস্তকখানি লেখা হইয়াছিল। তখনই মনে হইয়াছিল পৃথিবীর, মানবজাতির অবস্থা অদ্ভুত। যুদ্ধের অবসানেও প্রতীতি হয় অবস্থার মূলতঃ কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই। একদিকে মানুষ অভিনব শক্তি বিকাশ করিয়াছে। প্রকৃতির উপর তাহার কি অদ্ভুত কর্ত্তৃত্ব হইয়াছে! প্রাকৃত জীবনভোগের কত বিচিত্র উপায় আবিষ্কৃত হইয়াছে। শুধু ভোগ নয়, জ্ঞানের দিক দিয়াও মানুষ কি সব অপূর্ব্ব সম্পদ লাভ করিয়াছে। আজ পৃথিবীর দেশগুলি বিচ্ছিন্ন নয়, পরস্পর অজ্ঞাত নয়—আজ যেন পৃথিবী হইয়াছে সঙ্কুচিত; জাতিতে জাতিতে কত মেশামিশি, মানুষে মানুষে কত পরিচয়! আজ এক সহরে বসিয়া রেডিও-সাহায্যে পৃথিবীর প্রধান সহরগুলির বার্ত্তা পাওয়া যায়, প্রতি জাতির জীবনধারার সন্ধান পাওয়া যায়। অদূর ভবিষ্যতে টেলিভিসনের দ্বারা এক দেশে বসিয়া বহুদূরে অবস্থিত অপর দেশের ঘটনাবলী প্রত্যক্ষ করা যাইবে। সে যুগে হিউয়েন সাঙ কত বৎসর ভ্রমণ করিয়া ভারতের পরিচয় লইয়াছিলেন, আর আজ সারা দুনিয়া চক্কর দিতে সাত দিনও লাগে না।

মানব-জীবনের এই অদ্ভুত পরিবর্ত্তন দেখিয়া আধুনিক বৈজ্ঞানিক ও মনীষীদের আশা হইয়াছিল যে ধরা স্বর্গে পরিণত হইবার আর বিলম্ব নাই। বিজ্ঞান মানুষকে এমন সুখস্বাচ্ছন্দ্য দিবে যে, মানুষের জীবন হইবে একটা আরামময় সুখস্বপ্ন। শিক্ষায় সমগ্র মানবজাতি সুসভ্য হইয়া উঠিবে, কাজেই কুসংস্কার ত উড়িয়া যাইবে, ধর্ম্মবিশ্বাসের কোন প্রয়োজন থাকিবে না; যুক্তিবুদ্ধিই হইবে মানুষের একমাত্র আলোক-বর্ত্তিকা! দেশ বিশেষে শুধু প্রচলিত ধর্ম্মের উচ্ছেদ করা হইল না, ঈশ্বরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করা হইল—ঈশ্বরকে সিংহাসন হইতে টানিয়া নামান হইল! বেচারা ঈশ্বর যে কোথায় লুকাইলেন কে জানে!

ঈশ্বরকে দূর করা হইল বটে, কিন্তু এদিকে দানব জাগিয়া উঠিল—একেবারে আচম্বিতে—কোথায় গেল বুদ্ধি, যুক্তি, নীতি, ন্যায়, আইন-কানুন! যুক্তির স্থলে আসিল সুবিধাবাদ, নীতির স্থলে আসিল দুর্নীতি, ন্যায়ের স্থলে আসিল অন্যায়, অত্যাচার, অন্যায়ের প্রশ্রয়। জাতি-সঙ্ঘের স্থলে আসিল জাতিসংঘর্ষ। আন্তর্জাতিক সহযোগিতার স্থলে আসিল উৎকট জাতীয়তা। ব্যক্তিগত স্বাধীনতার স্থলে আসিল, নূতন ধরণের নৈর্ব্যক্তিক দাসত্ব, ব্যক্তির রাষ্ট্রের দাসত্ব। গণতন্ত্রের স্থলে স্থাপিত হইল স্বেচ্ছাতন্ত্র। সমাজনীতি, রাজনীতি, অর্থনীতির যত কিছু নিয়ম-কানুন তাহার পুরাণো কেতাবগুলি পুড়াইয়া ফেলিয়া এখন ঢালিয়া সাজিলেই হয়; এবং তৈয়ারী করিলে হয় 'নব বর্ব্বরতার ইতিহাস' 'স্বেচ্ছাচারতন্ত্র' 'অন্যায়ের কেরামতি', 'জাতিবিদ্বেষ সঙ্ঘ', 'মুষলনীতি' ইত্যাদি!*

বর্ত্তমান নিরাশার অন্ধকারে, পৃথিবীর এই অসহায় অবস্থায় সত্যই মানবজাতির ভবিষ্যৎ কি তাহা বুঝিবার উপায় নাই। (১৯৩৯এ ছিলনা—১৯৪৯এ'ও নাই!) কিন্তু কি কারণে এই অবস্থার উদ্ভব হইল তাহা নির্দ্ধারণ না করিলে আলোর সন্ধানও পাওয়া যাইবে না। মানুষ ভুল করিয়াও জীবনে অগ্রসর হয়; সভ্যতাও ভুলভ্রান্তির মধ্য দিয়া বিবর্ত্তিত হইতেছে। মানুষ এ পর্য্যন্ত যাহা করিয়াছে তাহা নিছক মিথ্যা নয়; মানুষ উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়াছে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। মানবজাতি শিল্প ও বাণিজ্যের প্রসারের ফলে, বিজ্ঞানের কার্য্যকারিতায় ক্রমশঃ ঐক্যের আদর্শের দিকেই অগ্রসর হইতেছে। জাতিতে জাতিতে পরিচয়ের জন্য সাম্রাজ্যবাদের যে প্রয়োজন ছিল তাহা শেষ হইতেছে, সাম্রাজ্যবাদের রূপ বদ্‌লাইয়া যাইতেছে, এবং আন্তর্জাতিকতার অবশ্যম্ভাবিতা বুঝা যাইতেছে।

---

* এই দুইটি প্যারাগ্রাফ ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দের দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ সুরু হইবার কয়েকমাস পূর্ব্বে লেখা। ১৯৪৯ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে দ্বিতীয় সংস্করণ প্রণয়ন উপলক্ষ্যে ইহা পুনর্ব্বার পাঠ করিয়া পরিবর্ত্তন করিবার প্রয়োজন অনুভব করিলাম না।—লেখক।

জাতিসঙ্ঘের (১৯৩৯এ ছিল League of Nations—১৯৪৯এ হইয়াছে United Nations) বর্ত্তমানে যে অবস্থাই হউক না কেন, একথা অস্বীকার করা যায় না যে এই আন্তর্জাতিকতার আদর্শেই উভয় সঙ্ঘ স্থাপিত হইয়াছিল। প্রথমটির পিছনে ছিল আমেরিকার পরলোকগত প্রেসিডেন্ট উড্‌রো উইলসনের* মহান প্রেরণা। এবং দ্বিতীয়টিতে প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের। যখন ১৯১৪-১৯১৮ খৃষ্টাব্দের ইয়ুরোপীয় যুদ্ধ চলিতেছিল—আমেরিকা তখনও তাহাতে যোগদান করে নাই, উড্‌রো উইল্‌সন তাঁহার আদর্শ ব্যক্ত করেন নাই—তখন শ্রীঅরবিন্দ "আর্য্যে" মানবমিলনের আদর্শ (Ideal of Human Unity) সম্বন্ধে যে প্রবন্ধগুলি লিখিতেছিলেন তাহার একটিতে ইঙ্গিত করিয়াছিলেন যে, এই যুদ্ধের পরে প্রাচীন সাম্রাজ্যবাদের রূপ বদ্‌লাইয়া যাইবে† এবং জাতিগুলি আন্তর্জাতিক বিরোধ মীমাংসা করিবার জন্য একটি সঙ্ঘ স্থাপন করিবে। শ্রীঅরবিন্দ তাহার নাম দিয়াছিলেন 'Parliament of Man'। যুদ্ধ শেষ হইয়া যখন ভার্সাই সন্ধি স্বাক্ষরিত হইল, তখনও শ্রীঅরবিন্দ ইঙ্গিত করিয়াছিলেন কেন নব-প্রতিষ্ঠিত জাতিসঙ্ঘ টিকিবে না। তিনি ইহা লিখিবার পরেই জাতিসঙ্ঘের আদর্শে ভণ্ডামির পরিচয় পাওয়া গেল—ভগ্নহৃদয়ে উড্‌রো উইলসন স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন, আমেরিকাই সঙ্ঘে যোগদান করিল না। আদর্শের ব্যর্থতায় ব্যথিত হইয়া উইল্‌সন বেশী দিন বাঁচেন নাই। দশ বৎসরের মধ্যেই সঙ্ঘের ভিত্তিতে ফাটল ধরিল। পরে তাহার কি অবস্থা হইয়াছিল তাহা আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছি—এখন ২নং জাতিসঙ্ঘ United Nationএর অবস্থাও দেখিতেছি। ৩০ বৎসর পূর্ব্বে—

* আশ্চর্য্যের বিষয় যে, উইল্‌সনের কন্যা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া সুদূর আমেরিকা হইতে আসিয়া শ্রীঅরবিন্দের আশ্রমে বাস করেন এবং কয়েক বৎসর পূর্ব্বে সেইখানেই দেহরক্ষা করেন। লেখকের তাঁহার সহিত একবার আলাপ হইবার সৌভাগ্য হইয়াছিল।

† সত্যই তাহা হইয়াছে। প্রধান সাম্রাজ্য-ওয়ালা ইংরাজ জাতি ভারত ও ব্রহ্মদেশ ত্যাগ করিয়াছে। বৃটিশ সাম্রাজ্য কমনওয়েল্‌থে রূপান্তরিত হইয়াছে।

ঈশ্বরকে দূর করা হইল বটে, কিন্তু এদিকে দানব জাগিয়া উঠিল—একেবারে আচম্বিতে—কোথায় গেল বুদ্ধি, যুক্তি, নীতি, ন্যায়, আইন-কানুন! যুক্তির স্থলে আসিল সুবিধাবাদ, নীতির স্থলে আসিল দুর্নীতি, ন্যায়ের স্থলে আসিল অন্যায়, অত্যাচার, অন্যায়ের প্রশ্রয়। জাতি-সঙ্ঘের স্থলে আসিল জাতিসংঘর্ষ। আন্তর্জাতিক সহযোগিতার স্থলে আসিল উৎকট জাতীয়তা। ব্যক্তিগত স্বাধীনতার স্থলে আসিল, নূতন ধরণের নৈর্ব্যক্তিক দাসত্ব, ব্যক্তির রাষ্ট্রের দাসত্ব। গণতন্ত্রের স্থলে স্থাপিত হইল স্বেচ্ছাতন্ত্র। সমাজনীতি, রাজনীতি, অর্থনীতির যত কিছু নিয়ম-কানুন তাহার পুরাণো কেতাবগুলি পুড়াইয়া ফেলিয়া এখন ঢালিয়া সাজিলেই হয়; এবং তৈয়ারী করিলে হয় 'নব বর্ব্বরতার ইতিহাস' 'স্বেচ্ছাচারতন্ত্র' 'অন্যায়ের কেরামতি', 'জাতিবিদ্বেষ সঙ্ঘ', 'মুষলনীতি' ইত্যাদি!*

বর্ত্তমান নিরাশার অন্ধকারে, পৃথিবীর এই অসহায় অবস্থায় সত্যই মানবজাতির ভবিষ্যৎ কি তাহা বুঝিবার উপায় নাই। (১৯৩৯এ ছিলনা—১৯৪৯এ'ও নাই।) কিন্তু কি কারণে এই অবস্থার উদ্ভব হইল তাহা নির্দ্ধারণ না করিলে আলোর সন্ধানও পাওয়া যাইবে না। মানুষ ভুল করিয়াও জীবনে অগ্রসর হয়; সভ্যতাও ভুলভ্রান্তির মধ্য দিয়া বিবর্ত্তিত হইতেছে। মানুষ এ পর্য্যন্ত যাহা করিয়াছে তাহা নিছক মিথ্যা নয়; মানুষ উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়াছে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। মানবজাতি শিল্প ও বাণিজ্যের প্রসারের ফলে, বিজ্ঞানের কার্য্যকারিতায় ক্রমশঃ ঐক্যের আদর্শের দিকেই অগ্রসর হইতেছে। জাতিতে জাতিতে পরিচয়ের জন্য সাম্রাজ্যবাদের যে প্রয়োজন ছিল তাহা শেষ হইতেছে, সাম্রাজ্যবাদের রূপ বদ্‌লাইয়া যাইতেছে, এবং আন্তর্জাতিকতার অবশ্যম্ভাবিতা বুঝা যাইতেছে।

---

* এই দুইটি প্যারাগ্রাফ ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দের দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ সুরু হইবার কয়েকমাস পূর্ব্বে লেখা। ১৯৪৯ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে দ্বিতীয় সংস্করণ প্রণয়ন উপলক্ষ্যে ইহা পুনর্ব্বার পাঠ করিয়া পরিবর্ত্তন করিবার প্রয়োজন অনুভব করিলাম না।—লেখক।

জাতিসঙ্ঘের (১৯৩৯এ ছিল League of Nations—১৯৪৯এ হইয়াছে United Nations) বর্ত্তমানে যে অবস্থাই হউক না কেন, একথা অস্বীকার করা যায় না যে এই আন্তর্জাতিকতার আদর্শেই উভয় সঙ্ঘ স্থাপিত হইয়াছিল। প্রথমটির পিছনে ছিল আমেরিকার পরলোকগত প্রেসিডেন্ট উড্রো উইলসনের* মহান প্রেরণা। এবং দ্বিতীয়টিতে প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের। যখন ১৯১৪-১৯১৮ খৃষ্টাব্দের ইয়ুরোপীয় যুদ্ধ চলিতেছিল—আমেরিকা তখনও তাহাতে যোগদান করে নাই, উড্রো উইল্সন তাঁহার আদর্শ ব্যক্ত করেন নাই—তখন শ্রীঅরবিন্দ "আর্য্যে" মানবমিলনের আদর্শ (Ideal of Human Unity) সম্বন্ধে যে প্রবন্ধগুলি লিখিতেছিলেন তাহার একটিতে ইঙ্গিত করিয়াছিলেন যে, এই যুদ্ধের পরে প্রাচীন সাম্রাজ্যবাদের রূপ বদ্লাইয়া যাইবে† এবং জাতিগুলি আন্তর্জাতিক বিরোধ মীমাংসা করিবার জন্য একটি সঙ্ঘ স্থাপন করিবে। শ্রীঅরবিন্দ তাহার নাম দিয়াছিলেন 'Parliament of Man'। যুদ্ধ শেষ হইয়া যখন ভার্সাই সন্ধি স্বাক্ষরিত হইল, তখনও শ্রীঅরবিন্দ ইঙ্গিত করিয়াছিলেন কেন নব-প্রতিষ্ঠিত জাতিসঙ্ঘ টিকিবে না। তিনি ইহা লিখিবার পরেই জাতিসঙ্ঘের আদর্শে ভণ্ডামির পরিচয় পাওয়া গেল—ভগ্নহৃদয়ে উড্রো উইলসন স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন, আমেরিকাই সঙ্ঘে যোগদান করিল না। আদর্শের ব্যর্থতায় ব্যথিত হইয়া উইল্সন বেশী দিন বাঁচেন নাই। দশ বৎসরের মধ্যেই সঙ্ঘের ভিত্তিতে ফাটল ধরিল। পরে তাহার কি অবস্থা হইয়াছিল তাহা আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছি—এখন ২নং জাতিসঙ্ঘ United Nationএর অবস্থাও দেখিতেছি। ৩০ বৎসর পূর্ব্বে—

* আশ্চর্য্যের বিষয় যে, উইল্সনের কন্যা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া সুদূর আমেরিকা হইতে আসিয়া শ্রীঅরবিন্দের আশ্রমে বাস করেন এবং কয়েক বৎসর পূর্ব্বে সেইখানেই দেহরক্ষা করেন। লেখকের তাঁহার সহিত একবার আলাপ হইবার সৌভাগ্য হইয়াছিল।

† সত্যই তাহা হইয়াছে। প্রধান সাম্রাজ্য-ওয়ালা ইংরাজ জাতি ভারত ও ব্রহ্মদেশ ত্যাগ করিয়াছে। বৃটিশ সাম্রাজ্য কমনওয়েল্থে রূপান্তরিত হইয়াছে।

ঈশ্বরকে দূর করা হইল বটে, কিন্তু এদিকে দানব জাগিয়া উঠিল—একেবারে আচম্বিতে—কোথায় গেল বুদ্ধি, যুক্তি, নীতি, ন্যায়, আইন-কানুন! যুক্তির স্থলে আসিল সুবিধাবাদ, নীতির স্থলে আসিল দুর্নীতি, ন্যায়ের স্থলে আসিল অন্যায়, অত্যাচার, অন্যায়ের প্রশ্রয়। জাতি-সঙ্ঘের স্থলে আসিল জাতিসংঘর্ষ। আন্তর্জাতিক সহযোগিতার স্থলে আসিল উৎকট জাতীয়তা। ব্যক্তিগত স্বাধীনতার স্থলে আসিল, নূতন ধরণের নৈর্ব্যক্তিক দাসত্ব, ব্যক্তির রাষ্ট্রের দাসত্ব। গণতন্ত্রের স্থলে স্থাপিত হইল স্বেচ্ছাতন্ত্র। সমাজনীতি, রাজনীতি, অর্থনীতির যত কিছু নিয়ম-কানুন তাহার পুরাণো কেতাবগুলি পুড়াইয়া ফেলিয়া এখন ঢালিয়া সাজিলেই হয়; এবং তৈয়ারী করিলে হয় 'নব বর্ব্বরতার ইতিহাস' 'স্বেচ্ছাচারতন্ত্র' 'অন্যায়ের কেরামতি', 'জাতিবিদ্বেষ সঙ্ঘ', 'মুষলনীতি' ইত্যাদি!*

বর্ত্তমান নিরাশার অন্ধকারে, পৃথিবীর এই অসহায় অবস্থায় সত্যই মানবজাতির ভবিষ্যৎ কি তাহা বুঝিবার উপায় নাই। (১৯৩৯এ ছিলনা—১৯৪৯এ'ও নাই!) কিন্তু কি কারণে এই অবস্থার উদ্ভব হইল তাহা নির্দ্ধারণ না করিলে আলোর সন্ধানও পাওয়া যাইবে না। মানুষ ভুল করিয়াও জীবনে অগ্রসর হয়; সভ্যতাও ভুলভ্রান্তির মধ্য দিয়া বিবর্ত্তিত হইতেছে। মানুষ এ পর্য্যন্ত যাহা করিয়াছে তাহা নিছক মিথ্যা নয়; মানুষ উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়াছে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। মানবজাতি শিল্প ও বাণিজ্যের প্রসারের ফলে, বিজ্ঞানের কার্য্যকারিতায় ক্রমশঃ ঐক্যের আদর্শের দিকেই অগ্রসর হইতেছে। জাতিতে জাতিতে পরিচয়ের জন্য সাম্রাজ্যবাদের যে প্রয়োজন ছিল তাহা শেষ হইতেছে, সাম্রাজ্যবাদের রূপ বদ্‌লাইয়া যাইতেছে, এবং আন্তর্জাতিকতার অবশ্যম্ভাবিতা বুঝা যাইতেছে।

* এই দুইটি প্যারাগ্রাফ ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দের দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ সুরু হইবার কয়েকমাস পূর্ব্বে লেখা। ১৯৪৯ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে দ্বিতীয় সংস্করণ প্রণয়ন উপলক্ষ্যে ইহা পুনর্ব্বার পাঠ করিয়া পরিবর্ত্তন করিবার প্রয়োজন অনুভব করিলাম না।—লেখক।

জাতিসঙ্ঘের (১৯৩৯এ ছিল League of Nations—১৯৪৯এ হইয়াছে United Nations) বর্ত্তমানে যে অবস্থাই হউক না কেন, একথা অস্বীকার করা যায় না যে এই আন্তর্জাতিকতার আদর্শেই উভয় সঙ্ঘ স্থাপিত হইয়াছিল। প্রথমটির পিছনে ছিল আমেরিকার পরলোকগত প্রেসিডেন্ট উড্রো উইলসনের* মহান প্রেরণা। এবং দ্বিতীয়টিতে প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের। যখন ১৯১৪-১৯১৮ খৃষ্টাব্দের ইয়ুরোপীয় যুদ্ধ চলিতেছিল—আমেরিকা তখনও তাহাতে যোগদান করে নাই, উড্রো উইল্‌সন তাঁহার আদর্শ ব্যক্ত করেন নাই—তখন শ্রীঅরবিন্দ "আর্য্যে" মানবমিলনের আদর্শ (Ideal of Human Unity) সম্বন্ধে যে প্রবন্ধগুলি লিখিতেছিলেন তাহার একটিতে ইঙ্গিত করিয়াছিলেন যে, এই যুদ্ধের পরে প্রাচীন সাম্রাজ্যবাদের রূপ বদ্‌লাইয়া যাইবে† এবং জাতিগুলি আন্তর্জাতিক বিরোধ মীমাংসা করিবার জন্য একটি সঙ্ঘ স্থাপন করিবে। শ্রীঅরবিন্দ তাহার নাম দিয়াছিলেন 'Parliament of Man'। যুদ্ধ শেষ হইয়া যখন ভার্সাই সন্ধি স্বাক্ষরিত হইল, তখনও শ্রীঅরবিন্দ ইঙ্গিত করিয়াছিলেন কেন নব-প্রতিষ্ঠিত জাতিসঙ্ঘ টিকিবে না। তিনি ইহা লিখিবার পরেই জাতিসঙ্ঘের আদর্শে ভণ্ডামির পরিচয় পাওয়া গেল—ভগ্নহৃদয়ে উড্রো উইলসন স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন, আমেরিকাই সঙ্ঘে যোগদান করিল না। আদর্শের ব্যর্থতায় ব্যথিত হইয়া উইল্‌সন বেশী দিন বাঁচেন নাই। দশ বৎসরের মধ্যেই সঙ্ঘের ভিত্তিতে ফাটল ধরিল। পরে তাহার কি অবস্থা হইয়াছিল তাহা আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছি—এখন ২নং জাতিসঙ্ঘ United Nationএর অবস্থাও দেখিতেছি। ৩০ বৎসর পূর্ব্বে—

* আশ্চর্য্যের বিষয় যে, উইল্‌সনের কন্যা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া সুদূর আমেরিকা হইতে আসিয়া শ্রীঅরবিন্দের আশ্রমে বাস করেন এবং কয়েক বৎসর পূর্ব্বে সেইখানেই দেহরক্ষা করেন। লেখকের তাঁহার সহিত একবার আলাপ হইবার সৌভাগ্য হইয়াছিল।

† সত্যই তাহা হইয়াছে। প্রধান সাম্রাজ্য-ওয়ালা ইংরাজ জাতি ভারত ও ব্রহ্মদেশ ত্যাগ করিয়াছে। বৃটিশ সাম্রাজ্য কমনওয়েল্‌থে রূপান্তরিত হইয়াছে।

শ্রীঅরবিন্দ যাহা লিখিয়াছিলেন তাহা অক্ষরে অক্ষরে ফলিয়াছে ও ফলিতেছে। তাঁহার এই সম্বন্ধে লেখাগুলি "War and Self-determination" নামক পুস্তকে ১৯২০ খৃষ্টাব্দে পুনঃপ্রকাশিত হইয়াছিল।

সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠিত হইবার বহু পূর্ব্বে, তিনি ১৯১৬ খৃষ্টাব্দের ১৫ই এপ্রিল তারিখের "আর্য্যে" লিখিয়াছিলেন, "ইতিমধ্যে মানুষ যদি ভ্রান্তভাবেও লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হইতে চেষ্টা করে, তাহা একটি সুলক্ষণ ; কারণ ইহাতে বুঝা যায় ভ্রান্তির পিছনে যে সত্য আছে তাহা পরিস্ফুট হইবার মুহূর্ত্তের অপেক্ষায় আছে।"* সত্য যে নিশ্চয়ই বিকাশ লাভ করিবে, মানুষ বিচিত্র অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়া অগ্রসর হইয়া একদিন আদর্শকে শ্রদ্ধাভরে বরণ করিবে, ভ্রান্তিমুক্ত হইয়া সে সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতায় প্রতিষ্ঠিত হইবে, এ বিষয়ে শ্রীঅরবিন্দের অটুট বিশ্বাস আছে। এই কারণেই সর্ব্বপ্রকার রাজনৈতিক বা সামাজিক আলোড়নে তিনি অবিচলিত। তিনি কোন দিন কোন জিনিষ বা ঘটনাকে বাহির হইতে বিচার করেন না, তাহার অন্তর্নিহিত সত্য প্রত্যক্ষ করেন। তিনি জানেন মানুষ কোন্ লক্ষ্যে, কিসের টানে যুগযুগ ধরিয়া বিবর্ত্তন লাভ করিতেছে, কেন তাহার অভিজ্ঞতা-বৈচিত্র্যের প্রয়োজন। তিনি উপলব্ধি করিয়াছেন মানুষের প্রাণের গতি, মনোবৃত্তি তাহাকে কিরূপ কর্ম্মে প্রবৃত্ত করায়, তাহার সভ্যতাকে যুগে যুগে কি রূপভঙ্গী দেয় ; উর্দ্ধের প্রেরণায় মানুষ কিরূপে নবযুগের সৃষ্টি করে ; আবার নিম্নের টানে সে পড়ে বিড়ম্বনার আবর্ত্তে—যখন তাহার আচার হয় অনাচার, নীতি হয় দুর্নীতি, শৃঙ্খলা হয় বিশৃঙ্খলার কারণ।

এই নীচুর টান কি ? মানুষের প্রাকৃতিক বৃত্তিগুলি যদি গজিয়া

---

* Meanwhile that he should struggle even by illusions towards that end, is an excellent sign ; for it shows that the truth behind the illusion is pressing towards the hour when it may become manifest as reality.

উঠে, তাহা হইলে তাহার মানসিক আদর্শ সে প্লাবন রোধ করিতে পারে না।* মানুষ অন্তরের সহিত, ঐকান্তিকতার সহিত আদর্শকে বরণ না করিলে এইরূপ হয়; স্বার্থবুদ্ধি তাহার বুদ্ধির বিকৃতি ঘটায় এবং এমন অনাসৃষ্টির উদ্ভব করে যাহার ফল তাহাকেও ভোগ করিতে হয়। তাই ১৯১৬ খৃষ্টাব্দেই শ্রীঅরবিন্দ লিখিয়াছিলেন, "মানুষের হৃদয় যেমন আছে তেমনি যদি থাকে তাহা হইলে শান্তির হইবে অবসান, শান্তির প্রতিষ্ঠান মানুষের দুর্দ্দাম আবেগে যাইবে ভাঙ্গিয়া। জীবধর্ম্ম অনুসারে হয়ত মানুষের আর যুদ্ধের প্রয়োজন নাই, কিন্তু মনোধর্ম্মে ইহার প্রয়োজন আছে (a psychological necessity) আমাদের ভিতরে যাহা আছে তাহা বাহির হইবেই।" সুতরাং যখন মানুষে মানুষে শুধু সম্প্রীতি নয়, তাহার মনে ঐক্যের আদর্শ প্রাধান্য লাভ করিবে; যখন মানুষ মানুষকে শুধু ভ্রাতৃভাবে নয় (উহা ক্ষণভঙ্গুর বন্ধন), নিজের অংশরূপে দেখিবে (অর্থাৎ একাত্ম হইবে), যখন মানুষ ব্যষ্টি বা সমষ্টির অহং-ভাবাপন্ন থাকিবে না, সে বাস করিবে বিশ্ব-চেতনার মধ্যে—তখনই যুদ্ধ (যে কোন প্রকারেই) তাহার জীবন হইতে বিদূরিত হইবে, আর ফিরিয়া আসিবে না।"†

শ্রীঅরবিন্দ মানবসভ্যতার ইতিহাস বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছেন

* এই কারণেই ১৯২০ হইতে ১৯৪৭ পর্য্যন্ত অহিংসার মন্ত্র জপিয়া ভারত অভূতপূর্ব্ব রক্তপ্লাবন প্রত্যক্ষ করিল।

† Only when man has developed not merely a fellow-feeling with all men but a dominant sense of unity and commonality, only when he is aware of them not merely as brothers—that is a fragile bond—but as parts of himself, only when he has learned to live not in his seperate personal and communal ego-sense, but in larger universal consciousness, can the phenomenon of war, with whatever weapon, pass out of his life without the possibility of return—Arya, 15th April, 1916.

যে, মানুষের দুইটি দৃষ্টিভঙ্গী ইহার বিবর্ত্তন ঘটাইয়াছে। প্রথমতঃ, মানুষ তাহার প্রাকৃতিক বৃত্তির প্রেরণায় সভ্যতা গঠন করিয়াছে। মানুষের অহংজ্ঞান তাহাকে এমন ভাবে কর্ম্মে প্রবৃত্ত করাইয়াছে যাহাতে তাহার মূল লক্ষ্য হইয়াছে আত্মপ্রতিষ্ঠা। আত্মপ্রতিষ্ঠা কিসের জন্য? আত্মপ্রসার ও আত্মসুখভোগের চেষ্টায়। আদিম মানুষ এই বৃত্তিতে পরিচালিত হইয়া জীবনসংগ্রাম চালাইয়াছে। প্রথমে সে উদরপূর্ত্তি ও যতদূর সম্ভব দৈহিক সুখস্বাচ্ছন্দ্য লাভের চেষ্টা করিয়াছে। ইহাতে যে প্রতিবন্ধক হইয়াছে সে তাহাকে বিনষ্ট করিয়াছে, এবং দুর্ব্বল হইলে নিজে বিনষ্ট হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, যৌনবৃত্তির প্রেরণায় সে বংশবৃদ্ধি করিয়াছে। প্রাথমিক অবস্থায় হয়ত তাহার পরিবার ছিল না, কিন্তু পরে তাহার হইয়াছে পারিবারিক বন্ধন—সে হইয়াছে পারিবারিক ভর্ত্তা—কর্ত্তা।

পরিবার সৃষ্ট হইবার পর তাহার সমষ্টি-বুদ্ধি জাগিল; সে শুধু ব্যষ্টির প্রতিষ্ঠায় তৃপ্ত হইল না, সমষ্টি-প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন বুঝিল। অতঃপর স্থাপিত হইল কুল, সমাজ,—ক্রমশঃ সমাজের বিবর্ত্তনে উদ্ভব হইল জাতি। মানুষ বুঝিল যে শুধু সংগ্রাম সংঘর্ষ করিয়া জীবন চলে না, সহযোগিতারও প্রয়োজন। সমষ্টিগত সহযোগিতা ভিন্ন কুল, সমাজ বা জাতি গঠিত হইতে পারে না। সমষ্টিই ব্যষ্টির ভিত্তি, এই প্রেরণায় মানুষ বৃহত্তর মঙ্গলের জন্য ত্যাগধর্ম্ম শিখিল, এমন কি আত্মবিসর্জনেও কুণ্ঠিত হইল না। যে সমাজ বা জাতির মধ্যে সহযোগিতা যত ঐকান্তিক, তাহা ততই প্রাণবন্ত।

"আর্য্যে" সমাজবিবর্ত্তনের মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে (Psychology of Social Development) শ্রীঅরবিন্দ যে প্রবন্ধগুলি লিখিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি এই প্রাণধর্ম্মেরও প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে বুঝাইয়াছেন। প্রাণধর্ম্ম ম্লান হইলে সমাজ বা জাতি হইয়া পড়ে দুর্ব্বল এবং ক্রমশঃ ধ্বংসের পথে অগ্রসর হয়। ইয়ুরোপীয় সভ্যতার ভিত্তি এই প্রাণধর্ম্ম। পশ্চিম ইয়ুরোপীয় টিউটনিক আদর্শ প্রাধান্য লাভ

করিবার পর হইতেই ইয়ুরোপীয় আদর্শ হইয়াছে ব্যবহারিক জীবন। ব্যবহারিক বুদ্ধির উপরই পাশ্চাত্যসভ্যতা প্রতিষ্ঠিত। ইয়ুরোপের স্বষ্টি ও সভ্যতার মূলে এই বুদ্ধি। ইয়ুরোপের লোক হইতেছে প্রাণ-ধর্ম্মের প্রতীক—Vitalistic in the very marrow of his thought and being। আধুনিক যুগে ইয়ুরোপের এই মনোভাবের ফলে খৃষ্টধর্ম্মের দয়া, দাক্ষিণ্য, প্রেম প্রভৃতি সংস্কার, এমন কি প্রাচীন লাতিন সভ্যতার আদর্শ পর্য্যন্ত, বর্ত্তমান অর্থনীতিক ও রাজনীতিক সভ্যতার চাপে তলাইয়া গিয়াছে। পাশ্চাত্যের জ্ঞান, বিজ্ঞান, নীতি, সৌন্দর্য্যবুদ্ধি, ধর্ম্ম প্রভৃতি সব কিছুর লক্ষ্য হইতেছে জীবনগঠন করা, জীবনকে সুন্দর করা এবং জীবনের গ্লানি ও অবসাদ দূর করা। জীবনের আর কিছু লক্ষ্য হইতে পারে পাশ্চাত্য মন তাহা মানিতে চাহে না।

প্রাচীন যুগের দৃষ্টি-ভঙ্গী ছিল একেবারে বিভিন্ন। সে যুগের লোক যে জীবন সম্বন্ধে উদাসীন ছিল তাহা নয়, কিন্তু তাহারা বহির্ম্মুখী জীবনকে একমাত্র লক্ষ্য বলিয়া মনে করিত না। তাহারা মনে করিত জীবন বিশেষ আদর্শ উপলব্ধি করিবার ক্ষেত্র। প্রাচীন গ্রীস ও রোমের আদর্শ ছিল বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ করা, নৈতিক সুসম্বদ্ধ জীবনগঠন করা এবং সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করা। প্রাচীন এশিয়ার দৃষ্টিভঙ্গী ছিল আরও উদার। এশিয়া জীবনের অবশ্য-প্রয়োজনীয় ব্যাপারকে উপেক্ষা করিত না, কিন্তু তাহার আদর্শ ছিল ধর্ম্মের। গ্রীস ও রোমের গৌরবের জিনিষ ছিল শিল্প, কাব্য ও দর্শন—রাজনৈতিক ব্যাপারেও তাহারা অসামান্য কৃতিত্ব দেখাইয়াছে। এশিয়ার এ সব গৌরব ছিল, তাহার সামাজিক ব্যবস্থা ছিল আরও উন্নত; কিন্তু এশিয়ার আসল গৌরব তাহার ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তকগণ, আধ্যাত্মিক জ্ঞানসম্পন্ন ঋষিকুল, সাধু, সন্ত, সন্ন্যাসী ও তপস্বিগণ।

আধুনিক জগতের আদর্শ হইয়াছে মানুষের সেই মৌলিক প্রেরণাকে প্রাধান্য দেওয়া। তাই সে অসীম কৃতিত্ব দেখাইতেছে রাজনৈতিক

ও অর্থনৈতিক ব্যাপারে—বিজ্ঞানের চর্চায়। বিজ্ঞানের লক্ষ্য নিছক জ্ঞানচর্চা নয়—ব্যবহারিক জীবনের রূপান্তর ঘটান। মানুষ চাহিতেছে জড়প্রকৃতির উপর পূর্ণ কর্ত্তৃত্ব—প্রকৃতিকে সে চায় নিজের সেবায় নিয়োজিত করিতে। শ্রীঅরবিন্দ দেখাইয়াছেন যে, প্রাচীন গ্রীক-মন ছিল দার্শনিক, সৌন্দর্য্যানুসন্ধিৎসু ও রাজনৈতিক আদর্শবাদী—আধুনিক মনের ঝোঁক হইতেছে ব্যবহারিক বিজ্ঞান ও অর্থনীতির দিকে। প্রাচীন আদর্শ ছিল সৌন্দর্য্য ও পরিপূর্ণতা—মানবজীবনকে সুন্দরভাবে গঠন করা। আধুনিক আদর্শ সৌন্দর্য্যের পূজা নয়, ব্যবহারিক তৎপরতা ও বহির্জীবনকে পূর্ণ করা, যাহাতে জীবন কাজে লাগে—স্বপ্নবিলাসে নষ্ট না হয়।

এই আদর্শ অনুসরণের ফলে বহির্জগতের রূপ কিরূপে বদ্‌লাইয়াছে তাহা আমরা দেখিতেছি। মানুষ বুঝিয়াছে যে শুধু ব্যক্তিগত সুখসুবিধা স্বাচ্ছন্দ্য লাভ হইলেই হইল না—সমষ্টির জীবনকেও একটা বিশেষ ছাঁচে ঢালাই করা চাই। যে অহংবুদ্ধি ব্যক্তির প্রতিষ্ঠার কারণ ছিল, তাহা আজ ব্যাপক হইয়াছে সমষ্টিতে। এমন কি জগৎ-জোড়া সমষ্টির রূপান্তরের আদর্শ ফুটিয়া উঠিয়াছে। তাহা যে এখনও বাস্তবে পরিণত হয় নাই তাহার কারণ উৎকট জাতীয় অহংকার। এই জাতিগত অহংকারের জন্য ব্যক্তি, কুল বা সমাজকে রাষ্ট্রের বেদীতে আত্মাহুতি দিতে হইতেছে।*

বহুপূর্ব্বেই শ্রীঅরবিন্দ ইঙ্গিত করিয়াছিলেন যে, সমষ্টির প্রতীক রাষ্ট্রীয় প্রাধান্যের আদর্শের জন্য সোস্যালিজম, কম্যুনিজম প্রভৃতি সমষ্টি-নীতির উদ্ভব হইবে। প্রথম মহাযুদ্ধের সময়ে লিখিয়াছিলেন যে, জার্ম্মান মনোভাবের বিবর্ত্তনে ঐ দেশে সোস্যালিজমের প্রতিষ্ঠা অনিবার্য্য। সত্যই হিটলারের অভ্যুত্থানে জার্ম্মানীতে পূর্ণ রাষ্ট্রকর্ত্তৃত্বের

* রুশ বিপ্লবের (১৯১৭) আদর্শ ছিল আন্তর্জাতিকতা, এক্ষণে তাহা প্রচ্ছন্নভাবে জাতীয়তাবাদে এবং তাহার ফলস্বরূপ সাম্রাজ্যবাদে পরিণত হইয়াছে। সোভিয়েট সরকার এক্ষণে রুশিয়ার জাতীয় বৈশিষ্ট্য, কৃতিত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রচারে ব্যস্ত—অহংকারে ভরপুর।

আদর্শ বাস্তবে পরিণত হইয়াছিল। নাৎসী আমলে সেখানে তখন প্রত্যেক ব্যক্তির জীবননিয়ন্ত্রণের—যাহাকে কথায় বলে 'দোলনা হইতে কবর পর্য্যন্ত'—ভার রাষ্ট্র গ্রহণ করিয়াছিল। ব্যক্তিগত রাজনীতিক স্বাধীনতা দূরের কথা, আর্থিক স্বাধীনতা পর্য্যন্ত ছিল না। সমগ্র জাতি বিরাট যন্ত্রে পরিণত হইয়াছিল। রুশিয়ার 'ষ্টেট সোস্যালিজম' পূর্ব্বে ছিল খানিকটা উদার, মহাযুদ্ধের পরে অবশ্যম্ভাবী বিবর্ত্তনের ফলে রাষ্ট্র জাতিকে বিরাট যন্ত্রে পরিণত করিয়াছে, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য একেবারে অবলুপ্ত হইয়াছে। জার্ম্মানীর প্রতিভা ছিল জীবনকে নিখুঁতভাবে ঢালাই করা, ইংরাজীতে যাহাকে বলে regimentation—হিট্‌লার সমগ্র জাতিকে তাহাই করিয়াছিলেন। বর্ত্তমানে রুশিয়া জার্ম্মানীর পথই অনুসরণ করিতেছে। তাই হিট্‌লারের তিরোধানে ষ্টালিন উঠিয়াছেন জগতের ধূমকেতু রূপে। জার্ম্মানী হইয়াছিল জাতিগত অহংকারের প্রতীক আজ রুশিয়ার অহং সর্ব্বগ্রাসী মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। হিটলার সমগ্র জার্ম্মানজাতিকে একটা আদর্শে ঢালাই করিয়াছিলেন—with scientific thoroughness—ষ্টালিনও তাহাই করিয়াছেন। বৈজ্ঞানিক কুশলতায় ব্যবহারিক বিজ্ঞানের কি অদ্ভুত কৌশল জার্ম্মানী দুইটি মহাযুদ্ধে দেখাইয়াছিল! দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে অবশেষে অতিকৌশলও তাহাকে ধ্বংসের কবল হইতে রক্ষা করিতে পারে নাই। আজ সোভিয়েট রুশিয়া জার্ম্মানীর স্থান অধিকার করিয়াছে। জার্ম্মানী ছিল একক, কিন্তু রুশিয়ার আদর্শ ব্যাপক এবং বুদ্ধিভ্রংশকারী। তাই রুশ-পন্থানুসারীদের মধ্যে আমরা দেখি বহুদেশের বহু গুণী ও জ্ঞানী ব্যক্তিকে। মনে হয় এইজন্যই মানবজাতিকে নিছক যান্ত্রিকতার মোহ ও দাসত্ব হইতে রক্ষা করিবার জন্য গুণ ও জ্ঞানোত্তর পরাজ্ঞানের প্রয়োজন হইবে।

দ্বাবিংশ অধ্যায়

যুগপুরুষ শ্রীঅরবিন্দ

আজ আর বিশেষ করিয়া বলিবার প্রয়োজন নাই যে, শ্রীঅরবিন্দের সাধনা হইতেছে অতি-মানসের অবতরণ এবং তাহার ফলে মানুষের দিব্য রূপান্তর ও দিব্য-মানবজাতির সৃষ্টি। ইহা ঋষি বিশ্বামিত্রের নবসৃষ্টির প্রচেষ্টা নহে, ইহা ভগীরথের গঙ্গাবতরণ। ভগীরথ সুর-ধুনীকে মর্ত্ত্যে অবতরণ করাইয়াছিলেন ; শ্রীঅরবিন্দ চাহিতেছেন ভাগবতী শক্তিকে মর্ত্ত্যে লীলায়িত করিতে। গূঢ়ভাবে ইহা সমগ্র মানবজাতির সাধনা ; তাই শ্রীঅরবিন্দকে সমগ্র মানবজাতির প্রতিনিধি বলা অত্যুক্তি নহে।

ভারতের এবং পাশ্চাত্যের যে সকল লোক শ্রীঅরবিন্দের সত্তা অনুভব করিয়াছেন তাঁহারা সকলেই শ্রীঅরবিন্দের সাধনার অভিনবত্ব উপলব্ধি করিয়াছেন। ইঁহাদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য রবীন্দ্রনাথ। মনে হয় তিনি শুধু শ্রীঅরবিন্দের চরিত্রের বিশেষত্ব উপলব্ধি করেন নাই, তাঁহার অন্তর্লোকের সন্ধান পাইয়াছিলেন, সেই সুদূর অতীতে যখন যোগী অরবিন্দের মূর্ত্তি বিকশিত হয় নাই। তাই তিনি স্বদেশী যুগে শ্রীঅরবিন্দ প্রশস্তিতে বলিয়াছিলেন :

> "হেরিয়া তোমার মূর্ত্তি, কর্ণে মোর বাজে
> আত্মার বন্ধনহীন আনন্দের গান,
> মহাতীর্থ যাত্রীর সঙ্গীত, চিরপ্রাণ
> আশার উল্লাস, গম্ভীর নির্ভয়বাণী
> উদার মৃত্যুর।..."

উত্তরকালে (২৯শে মে ১৯২৮) রবীন্দ্রনাথ পণ্ডিচারীতে যোগী

শ্রীঅরবিন্দকে দেখিয়া পরম তৃপ্তি লাভ করিয়া লিখিয়াছিলেন : "প্রথম দৃষ্টিতেই বুঝ্‌লুম,—ইনি আত্মাকেই সবচেয়ে সত্য ক'রে চেয়েছেন, সত্য ক'রে পেয়েছেন। সেই তাঁর দীর্ঘ তপস্যার চাওয়া ও পাওয়ার দ্বারা তাঁর সত্তা ওতপ্রোত। আমার মন বললে, ইনি এঁর অন্তরের আলো দিয়েই বাইরের আলো জ্বালবেন। কথা বেশি বলবার সময় হাতে ছিল না। অতি অল্পক্ষণ ছিলুম। তারি মধ্যে মনে হ'লো, তাঁর মধ্যে সহজ প্রেরণাশক্তি পুঞ্জিত। কোনো খর-দস্তুর মতের উপদেবতার নৈবেদ্যরূপে সত্যের উপলব্ধিকে তিনি ক্লিষ্ট ও খর্ব্ব করেন নি। তাই তাঁর মুখশ্রীতে এমন সৌন্দর্য্যময় শান্তির উজ্জ্বল আভা। মধ্যযুগের খৃষ্টান সন্ন্যাসীর কাছে দীক্ষা নিয়ে তিনি জীবনকে রিক্ত শুষ্ক করাকেই চরিতার্থতা বলেন নি। আপনার মধ্যে ঋষি পিতামহের এই বাণী অনুভব করেছেন, যুক্তাত্মানঃ সর্ব্বমেবাবিশন্তি। পরিপূর্ণের যোগে সকলেরই মধ্যে প্রবেশাধিকার আত্মার শ্রেষ্ঠ অধিকার। আমি তাঁকে ব'লে এলুম,—আত্মার বাণী বহন ক'রে আপনি আমাদের মধ্যে বেরিয়ে আসবেন এই অপেক্ষায় থাকবো। সেই বাণীতে ভারতের নিমন্ত্রণ বাজ্‌বে, শৃণ্বন্তু বিশ্বে।

"প্রথম তপোবনে শকুন্তলার উদ্বোধন হ'য়েছিল যৌবনের অভিঘাতে প্রাণের চাঞ্চল্যে। দ্বিতীয় তপোবনে তাঁর বিকাশ হ'য়েছিল আত্মার শান্তিতে। অরবিন্দকে তাঁর যৌবনের মুখে ক্ষুব্ধ আন্দোলনের মধ্যে যে তপস্যার আসনে দেখেছিলুম সেখানে তাঁকে জানিয়েছি—

"অরবিন্দ, রবীন্দ্রের লহ নমস্কার।

"আজ তাঁকে দেখলুম তাঁর দ্বিতীয় তপস্যার আসনে, অপ্রগল্‌ভ স্তব্ধতায়—আজও তাঁকে মনে মনে ব'লে এলুম—

অরবিন্দ, রবীন্দ্রের লহ নমস্কার।"*

* রবীন্দ্রনাথ প্রবন্ধটি লিখিয়াছিলেন শন্তিলি জাহাজে বসিয়া (তিনি পাশ্চাত্য ভ্রমণে যাইতেছিলেন) ১৯২৮এর ২৯শে মে তারিখেই; উহা প্রকাশিত হয় বাং ১৩৩৫ সালের শ্রাবণের "প্রবাসী"তে।

কবির দৃষ্টি অভ্রান্ত। আজ ভারত, তথা জগৎ, শ্রীঅরবিন্দের বাণী শুনিবার অপেক্ষায় আছে। কোন এক আকর্ষণে এদেশের ওদেশের শত শত নরনারী, বালক বালিকা পণ্ডিচারী আশ্রমে আশ্রয় লইয়াছে; তাহারা গতানুগতিক জীবনের মোহ ত্যাগ করিয়া দিব্য-জীবনের সন্ধান করিতেছে। শ্রীঅরবিন্দ ত তাহাদের কাহাকেও আহ্বান করেন নাই, তিনি ত কোন সঙ্ঘ গঠন করেন নাই!

তথাপি আমরা কি অনুভব করি না যে শ্রীঅরবিন্দের স্বদেশবাসীদের অধিকাংশই আজও তাঁহার আদর্শ-উন্মুখ নহে? পাশ্চাত্যে অতি মন্থর গতিতে তাঁহার বাণী পৌঁছিতেছে। কিন্তু বস্তুত ইহা অবান্তর। কারণ মূল সমস্যা হইতেছে মানবজাতির দিব্য রূপান্তর। ইহার জন্য চাই একদিকে মানুষের আকুলতা, অপরদিকে ভাগবতশক্তির সাড়া। মানুষের যে আকুলতা জাগিয়াছে তাহার প্রমাণ পণ্ডিচারী আশ্রমের আকর্ষণ। ভাগবত শক্তির সম্বন্ধে কিছু বলা ধৃষ্টতা মাত্র—তাহার সাক্ষী প্রতি ব্যক্তির আত্মা।

মানবজাতির ব্যাপক রূপান্তর হইবে কিনা, এবিষয়ে শ্রীঅরবিন্দ স্বয়ং 'দিব্য জীবন' পুস্তকের শেষভাগে বিশদভাবে আলোচনা করিয়াছেন। অনন্যমনাভাবে ঈশ্বরের সাধনা করিতে হইলে উপযুক্ত গুরু, মঠ বা আশ্রমের আশ্রয় গ্রহণ করা ছাড়া উপায় নাই। এই কারণে প্রাচীন কাল হইতে সকল সভ্য দেশে এই রীতি চলিয়া আসিতেছে। 'বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি, ধম্মং শরণং গচ্ছামি, সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি' নীতি আমাদের সুপরিচিত। কিন্তু এই নীতির একটি ফল কি এই নয় যে সঙ্ঘ জগৎ-জীবন হইতে বিচ্ছিন্ন হয়? তাহার ফলে সঙ্ঘ হয় পূত স্থান, আর জগৎ চলে নিজগতিতে অজ্ঞানে বা অর্দ্ধজ্ঞানে।

শ্রীঅরবিন্দ যোগাসনে প্রতিষ্ঠিত হইয়াও নিজকে জগৎ-জীবন হইতে বিচ্ছিন্ন করেন নাই। কিন্তু বিচ্ছিন্ন না হওয়ার অর্থে গতানু-গতিকতায় যোগদান করা নহে। ইহার অর্থ জগতের বিবর্ত্তনের সহিত যোগযুক্ত হওয়া। জগতের কি অবিরাম বিবর্ত্তন-যোগ চলিতেছে

না? তাহা না হইলে মানব-সভ্যতার রূপান্তর ঘটে কেন? বিবর্ত্তন না হইলে সৃষ্টি স্থবির হইত। এ বিবর্ত্তন লক্ষ্য করিলেই বুঝা যায় যে, প্রকৃতি যেমন জীবাধারে মানব-সত্তার সৃষ্টি করিয়াছেন, তেমনি মানবাধারে মানবোত্তর সত্তার সৃষ্টি করা তাঁহার চরম লক্ষ্য।

এই বিবর্ত্তনে এমনি একটা ক্ষণ আসে যখন সৃষ্টির পক্ষে দিব্য-সংস্পর্শের প্রয়োজন হয়। শ্রীঅরবিন্দ এই ক্ষণেরই অপেক্ষায় আছেন, এবং এই দিব্য রূপান্তরের জন্য অনন্যমনা ও অনন্যকর্ম্মা হইয়া ৪০ বৎসর অখণ্ড সাধনা করিতেছেন। তাঁহার সাধনায়ই মানবের মধ্যে এক ঐকান্তিক দিব্য-উন্মুখতা হইয়াছে এবং এই কারণেই কোন এক দুর্জ্ঞেয় রহস্যে দেশবিদেশের নরনারী শ্রীঅরবিন্দ ও শ্রীমায়ের আকর্ষণ অনুভব করিতেছে। ইহাতে জাতি, ধর্ম্ম বা বর্ণের সমস্যা নাই—কারণ ইহা মানবীয় গুণ, আচরণ বা বিশেষত্বের উর্দ্ধে। ইহা হইতেছে 'সর্ব্ব ধর্ম্মান্ পরিত্যাজ্য মামেকং শরণং ব্রজ'—গীতার সেই মহাবাণীর আহ্বান।

কিন্তু বিবর্ত্তন ত একটানা নহে—ইহার গতি তির্য্যক নহে। ইহা হইতেছে 'পতন-অভ্যুদয়-বন্ধুর পন্থা'। প্রাণ সৃষ্ট হইবার পূর্ব্বে কত যুগ ধরিয়া মূক জড়ের একছত্র রাজত্ব ছিল! তাহার পর কত যুগ চলিয়াছে প্রাণীর রাজত্ব! অবশেষে ত মানুষের আবির্ভাব। আবার কত কোটি বৎসর ধরিয়া মানুষের বিবর্ত্তন ঘটিতেছে। আমাদের জানা সভ্যতাগুলির ইতিহাস ত মাত্র কয়েক হাজার বৎসরের। সুতরাং এক তুড়িতেই যে মানবজাতির দিব্য-রূপান্তর হইবে তাহার সম্ভাবনা নিছক কল্পনামাত্র।

মানব-সভ্যতার বিবর্ত্তন লক্ষ্য করিয়া শ্রীঅরবিন্দ প্রথম মহাযুদ্ধের সময়ে যাহা লিখিয়াছিলেন, গত ত্রিশ বৎসরের মধ্যে তাহাই ঘটিয়াছে। কিন্তু অবস্থার বিপর্য্যয়েও মানুষ ব্যক্তিগত বা সমষ্টিগতভাবে এখনও উপযুক্ত শিক্ষা লাভ করিয়াছে বলিয়া মনে হয় না—এখনও মানুষ মানসিক অহংকারের প্রভাব মুক্ত হয় নাই, মনের আধা-আলো আধা-আঁধারের

গণ্ডীর বাহিরে যাইতে পারে নাই। তাই মানুষ সোজা বুদ্ধি হারাইয়াছে, শ্রেয়ের জ্ঞান হারাইয়াছে এবং ইন্দ্রিয়-জ্ঞানকেই (সেই জন্যই জড়বাদ) পরম জ্ঞান মনে করিতেছে। যান্ত্রিক উৎকর্ষে ইন্দ্রিয় জ্ঞান ও ইন্দ্রিয়ানন্দ উপভোগ করিবার শক্তি বাড়িয়াছে—এমন কি বিশ্বের পরিধি সঙ্কুচিত হইয়াছে, কিন্তু আত্মা লুক্কায়িত হইয়াছেন যেন হৃদয়ের গুহা হইতে গুহান্তরে। ইহাই অতি-আধুনিক সভ্যতা—যন্ত্রযুগ। আত্মা নির্ব্বাসিত হওয়া বুদ্ধির দিশারী হইয়াছে ইন্দ্রিয়-জ্ঞান, সুতরাং কালক্রমে নীতিধর্ম্ম জলাঞ্জলি গিয়াছে ও যাইতেছে। নীতি-ধর্ম্ম ত মানস-সৃষ্টি ; আধুনিক মানুষের মনের বিচারে সাব্যস্ত হইয়াছে : কার্য্যকারিতা ও সুবিধাবাদ নীতির অপেক্ষা করে না।

প্রকৃতি হয়ত বুঝাইতেছেন মানুষের কত দূর দৌড়—অহংএর রাজত্বের সীমা কি। তাই আজ মানুষের অবস্থা এই যে, বিজ্ঞানের সম্পদের মধ্যেও হয় সে নিঃস্ব, না হয় যন্ত্র বা যন্ত্রের দেবতা নির্ব্ব্যক্তিক সমষ্টির দাস। ইহার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি সমষ্টিতে সমষ্টিতে সংঘাত। দুইটি মহাযুদ্ধে আমরা এইরূপ দুইটি সংঘাত দেখিয়াছি। আবার একটি হইবে কিনা তাহাই মহা-সমস্যা। জড়ের চরম শক্তি আবিষ্কার করিয়া মানুষ মাঙ্গলিক শক্তি ছাড়া পরম রুদ্রশক্তিও লাভ করিয়াছে সন্দেহ নাই ; কিন্তু এখন সমস্যা হইতেছে যে, এই রুদ্র-শক্তিতে বর্ত্তমান মানব-জগৎ ধ্বংস হইয়া নূতন সৃষ্টি হইবে, না মানুষ রুদ্রের দক্ষিণ মুখ দেখিবার যোগ্যতা লাভ করিবে—যে মুখ দেখিবার জন্য আমাদের পূর্ব্বপুরুষ ঋষিগণ রুদ্রের ধ্যান করিয়াছিলেন।

মানুষী বুদ্ধি সাধারণত বহির্ম্মুখী এবং ইহার লক্ষ্য কার্য্যকারিতা, সুবিধা প্রভৃতি। এই বুদ্ধির অতি উৎকর্ষে মানবজাতির একাংশ একান্ত-ভাবে জড়াশ্রয়ী হইয়াছে। কিন্তু তাহাতে মানবতা হইয়াছে ক্ষুণ্ন, নীতির ভিত্তি হইয়াছে শিথিল। তাহার ফলে যুদ্ধ হইয়াছে ভয়াবহ, যুদ্ধের পরেও সৃজনীশক্তি একটা আত্মস্থ গতি পাইতেছে না। সমস্ত বিষয়ে অনিশ্চয়তা, অস্থিরতা—মানুষের বুক যেন কি এক অজানা ভয়ে দুরু

দুরূ। এক দিকে জড়বাদ আশ্রয়ী এক শক্তি মানুষকে একই আদর্শে অনুপ্রাণিত করিতে চাহিতেছে, একঢালা ভাবে গড়িতে চাহিতেছে; অপরদিকে আর এক শক্তি রক্ষা করিতে চাহিতেছে মানুষের মুক্ত গতি, ব্যক্তির, সমাজের, বিভিন্ন জাতির বৈচিত্র্য, বৈশিষ্ট্য এবং বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত মহামিলন। এই আদর্শেই দুইটি মহাযুদ্ধের পরে ক্রমান্বয়ে দুইটি জাতিসঙ্ঘ গঠিত হইয়াছে। কিন্তু সঙ্ঘের ব্যর্থতার কারণ জাতিগত স্বার্থবুদ্ধি। অবশ্য সাম্রাজ্যবাদের অবসানে এই স্বার্থ-বুদ্ধি অনেকটা দূর হইয়াছে এবং অখণ্ড পৃথিবীর (One Worldএর) আদর্শ প্রকট হইয়াছে, কিন্তু ইহা উপলব্ধি করিতে হইলে চাই মানব-মিলনের তপস্যা, এবং গূঢ়ভাবে তাহা ভগবৎ-তপস্যা, কারণ ব্রহ্মের ব্রাহ্মী শক্তিই জীবাত্মা।

পূর্ব্বেই আলোচনা করা হইয়াছে মানবজাতির বিবর্ত্তনের গতি-ধারা সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দ প্রথম মহাযুদ্ধের সময়ে যে সব অব্যর্থ ইঙ্গিত করিয়াছিলেন তাহার পরিণতি আজ মানবজাতি প্রত্যক্ষ করিতেছে, যদিও এই গভীর তথ্য উপলব্ধি করিবার শক্তি খুব অল্প লোকেরই ছিল; শ্রীঅরবিন্দের সুদূরপ্রসারী দৃষ্টি অনুসরণ করার ক্ষমতা মুষ্টিমেয়েরও ছিল কি না সন্দেহ। যথা, বৃটিশ সাম্রাজ্যের পরিণতি সম্বন্ধে ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে শ্রীঅরবিন্দ The Ideal of Human Unityর এক প্রবন্ধে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহার বাস্তব রূপ আমরা ১৯৩১ এর Statute of Westminsterএ দেখিলাম—এবং আরও অদ্ভুত পরিণতি দেখিলাম ১৯৪৯এ Empire-এর বৃটিশ-আখ্যাহীন Common-wealth-এ রূপান্তরে।

তবু প্রশ্ন উঠিতে পারে, হাঁ, বুঝিলাম শ্রীঅরবিন্দের ন্যায় তীক্ষ্ণধী ব্যক্তি বিরল, কিন্তু তাঁহার পূর্ণযোগের সহিত জগতের রাজনৈতিক বিবর্ত্তনের সম্বন্ধ কি? শ্রীঅরবিন্দ যে বিবর্ত্তনের অপেক্ষায় আছেন, জগতের রাজনৈতিক বিবর্ত্তন তাহার বহিঃরূপ। আসলে যে মানব-জাতির চেতনার ব্যাপক বিবর্ত্তন ঘটিতেছে ইহা স্বীকার্য্য। অখণ্ড

জগৎ বা One Worldএর আদর্শ ইহার প্রতীক। এই অখণ্ড জগতের কথা শ্রীঅরবিন্দ প্রথম মহাযুদ্ধের সময়েই বলিয়াছিলেন। কিন্তু আদর্শ ত একদিনেই উপলব্ধি করা যায় না। মানুষী ক্ষেত্রে সংঘাতের মধ্য দিয়াই আদর্শের অবশ্যম্ভাবিতা পরিস্ফুট হয়। তাই যতই মানব-মহা-মিলনের ক্ষণ সন্নিকট হইতেছে, ততই যেন চরম সংঘাতের দিনও আসন্ন হইতেছে।

এই সংঘাত অনেকটা দেবাসুরের সংঘাতের ন্যায়—আলোর, জ্ঞানের জয় হইবে—না আঁধার, অজ্ঞান বা স্থূল, আংশিক জ্ঞানের প্রতিষ্ঠা ব্যাপক হইবে, ইহাই এই যুগের প্রশ্ন। এই সন্ধিক্ষণেই শ্রীঅরবিন্দের যোগ-শক্তি হয় কার্য্যকরী। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে যে ইহা কার্য্যকরী হইয়াছিল, তাহার কিছু কিছু আভাস সন্ধানী ব্যক্তিগণ পাইয়াছেন। যোগী ত ঢক্কা-নিনাদে তাঁহার শক্তি প্রয়োগ করেন না—এ শক্তি যে অঘটনঘটন-পটীয়সী। ইহার আভাস আমাদের হৃদিস্থিত পুরুষ পাইতে পারে।

মানুষের মহামিলনের জন্য, মানুষের দিব্যরূপান্তরের জন্য চাই আলোকের চরম বিজয়। এই আলোকই আমাদের পরাজ্ঞান দান করিতে সমর্থ। আমরা জানি সেই বেদোক্ত বাণী—সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম; কিন্তু মনে জানা—এমন কি বিশ্বাস করা—এক কথা, আর উপ-লব্ধি করা অন্য কথা। তেমনি অর্জুনের বাসুদেব-দর্শন। যতক্ষণ আমরা অর্জুনের ন্যায় ভূমারূপী বাসুদেবকে প্রত্যক্ষ করিতে না পারিব, ততদিন আমাদের পূর্ণ জ্ঞান হয় নাই—বাহিরে আমরা যতই না নিষ্ঠার সহিত গীতা পাঠ করি।

সেইরূপ অখণ্ড জগতের One World-এর আদর্শ। যতক্ষণ পর্য্যন্ত আমরা One World আমাদের প্রতি রক্তের কণিকায় উপলব্ধি না করিতে পারিব ততক্ষণ One World আদর্শ বা বিশ্বাসের বস্তু মাত্র থাকিবে, কার্য্যকরী হইবে না। এই কারণেই শ্রীঅরবিন্দ ১৯১৯এ জাতিসঙ্ঘ প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্ব্বেই বলিয়াছিলেন, কেন উহা ব্যর্থ হইবে। তাহার কারণ মানুষের প্রকৃতি অত বড় নীতি

কার্য্যকরী করিবার যোগ্যতা লাভ করে নাই। আদর্শের সহিত হৃদয়ের যোগ না থাকিলে ক্রমশঃ তাহা কপটচারিতায় পরিণত হয়। এই জন্যই জাতির সহিত জাতির সম্বন্ধে আমরা এত কপটচারিতা দেখিতে পাই।

অখণ্ড জগৎ বা One Worldএর সত্য স্বরূপ কি? ইহা হইতেছে সেই বেদোক্ত সত্য—একং স বহুধা বদন্তি—সেই এক সত্তা যিনি বহু-রূপে প্রতীয়মান হন। কিন্তু শুধু নির্ব্যক্তিক সত্তা নহেন—তিনি পরম পুরুষও, আবার পরম প্রকৃতিও, কারণ তিনি সচ্চিদানন্দ। সুতরাং One World স্ফুট করিতে পারেন এমন এক শক্তিমান পুরুষ যিনি সেই পরম পুরুষে উত্তীর্ণ হইয়াছেন। এই একের, অখণ্ডতার ব্রত শ্রীঅরবিন্দের—কোন ব্যক্তিগত উদ্দেশ্যের জন্য নহে (কারণ একদিকে যেমন তিনি ব্যক্তি, অপরদিকে তিনি নির্ব্যক্তিক; এবং নির্ব্যক্তিক বলিয়া তিনি আবাল্য স্বার্থশূন্য এবং একান্ত আত্মত্যাগী); তাঁহার এই যোগ সমগ্র জগৎ লইয়া। তিনি মানবজাতির প্রতিনিধি স্বরূপেই পরমা-প্রকৃতির মহাযোগে নিমগ্ন।

অতএব ইহা কি অনুমান করা অসঙ্গত যে ব্রাহ্মীশক্তি মানবপ্রকৃতিকে আমূল রূপান্তরিত না করিলে, অখণ্ড-জগৎ বা One World স্থাপনা করিবার প্রচেষ্টা, শ্রীঅরবিন্দের ভাষায়, half-way house মাত্র? কিন্তু শ্রীঅরবিন্দ এই মানুষী চেষ্টাকে নিরর্থক বলেন নাই, কারণ মানুষকে অজ্ঞানের ভিতর দিয়া জ্ঞানের সন্ধান করিতে হয়, মিথ্যার মধ্য দিয়া সত্যের সন্ধান করিতে হয়। তবে একদিন এই সত্য মিথ্যার গোলক-ধাঁধা হইতে বাহির হইতে হইবেই, নতুবা কি করিয়া সত্য-লোকের সন্ধান পাওয়া যাইবে?

ইহার পরে ব্যক্তিগত প্রশ্ন: সব ত হইল, ব্যক্তিগতভাবে মানুষের কি হইবে? ইহার উত্তরও সনাতন—আত্মোপলব্ধি, এই উপলব্ধি যে প্রতি ব্যক্তি অনন্তের এক একটি চূর্ণ তরঙ্গ, এবং যেমন সমুদ্র ও সমুদ্র তরঙ্গ অভিন্ন, বা অগ্নি ও অগ্নিস্ফুলিঙ্গ অভিন্ন, তেমনি পরমাত্মা

ও জীবাত্মা অভিন্ন। অনন্তের লীলায় জীবাত্মার উদ্ভব, এবং জীবাত্মার গতি নিম্নপ্রকৃতির মধ্যে লীলায়িত হইয়া উর্দ্ধের, ব্রাহ্মীপ্রকৃতির মধ্যে উত্তীর্ণ হওয়া। উত্তীর্ণ হইলেই মানব প্রকৃতি দিব্য-প্রকৃতিতে রূপান্তরিত হয়, যাহার ফলে অনাহত অখণ্ডতার জ্ঞান জন্মে। তখন শুধু জ্ঞানই অখণ্ড হয় না, কর্ম্মও হয় অখণ্ড, আনন্দও হয় নিরবচ্ছিন্ন। ইহাই পরমা-প্রকৃতিতে সচ্চিদানন্দ-লোক।

উর্দ্ধে উত্তীর্ণ হইবার প্রচেষ্টা হইল অখণ্ড-যোগ, পূর্ণযোগ, দিব্যযোগ বা পুরুষোত্তম যোগ—যে ভাষাই ব্যবহার করা যাউক না কেন। এই যোগের দিশারী পরমজ্ঞানী, পরমযোগী শ্রীঅরবিন্দ, এই যোগের সঞ্চালক হৃদ্-বাসিনী শ্রীমা। তাঁহাদের যোগগুরু বলা অতিশয়োক্তি বা গোঁড়ামি নহে। কারণ গুরু না হইলে কোন বিদ্যাই অর্জন করা যায় না—মহাবিদ্যালাভ ত দূরের কথা।

ব্রহ্মোপলব্ধি ছাড়া এ যোগের আর কোন উদ্দেশ্য নাই, কিন্তু ব্রহ্ম অর্থ শুধু তুরীয় ব্রহ্ম নহেন, এ ব্রহ্ম সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম। ব্রহ্মে প্রতিষ্ঠিত হইয়া ব্রহ্মময় জগতে ব্রহ্মের ইচ্ছায় সক্রিয় বা নিষ্ক্রিয় থাকা ইহাই হয় মানব-জীবন; কিন্তু তখন তাহা আর মানুষী-জীবন নহে—তাহা দিব্য-জীবন। এই দিব্য-জীবনের সুপ্রাচীন আদর্শ ভারতের। জার্ম্মানীর সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক নীট্‌শেও অতি-মানব জীবনের আদর্শ পাইয়াছিলেন, কিন্তু তাহা হইতেছে অহংকার-স্ফীত মানবের আসুরিক মূর্ত্তি। ভারতের দিব্য-জীবনের আদর্শ হইতেছে ব্রহ্মময় জীবনলাভ—পুরুষোত্তমের দর্শন।

এটা কি বিস্ময়ের কথা নহে যে, মানুষকে অনন্তে কোন এক ক্ষণে এই পরম আদর্শ দিয়াছিল ভারত—'এশিয়ার তীর্থক্ষেত্র'। তাই ভারতকে আশ্রয় করিয়াই শ্রীঅরবিন্দের জীবন ও যোগ। শ্রীমা ফরাসী দেশীয় হইলেও এশিয়ার রক্ত তাঁহার ধমনীতে প্রবাহিত। তাই কি এক দুর্জ্ঞেয় রহস্যে তিনিও ভারতের যোগাশ্রয়ী হইয়াছেন। ভারত স্বধর্ম্ম-প্রাপ্ত না হইলে জগতের রূপান্তর হইবে না, তাই শ্রীঅরবিন্দ

কৈশোরেই ভারতের মুক্তি-সাধনার ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন। যৌবনে তিনি প্রত্যক্ষ করিলেন ভারতমাতার মূর্ত্তরূপ, ঋষি বঙ্কিমের সহিত সমকণ্ঠে জয়ধ্বনি করিলেন 'বন্দেমাতরম্'। মাতার সেবায় আহ্বান করিলেন রুদ্রকে ; কিন্তু কি এক দুর্জ্ঞেয় রহস্যে রুদ্র দেখাইলেন তাঁহার দক্ষিণমুখ—কারাগারে শ্রীঅরবিন্দ প্রত্যক্ষ করিলেন ভগবান বাসুদেবকে, যিনি ভারতের 'পুরুষম্ পুরাণম্'। ভারতমাতার প্রতিষ্ঠা হইল, মায়ের যোগশক্তি সক্রিয়া হইল—শ্রীঅরবিন্দ পূর্ণযোগ গ্রহণ করিলেন। ভারত-মাতার ভাগবতীশক্তির লক্ষ্য হইতেছে প্রতি ভারতীকে—ভারতের প্রতি নরনারীর মধ্যে (এক জন্মে হউক বা বহু জন্মে হউক) পরম-সত্তার বিকাশ করা, ভাগবতী শক্তির আধারে পরিণত করা। এই সাধনায় শ্রীঅরবিন্দ পূর্ণসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন, তাই স্বেচ্ছায় জগতের উদ্বুদ্ধ অনেকগুলি নরনারী পণ্ডিচারী আশ্রমে পূর্ণযোগের সাধনায় আত্মনিয়োগ করিয়াছেন।

১৯৪৭এর ১৫ই আগষ্ট ভারত শুধু রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভ করে নাই—ভারতমাতা তাঁহার সন্তানগণকে দিব্যসাধনায় সিদ্ধি লাভ করিবার জন্য আবাহন করিয়াছেন। এককালে শ্রীঅরবিন্দ ছিলেন ভারতের রাজনৈতিক সাধনার নেতা, আজ তিনি মুক্ত ভারতের জগৎ-জয়ী অভিযানের নেতা। তাঁহাকে নমস্কার!

পরিশিষ্ট

তিরোধান

১৯৫০ খৃষ্টাব্দের ৫ই ডিসেম্বর একটি স্মরণীয় দিন। প্রাতঃকালে সমগ্র ভারত স্তব্ধ হইয়া রেডিয়ো যোগে শুনিল যে, গত রাত্রে শ্রীঅরবিন্দ দেহরক্ষা করিয়াছেন। স্তব্ধ এইজন্য যে, জনসাধারণ ভাবে নাই যে পূর্ণযোগের হোতা, অতিমানসের অবতরণকারী সহসা তাঁহার দেহত্যাগ করিবেন। তাহাদের আশা ছিল যে, কালক্রমে তাহারা দেখিবে যে শ্রীঅরবিন্দ-কলেবর জ্যোতির্ম্ময় জড়দেহে রূপান্তরিত হইয়াছে। তাহাদের আশা যে একান্ত অমূলক নহে তাহা বিস্ময়কররূপে প্রমাণিত হইল—কিন্তু সে অতিমানস জ্যোতির্ম্ময় রূপ তাঁহার দিব্যদেহে প্রকট হইল তিরোধানের পর। যাহা হউক, জনসাধারণ এ অলৌকিকত্ব প্রথমে বুঝিতে পারে নাই ; রেডিয়োর সংবাদে তাহারা জানিল যে এক মহাপুরুষের মহাপ্রয়াণ হইয়াছে এবং জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে তিরোধানের ব্যথা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিল। যথারীতি শোকের লৌকিক অভিব্যক্তি হইল ; বিরাট পুরুষকে লৌকিকভাবে যে সম্মান প্রদর্শন করা উচিত তাহা হইল। তথাপি লোকের মন হইতে ঘটনার আকস্মিকতার ভাব দূর হইল না।

জনসাধারণের কথা দূরে থাক, অধিকাংশ আশ্রমবাসী ৫ই ডিসেম্বর অতিপ্রত্যূষে সেই মর্ম্মন্তুদ সংবাদ শুনিয়া স্তব্ধ হইলেন, কারণ শ্রীঅরবিন্দের পীড়ার কথা তাঁহাদের মধ্যে মাত্র কয়েকজন জানিতেন। ২৪শে নভেম্বর দর্শনের দিন, সেইদিন আভাসে একটু জানা গেল যে শ্রীঅরবিন্দের শরীর সুস্থ নহে। ১লা ও ২রা ডিসেম্বর আশ্রমের স্কুল-বার্ষিকী ও আনুষঙ্গিক অনুষ্ঠানগুলি সম্পন্ন হইল। আর ৫ই রাত্রে এই অভাবনীয়
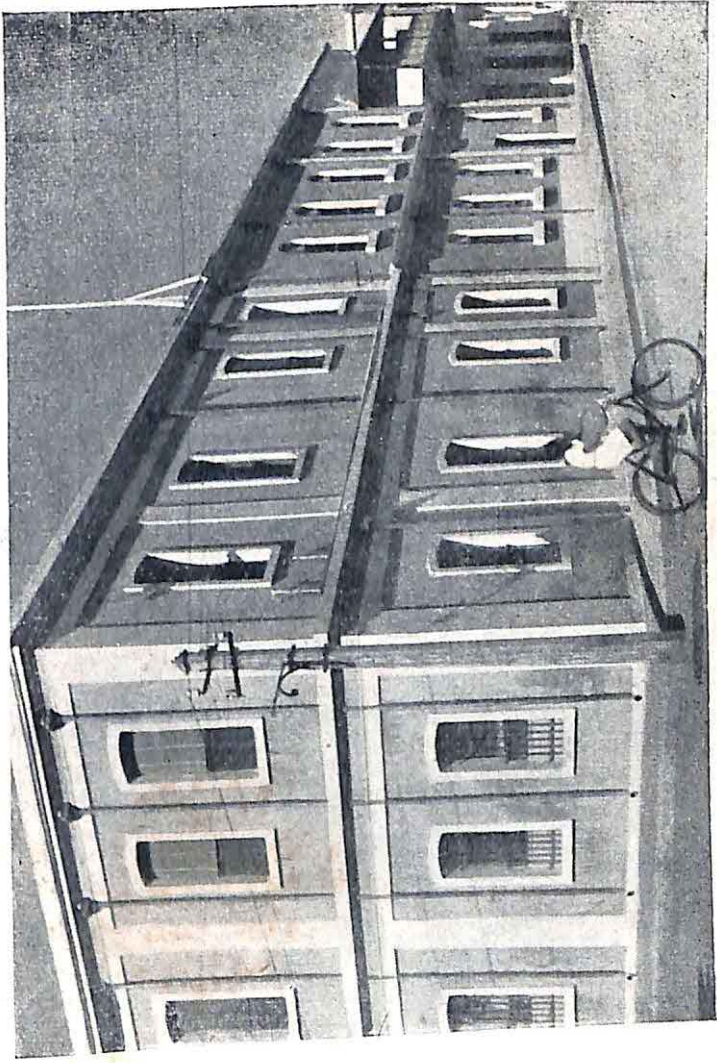
শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম
(শ্রীঅরবিন্দের বাসগৃহ)
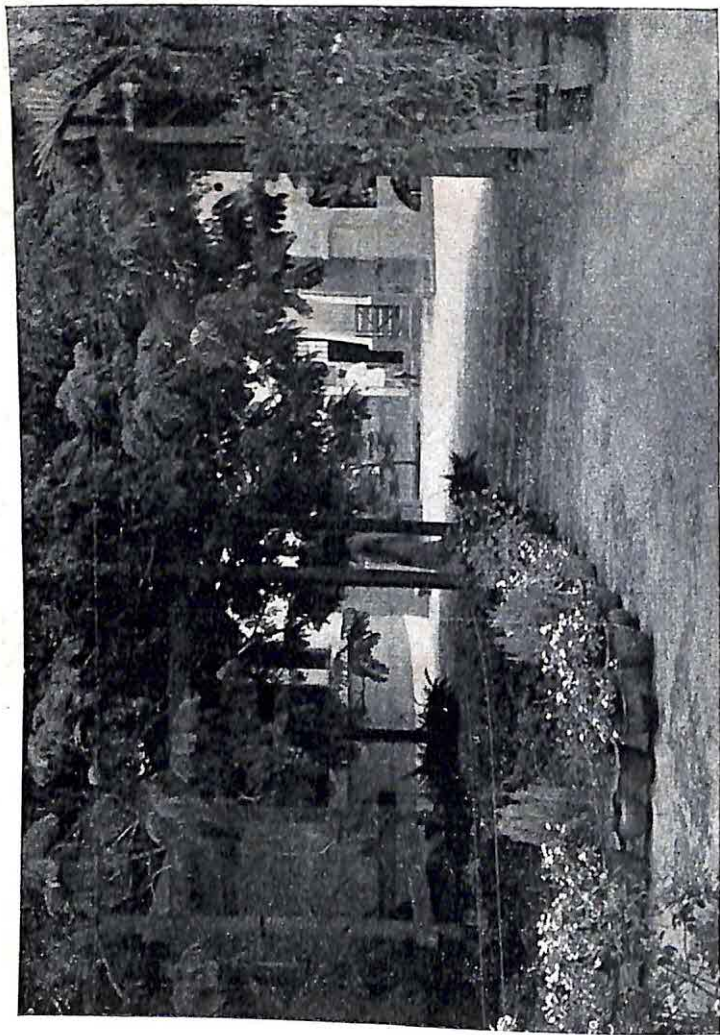
শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম
(ভিতর প্রাঙ্গণ)

ব্যাপার! ৫ই প্রত্যূষে আশ্রমবাসীগণ নর-নারী-শিশু-নির্ব্বিশেষে সেই শায়িত দিব্য-দেহ দর্শন করিলেন। সকলেই শোকে বিহ্বল, তথাপি সবাই সেই প্রশান্ত মূর্ত্তি দেখিয়া ধন্য হইলেন। ক্রমে সমাধির ব্যবস্থা হইতে লাগিল। এমন সময়ে শ্রীমা বলিলেন যে, শ্রীঅরবিন্দের দেহ অতিমানস জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হইয়াছে; যতক্ষণ পর্য্যন্ত জ্যোতি বিদ্যমান থাকিবে, ততক্ষণ কেহ দেহ স্পর্শ করিবে না।

সংবাদপত্রের মারফত এই বার্ত্তা ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র ছড়াইয়া গেল, তখন আরম্ভ হইল এক অপরূপ দৃশ্য। শত শত নরনারী তাঁহার ভক্ত বা দর্শনার্থী সকলেই ছুটিল সেই অদ্ভুত ব্যাপার, সেই প্রত্যক্ষ-দিব্যমূর্ত্তি দর্শন করিতে। এ-দিকে শ্রীমা আশ্রমের প্রধান দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিলেন জনসাধারণের জন্য। ফলে সহস্র সহস্র লোক শ্রীঅরবিন্দের কক্ষে শ্রেণীবদ্ধভাবে প্রবেশ করিয়া অনন্ত শয্যায় শায়িত সেই কনক-কান্তি মূর্ত্তি দর্শন করিল। সে দেহে মৃত্যুর ছায়া নাই—যেন মৃত্যুঞ্জয় মৃত্যুকে আয়ত্ত করিয়া যোগমগ্ন হইয়াছেন।

৫ই হইতে ৯ই পর্য্যন্ত পণ্ডিচারী টলমল। ধনী-দরিদ্র, ইতর-ভদ্র শিক্ষিত-অশিক্ষিত, সুস্থদেহী বা বিকলাঙ্গ সকলেই ব্রহ্মমূর্ত্তি দর্শন করিল। শ্রীঅরবিন্দ যে সকলের, তাই অনন্ত শয়নে যেন নির্ব্বিচারে সকল শ্রেণীর মানুষ তাঁহাকে দর্শন করিতে পারিল। এই জনস্রোত নিয়ন্ত্রণ করা আশ্রমবাসীর সাধ্য ছিল না। তাঁহারা যেন কলের পুতুলের মত তাঁহাদের কর্ত্তব্য পালন করিতেছিলেন। আশ্রমের দৈনন্দিন কর্ত্তব্য-কর্ম্মের মধ্যে এতটুকু ত্রুটি-বিচ্যুতি ছিলনা। কিন্তু আশ্রমের চতুর্দ্দিকের রাস্তা এবং দূরবর্ত্তী সড়ক হইতে সৈন্য ও পুলিশদলকে জনস্রোত নিয়-ন্ত্রিত করিতে হইল।

৯ই বৈকালে সেই জ্যোতির্ম্ময় দেহে মৃত্যুর ম্লান ছায়া দেখা গেল। তখন শ্রীমা সমাধির ব্যবস্থা করিতে বলিলেন। ইতঃপূর্ব্বে ফরাসী গবর্ণমেন্টের তরফ হইতে ডাক্তার দেহ পরীক্ষা করিয়াছিলেন, কারণ তাঁহাদের আইনে কোন মৃতদেহ ৪৮ ঘণ্টার বেশী বিনা অন্ত্যেষ্টিতে

রাখার নিয়ম নাই। ৪৮ ঘণ্টা পরেও ডাক্তার দেখিলেন যে, দেহে মৃত্যু-বিকৃতির কোন লক্ষণ নাই। ৯ই সেই লক্ষণ দেখা গেল।

৯ই সন্ধ্যার প্রাক্কালে আশ্রমবাসীগণ সেই দিব্যদেহকে আশ্রম প্রাঙ্গণে মায়ের নির্দ্দেশে মহাসমাধিতে স্থাপন করিল। পূর্ব্বে ঐ স্থানটি সকাল-সন্ধ্যায় আশ্রমবাসী ও দর্শনার্থীদের গুঞ্জরণে মুখরিত থাকিত—এক্ষণ হইতে উহা অখণ্ড যোগ-পীঠ হইল।

সাধারণভাবে দেখিলে শ্রীঅরবিন্দের দেহরক্ষা এমন কিছু অভিনব ব্যাপার নয়। তাঁহার বয়স ৭৯ বৎসর চলিতেছিল। তবু লোকের বদ্ধমূল ধারণা হইয়াছিল যে, তিনি সহসা দেহরক্ষা করিবেন না। কয়েকমাস পরেই তাঁহার ৮০ বৎসর হইবার কথা এবং সেই উপলক্ষে ভারতব্যাপী উৎসবের আয়োজন সুরু হইয়াছিল। কিন্তু এদিকে শ্রীঅরবিন্দ যেন জীবনের কাজ শেষ করিতে ব্যস্ত।* তাঁহার সঙ্গীগণ তাঁহার এই অতি-তৎপরতার রহস্য বুঝিতে পারিলেন না। তিনি "সাবিত্রী" মহাকাব্য শেষ করিতে বিশেষ উদ্যম করিতে লাগিলেন। তথাপি এক সর্গের রচনা হইল না। বোধহয় ইচ্ছা করিয়া তিনি সর্গটি রচনা করিলেন না—কারণ তাহাতে মৃত্যুরহস্য উদ্ঘাটিত করিবার কথা ছিল।

আমাদের দেশে একটা ধারণা আছে যে, যোগীর ইচ্ছা-মৃত্যু। শ্রীঅরবিন্দ স্পষ্টভাবে এ কথা সত্য না বলিলেও নিজে লিখিয়াছেন যে, যোগশক্তিতে তাঁহার বিধিলিখিত আয়ু অতিক্রম করিয়াছিল। এ সম্বন্ধে জনৈক শিষ্যকে লিখিত তাঁহার একখানি পত্র (তারিখ ৮ই ডিসেম্বর, ১৯৪৯ তিরোধানের এক বৎসর পূর্ব্বে) Sri Aurobindo Circle নামক বোম্বাই হইতে প্রকাশিত সাময়িকীর ৬ষ্ঠ সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছিল। শ্রীঅরবিন্দ খ্যাতিলাভ করিবার পূর্ব্বে—এবং তিনি কে না জানিয়া—কলিকাতার নারায়ণ জ্যোতিষী বলিয়াছিলেন

* এ বিষয়ে নীরদবরণ "শ্রীঅরবিন্দ : I am Here, I am Here !" নামক পুস্তিকার একটি মর্ম্মস্পর্শী বিবরণ দিয়াছেন।

যে, তাঁহার বিরুদ্ধে তিনটি মামলা হইবে এবং তাহাতে তিনি নিরপরাধ প্রতিপন্ন হইয়া যাইবেন। আর জ্যোতিষী বলিয়াছিলেন ৬৩ বৎসরে তাহার মৃত্যু হইবার কথা, কিন্তু যোগশক্তিতে তিনি আয়ু বাড়াইয়া পূর্ণ বৃদ্ধত্ব লাভ করিবেন। শ্রীঅরবিন্দ আরও বলিয়াছিলেন যে, কয়েকটি পীড়া পাকাপাকিভাবে তাহার দেহ আশ্রয় করিয়াছিল, কিন্তু যোগশক্তি-বলে তিনি তাহা দূর করিয়া দিয়াছেন। জ্যোতিষীর ভবিষ্যদ্বাণী সত্য প্রমাণিত হইয়াছে।

ইহাতেই বুঝা যায় যে, তাঁহার চরম পীড়ায় শ্রীঅরবিন্দ বিশেষ কোন কারণে যোগশক্তি প্রয়োগ করা দূরের কথা ঔষধ পর্য্যন্ত সেবন করিতে চাহেন নাই। এ সম্বন্ধে তাঁহার দীর্ঘ কালের সাথী ও সেবক ডাঃ নীরদবরণ এক সুস্পষ্ট বিবৃতি করিয়াছেন, যাহা পূর্ব্বোল্লিখিত পুস্তিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। এখন সাধারণতঃ প্রশ্ন উঠে—কেন তিনি যোগশক্তি প্রয়োগ করেন নাই। ইহার উত্তর কে দিবে? ডাঃ নীরদবরণ শ্রীঅরবিন্দের নিকট খোলাখুলি উত্তর চাহিয়াছিলেন যে, তিনি যোগশক্তি প্রয়োগ করিবেন না কেন। শ্রীঅরবিন্দ বলিয়াছিলেন—তুমি এ বিষয় বুঝিবে না। সুতরাং প্রতীয়মান হয় যে তাঁহার তিরোধান রহস্যাবৃত এবং অনুমান হয় মানববুদ্ধি এই রহস্য ভেদ করিতে অক্ষম। তবু একটা উত্তর পাওয়া গিয়াছে শ্রীঅরবিন্দের শিষ্যপ্রবর বিজ্ঞ নলিনীকান্ত গুপ্তের নিকট হইতে এবং তাহা বিশেষ সমীচীন বলিয়া মনে হয়। তাহা এই : যোগশক্তিতে আধ্যাত্মিক রূপান্তর দেহে পর্য্যন্ত ঘটে। প্রথমে সূক্ষ্ম শরীর জ্যোতির্ম্ময় হইয়া উঠে—চৈত্যপুরুষের দিব্যচৈতন্যের ভাস্বর কণিকাগুলি ফুটিয়া উঠে। ইহার পর দেহের বহিঃ-কোষের রূপান্তরের পালা। পরম আধ্যাত্মিক চেতনার ভাস্বর পদার্থে স্থূল দেহের কোষগুলি পর্য্যন্ত পূর্ণ হইয়া উঠে। এই রূপান্তরে দিব্য সত্তা ব্যক্তিগত দেহে পরিণত হন। যখন রূপান্তরের সমস্ত পর্ব্ব শেষ হইয়া যায় তখনই ব্যক্তিগত দেহ আত্মার অমরত্ব প্রাপ্ত হয়।

দেহের দিব্যকরণে এবং অমরত্ব লাভে মৃত্যুর বা অনুরূপ ক্রিয়ার প্রয়োজন হইতে পারে। দিব্য রূপান্তরিত সত্তা তখন আর অসহায়-ভাবে মৃত্যুর কবলিত নহেন, তিনি ইহাকে (মৃত্যুকে) বিশেষ উদ্দেশ্যে নিয়োজিত করেন।

মানুষের দিব্য-রূপান্তরে দুইটি ক্রিয়ার প্রয়োজন হয়—পরিত্যাগ এবং একীকরণ। পরিত্যাগ হইতেছে সেই সকল পদার্থের যাহা নিম্নপ্রকৃতির, যাহা উর্দ্ধ সত্তায় গ্রহণ করা যায় না ; একীকরণ হইতেছে নিম্নপ্রকৃতির যে সকল পদার্থ উর্দ্ধসত্তায় গ্রহণ এবং ব্যবহারযোগ্য করা যায়। এই দুধারা সত্তার সমস্ত স্তরে সক্রিয়। রূপান্তরের কোন বিশেষ অবস্থায় প্রত্যাখ্যানের প্রণালীতে এমন অদল-বদল-ক্রিয়ার প্রয়োজন হইতে পারে যাহাকে বাহির হইতে মনে হয় মৃত্যু ; কিন্তু ইহার পরে কিংবা ইহার সাথে সাথে অনিবার্য্যরূপে হয় নব-সৃষ্টি বা একীকরণের ক্রিয়া।

পরিশেষে নলিনীকান্ত মন্তব্য করিতেছেন : হয়ত এই চরম ও বিপজ্জনক পরীক্ষা জগদ্‌গুরু, অগ্রদূত ও পথনির্দ্দেশক হিসাবে করিতে পারেন—এবং তিনিই ইহা করিয়াছেন।*

সাধারণ মানুষ এ সম্বন্ধে কিছু বলিতে অক্ষম, কারণ এ ব্যাপারে তাহার বিন্দুমাত্র জ্ঞান নাই। সে বিজ্ঞের উক্তি হৃদয়ঙ্গম করিতে চেষ্টা করিতে পারে, আর ভারতীয় সংস্কার অনুযায়ী বলিতে পারে যে, যোগীর মৃত্যু নাই। শ্রীঅরবিন্দের তিরোধানের পর শোকার্ত্তদের সচেতন করিয়া শ্রীমাও বলিয়াছেন : "শ্রীঅরবিন্দের জন্য শোক করা অর্থ শ্রীঅরবিন্দকে অপমান করা—তিনি এখানে রয়েছেন আমাদের সঙ্গে জাগ্রত জীবন্ত।

* Perhaps the supreme and dangerous gesture only the Master can make—as the pioneer and pathfinder—and he has made it."—ইংরাজীতে প্রবন্ধটি Sri Aurobindo Circle নামক বোম্বাই হইতে প্রকাশিত সাময়িকীর ৭ম সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে।

শ্রীঅরবিন্দের তিরোধান সম্পর্কে শ্রীমা ৭ই ডিসেম্বর, ১৯৫০ হইতে ২৮শে ডিসেম্বর, ১৯৫০ পর্য্যন্ত কয়েকটি বাণী দেন। তাহার মধ্যে ৮ই ডিসেম্বরের বাণীটি এই :

"শ্রীঅরবিন্দের দেহের যে পরিণতি হল, তার জন্য বহুলাংশে দায়ী পৃথিবীর আর মানুষের গ্রহণ সামর্থ্যের অভাব। তবে একটি বিষয় নিঃসন্দেহ—যা ঘটেছে তা কোনক্রমেই তাঁর শিক্ষার সত্যতা স্পর্শ করবে না ; যা-কিছু তিনি বলেছেন সবই সত্য এবং সত্য রয়ে যাবে। সময় এবং ঘটনার ধারা এ কথার পূর্ণ প্রমাণ দেবে।"

এই বাণীটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। শ্রীঅরবিন্দের সাধনা বিশ্বের এমন স্তরে আসিয়া পৌঁছিয়াছে যে, জড়ও চিন্ময়ত্ব লাভ করিয়াছে—তাহা তাঁহার কলেবরে দেখা গেল। এই চিন্ময়ত্ব কার? নিশ্চয়ই ব্রহ্মের স্বরূপত্বের, যেরূপ আমাদের শাস্ত্রে এবং উপনিষদাদি দর্শনে বর্ণিত আছে। কিন্তু একদিকে যেমন শ্রীঅরবিন্দ যোগশক্তি দ্বারা ভগীরথের ন্যায় অতিমানস-চেতনার অবতরণ করাইলেন, জগৎ ও মানবজাতি কি তাহা গ্রহণ করিতে পারিল? জগতের ইতিহাসে ছিল এটা এক সন্ধিক্ষণ—উর্দ্ধজগতে বিবর্ত্তনের এবং মানবজাতির উত্তরণের ছিল এই স্বর্ণ সুযোগ। কিন্তু অহংবুদ্ধিতে আচ্ছন্ন, গতানুগতিকতায় পঙ্গু মানুষ এই ব্রহ্মবিবর্ত্তনের জন্য প্রস্তুত হইতে পারিল না। শ্রীঅরবিন্দ যেমন আজীবন অতিমানসের সাধনা করিয়াছেন, তেমনি তাঁহার অক্লান্ত লেখনীর দ্বারা ক্ষেত্র, অর্থাৎ মানবমন প্রস্তুত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। কতভাবে তিনি মানবমনকে উর্দ্ধে আকর্ষণ করিয়াছেন ; কত না অর্থপূর্ণ ইঙ্গিত দিয়াছেন। মানবজাতিকে তাঁহার চরম আহ্বান দিয়াছেন যুদ্ধ নিবারণ করিতে—যাহা The Ideal of Human Unity পুস্তকের পরিশিষ্টের মধ্যে আছে। এই পরিশিষ্ট তিনি তিরোধানের কয়েকমাস পূর্ব্বে (১৯৫০ এর এপ্রিলে) লিখিয়াছিলেন।

কিন্তু দেখা গেল মানব-প্রকৃতি সহজে আমূল পরিবর্ত্তিত হইতে চাহে না। অজ্ঞান বশে ইহা যাহা করিতে অভ্যস্ত তাহা আঁকড়াইয়া

থাকিতে চাহে। অতিমানসের জন্য প্রকৃতি আমূল পরিবর্ত্তিত হওয়া দূরের কথা, মানুষ বর্ত্তমানে সর্ব্বক্ষেত্রে বিচারবুদ্ধি অনুসারে চলিতে চাহে না—অন্ধ আবেগে বা শ্লথ জড়তায় নিজেকে বিকৃত করে। এমন কি অভিজ্ঞতায়ও মানুষের জ্ঞানচক্ষু খোলে না। যেমন যুদ্ধের ধ্বংসকারী অভিজ্ঞতার ফলে মানুষ এখন হয়ত আর যুদ্ধধর্ম্মী নহে, কিন্তু অপরদিকে সংস্কারবশে এবং স্বার্থবুদ্ধিতে সে সংঘর্ষের পথও ত্যাগ করিতে প্রস্তুত নহে।

মানবসমষ্টির পক্ষে যেরূপ, ব্যক্তি হিসাবে মানুষের পক্ষেও সেইরূপ। বাস্তবিক, এই বিশাল পৃথিবীতে এত ধর্ম্মের আলোড়নের পরও কয়টি লোক সর্ব্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া ভগবানের আশ্রয় লইতে প্রস্তুত? ঈশ্বরকে আমরা কেহ কেহ হয়ত মুখে স্তুতি করি, কেহ কেহ হয়ত বিপদে পড়িলে তাঁহার শরণাপন্ন হইতে চাহি, আবার কেহ কেহ আমাদের বিশেষ ধর্ম্ম ও সংস্কারানুযায়ী তাঁহার একটি বিশেষ রূপে আবদ্ধ থাকিয়া অতি সামান্য কারণেও অপরাপর ধর্ম্মাবলম্বীদের সহিত সংঘর্ষ করিতে সদাই প্রস্তুত হইয়া থাকে। অন্যদিকে আমাদের স্বার্থ শিক্ষা, প্রচার ও অভিজ্ঞতা সত্বেও এখনও অক্ষুণ্ন রহিয়াছে। ইহার কারণ এই যে আমরা অজ্ঞানের বশবর্ত্তী। শ্রীঅরবিন্দ তাঁহার অসংখ্য লেখায় সরল ভাষায় বিশেষ যুক্তি দিয়া এই অজ্ঞান অতিক্রম করিয়া জ্ঞানে উত্তীর্ণ হইবার উপায় নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু জীবের প্রকৃতি থাকে মূর্চ্ছায়—এ প্রকৃতি মায়ের বিশেষ কৃপা না থাকিলে কি সহসা পরিবর্ত্তিত হইবে? কিন্তু কালক্রমে পরিবর্ত্তনও অনিবার্য্য।

শ্রীঅরবিন্দের যোগ ভগবানের জন্য, কিন্তু জগৎকেও লইয়া, কারণ এই জগতেও ভগবান মূর্ত্ত। ব্যক্তিগতভাবে সাধনায় সিদ্ধি তিনি কোনদিন চাহেন নাই, কিন্তু জগতে ভগবানের উদ্দেশ্য ত সফল করিতেই হইবে—তাহা যে বিধিনির্দ্দিষ্ট কাজ। তিনি এতকাল সাধনা করিয়া এমন একটা স্তরে উপনীত হইয়াছিলেন যেখানে চেতনাকে নবভাবে প্রকাশিত হইতে হইবে, জগতের বিবর্ত্তন পূর্ব্বধারায় চলিবে

না। এই বিষয়ে তিনি দেখিলেন যে, সহজ পথে কার্য্যসিদ্ধি হইবে না, এবং ইহার জন্য তাঁহার পক্ষে দেহরক্ষা করাও প্রয়োজন। ইহাই আপাত দৃষ্টিতে মহাযোগীর মৃত্যু—আসলে পুরুষ-যজ্ঞ ; পরম পুরুষ মহান উদ্দেশ্যে তাঁহার দেহ উৎসর্গ করিলেন। তাই আশ্রম-প্রাঙ্গণে শ্রীঅরবিন্দের সমাধিতে মায়ের কথাগুলি উজ্জ্বল অক্ষরে খোদিত আছে :—

"হে আমাদের ভগবানের জড় আবরণ, তোমাকে আমাদের অশেষ কৃতজ্ঞতা নিবেদন করি। তুমি যে আমাদের জন্যে এত করেছ—এত-খানি কাজ করেছ, যুদ্ধ করেছ, কষ্ট করেছ, আশা করেছ, সহ্য করেছ, তুমি যে সবকিছু সঙ্কল্প করেছ, চেষ্টা করেছ, তৈরী করেছ, সংসিদ্ধ করেছ আমাদের জন্যে ; তোমার সম্মুখে প্রণত আমরা, আর এই প্রার্থনা তোমার কাছে, আমরা যেন কখন ভুলে না যাই, এক মুহূর্ত্তের জন্যেও, তোমার কাছে সব-কিছুর জন্যে কত আমরা ঋণী।"

আর বিশেষ অর্থপূর্ণ মায়ের ১৯৫০এর ২৬ ডিসেম্বরের বাণী'

"আমাদের ভগবান আমাদের জন্যে পূর্ণ আত্মাহুতি দিয়েছেন··· বাধ্য হয়ে তিনি শরীর ত্যাগ করেন নি—শরীর ত্যাগ করেছেন নিজের ইচছায়, যে সব কারণের জন্যে তা এত মহৎ যে মানুষের মন ধরতে পারে না।...

"বুঝবার মত জ্ঞান যদি না থাকে তবে একমাত্র কর্ত্তব্য সসম্ভ্রমে মৌন অবলম্বন।"

*   *

শ্রীঅরবিন্দের তিরোধানের পর বাহিরের লোকের মনে এই প্রশ্নের উদয় হইয়াছে যে, আশ্রমের ভবিষ্যৎ কি ? ইহা সত্য যে শ্রীঅরবিন্দকে লইয়াই আশ্রম, কিন্তু শ্রীঅরবিন্দ এই আশ্রমের ভার সম্পূর্ণভাবে শ্রীমাকে দিয়াছেন বহু বৎসর আগে। কাজেই আশ্রমবাসীর সাক্ষাৎ-পরিচয় মায়ের সঙ্গে। দ্বিতীয়তঃ শ্রীঅরবিন্দ ও মায়ের যোগ অভিন্ন। সুতরাং সাধকসাধিকাগণ আন্তর সাধনায় মায়ের সঙ্গেই যুক্ত। তাহাই ছিল—শ্রীঅরবিন্দেরও নির্দ্দেশ।

ইহা হইল গুরু শিষ্যের সম্বন্ধ। কিন্তু ইহা ছাড়িয়া দিলেও, যদি আশ্রমের উদ্দেশ্যের কথা ধরা যায়, তাহা হইলে এই উত্তর দেওয়া যায় যে, তাহা হইলে শ্রীঅরবিন্দের লৌকিক তিরোধান ঘটিলেও তাঁহার আদর্শ হইতে কেহই বিচলিত হইবে না—কারণ এ আদর্শ সনাতন। এ সম্বন্ধে মা স্পষ্টভাবে বলিয়াছেন :—

"বাহ্যরূপ দেখে বিভ্রান্ত হবে না—শ্রীঅরবিন্দ আমাদের ছেড়ে যান নি, তিনি এখানেই আছেন—তেমনি জীবন্ত, তেমনি সদাসন্নিহিত। এখন আমাদের কর্ত্তব্য হবে তাঁর কর্ম্ম সম্পন্ন করা, যতখানি প্রয়োজন সমস্ত আন্তরিকতা, উৎসাহ ও একাগ্রতা দিয়ে। (১৫ই ডিসেম্বর, ১৯৫০)

আবার :

"আমরা তাঁর সান্নিধ্যে দাঁড়িয়ে, যিনি আপন স্থূল জীবন বলি দিয়েছেন তাঁর রূপান্তর কাজটি আরো পূর্ণতরভাবে সম্পন্ন করবার জন্যে। তিনি সর্ব্বদা আমাদের সঙ্গে রয়েছেন, জানছেন আমরা কি করি, জানছেন আমাদের প্রত্যেক চিন্তা, প্রত্যেক অনুভব, প্রত্যেক কর্ম্ম।"

কাজেই পূর্ণযোগের সাধনা রহিয়াছে অব্যাহত এবং এই যোগ নিয়ন্ত্রণ করিতেছেন শ্রীমা। তিনি পূর্ব্বের ন্যায় পরম স্নেহে সাধক-সাধিকাবৃন্দকে মহান্ কার্য্যে উদ্বুদ্ধ করিতেছেন। তাঁহার জন্যই কেহই যেন শ্রীঅরবিন্দের অভাব অনুভব করিতে পারিতেছেন না। বাহিরের কোন লোক যিনি পূর্ব্বে আশ্রম দেখিয়াছিলেন তিনি যদি এক্ষণে পুনর্ব্বার আশ্রম দর্শন করেন তাহা হইলে দেখিবেন যে বিশ্ব-জননীর যোগক্ষেত্রের মধ্যভাগে রহিয়াছে মহাযোগীর সমাধি, যেখানে মহাযোগী রহিয়াছেন মহাসমাধিতে, আর আশ্রমজীবনের পুরোভাগে রহিয়াছেন শ্রীমা। কোথাও, পূর্ব্বের ন্যায়ই সামান্য ত্রুটি-বিচ্যুতি নাই। যোগাগ্নি চির-অনির্ব্বাণ। ইহার রহস্য এই যে ইহা লৌকিক ব্যাপার নহে—এই মহান্ যোগের উদ্দেশ্য লোকোত্তর।

মায়ের পরিকল্পনায় শ্রীঅরবিন্দের এই আদর্শানুসরণে বিশ্ববাসীকেও আহ্বান করিবার সময় আসিয়াছে। এই উদ্দেশ্যে আশ্রমকে লইয়া আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্র-স্থাপন করিবার সঙ্কল্প হইয়াছে। গত ১৯৫১এর ২৪শে এপ্রিল পণ্ডিচারীতে যে সংসদের অধিবেশন হয় তাহাতেই এই সঙ্কল্প গৃহীত হয়। সংসদ উদ্বোধন করিয়া শ্রীমা যে ভাষণ দেন তাহাতে উদ্দেশ্যটি সুষ্ঠুভাবে ব্যক্ত হইয়াছে। তাহা এই:—

"শ্রীঅরবিন্দ এখানে আমাদের মধ্যে উপস্থিত আছেন, তাঁর প্রতিভার সমগ্র সৃষ্টিশক্তি নিয়ে তিনিই এই সর্ব্ববিদ্যায়তন-কেন্দ্রের নির্ম্মাণ উদ্যোগ পরিচালনা করছেন। বহুবৎসর ধরে তিনি মনে করে আসছিলেন যে এই উপায়েই ভবিষ্যৎ মানবজাতিকে সর্ব্বাপেক্ষা সুষ্ঠুভাবে প্রস্তুত করা যেতে পারে যাতে অতিমানস-জ্যোতি গ্রহণ করা তার পক্ষে সম্ভব হয়। এই জ্যোতিই বর্ত্তমানের শ্রেষ্ঠদের গোষ্ঠীকে নূতন এক জাতিরূপে পরিণত করবে যার ভিতর দিয়ে পৃথিবীতে প্রকাশ হবে নূতন আলো, নূতন শক্তি, নূতন জীবন।

"আজকার অধিবেশন মিলেছে শ্রীঅরবিন্দের অতিপ্রিয় একটি আদর্শকে বাস্তবে গড়ে তুলতে—তাঁর নামে এই সভার উদ্বোধন আমি করছি।"